আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম
আবদুল মান্নান তালিব

আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম

আবদুল মান্নান তালিব

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ২৮০

১ম প্রকাশ

সফর	১৪২২
বৈশাখ	১৪০৮
মে	২০০১

বিনিময় ঃ ১১০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ADHUNIK JUGER CHAILENGE O ISLAM by Abdul Mannan Talib. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.
Phone : 7115191

Price : Taka 110.00 Only.

প্রসংগ কথা

আধুনিক যুগ বলতে আমরা কোন্ সময়কালকে চিহ্নিত করতে চাচ্ছি ? এর একটি সময়সীমা হচ্ছে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াতের সময় শেষ হবার পর শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের জামানা যখন থেকে শুরু হচ্ছে তখন থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবী অর্থাৎ শেষ যুগের তথা আধুনিক যুগের নবী। এই শেষ নবীর পর আর কোনো নবী তথা কোনো ধরনের ও কোনো প্রকারের কোনো নবী আসবেন না। ঈসায়ী সপ্তম শতকের শুরু থেকেই বিশ্ব এক নতুন যুগে পদার্পণ করেছে। এ যুগটির সীমানা কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার পৃথিবীতে আগমনই কিয়ামতের আলামত। তিনি বলেন, আমার ও কিয়ামতের অবস্থান ঠিক যেমন এই আমার হাতের তর্জনী ও অনামিকার অবস্থান। এই আঙুল দুটির মধ্যকার ব্যবধান অতি সীমিত। এটি একটি একক সময়কাল নির্দেশক। তাই আমরা এই সমগ্র যুগটিকে মুহাম্মদী ও আধুনিক যুগ বলছি।

এর আর একটি প্রচলিত সময়সীমা আছে। ঘটনার ধারাবাহিকতার সাথে এর সম্পর্ক। ঘটনার ভিত্তিতে একে তিন ভাগে ভাগ করা হয় প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক। এর আধুনিক অংশটি সাধারণত বর্তমানকেই নির্দেশ করে। বর্তমানের অঞ্চলটা নিকট অতীতসহ গঠিত। এ অংশটি ঘটমান বর্তমান থেকে নিয়ে পেছনে কয়েকশো বছর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে।

এ প্রেক্ষিতে বিচার করলে আমরা এ গ্রন্থে যে আধুনিক যুগের কথা বলছি তার সময়সীমাটি কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ? এটা অবশ্যই আমাদের অর্থাৎ এ যুগের মানুষের বিচার্য বিষয়। শুরুতে আমরা মুহাম্মদী নবুওয়াতের সমগ্র যুগকেই আধুনিক বলেছি। আবার এখানে সেই যুগ থেকে একটি অংশ কেটে নিচ্ছি। এর কারণটি যথার্থই গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতী কার্যক্রম ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁর ইন্তিকালের পর এক হাজার বছরের বেশী সময় পর্যন্ত বিশ্বের বিরাট অংশে ইসলামী জীবন বিধান ও ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিগত তিন চারশো বছর থেকে এর সীমানা সংকুচিত হয়ে আসতে থেকেছে। এই সাথে ইউরোপীয় খৃষ্টবাদী জাতিগুলো তাদের সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক শাসন ছড়িয়ে দিয়েছে সারা বিশ্বে। মুসলমানদের দু-একটি ছাড়া প্রায় সমস্ত দেশই তাদের শাসনভুক্ত হয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের বিভ্রান্ত ও

ইসলাম বিরোধী চিন্তা এসব দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এসব দেশে তারা ইসলামী আইন রহিত করে তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় তথা ইসলাম বিরোধী আইন জারী করেছে। তাদের কুফরী, মুশরিকানা ও নাস্তিক্যবাদী জীবন চর্চা মুসলমানদেরকে প্রভাবিত করেছে।

মোটকথা বিগত দু-আড়াই শো বছর থেকে মুসলমানরা ইসলামী জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি অনৈসলামী জীবন পরিবেশে বসবাস করছে। তাদের চিন্তার ধারা ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত পথে এগিয়ে চলছে। তাদের বিরাট অংশ ইসলামী আইনকে কার্যকর বলে মনে করছে না। ইসলামী আইন কার্যকর না থাকার কারণে গত কয়েকশো বছর থেকে তার মধ্যে ইজতিহাদী কার্যক্রমও বন্ধ রয়েছে। এর ফলে জীবন থেকে আইন অনেক দূরে সরে গেছে।

এই সময়কালটাকে আমরা আমাদের সুবিধার্থে আধুনিক যুগ বলে চিহ্নিত করতে চাই। এই যুগ ইসলাম ও মুসলমানদের ইসলামী জীবন চর্চার জন্য যে সংকট সৃষ্টি করে দিয়েছে আমাদের সামনে রয়েছে তারই চিত্র। মূলত এ সংকট আমাদের জীবনকে ঘিরে। তবে জীবনের তিনটি বৃহত্তর গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকেও আমরা এখানে সামনে আনছি। সে তিনটি হচ্ছে সমাজ, সংস্কৃতি ও শিক্ষা। এ তিনটি এলাকায় যেসব চ্যালেঞ্জ এসেছে তার কিছু অংশের পর্যালোচনার মাধ্যমে এখানে ইসলামী চিন্তা ও জীবনধারার পুনরবিন্যাসের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। তবে এ চ্যালেঞ্জ অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। বরং বলা যায় সর্বব্যাপী। এর ওপর ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন।

এর অধিকাংশ প্রবন্ধ ১৯৮৩-১৯৯৩ সালের মধ্যে এবং ছ-সাতটি পরবর্তীতে লেখা হয়। ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এগুলো প্রকাশিত হয়েছে। সচেতন পাঠকবর্গ এগুলোর মধ্যে কিছু চিন্তার খোরাক পাবেন বলে আশা করি।

আবদুল মান্নান তালিব
১৮-০১-৯৫

সূচীপত্র

জীবন ও সমাজ

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য

শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষানীতি

ইসলামী আন্দোলন

কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

একজন সুঠামদেহী কুস্তিগীরকে জিজ্ঞেস করা হোক তার জীবনের লক্ষ কি ? নির্দ্বিধায় সে বলে দেবে, প্রতিদ্বন্দ্বী কুস্তিগীরকে ধারাশায়ী করা। একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিত্র শিল্পীকে জিজ্ঞেস করুন, তার জীবনের সার্থকতা কিসে ? এক কথায় সে বলে দেবে, দুনিয়ায় অপ্রকাশিত ভাব-কল্পনাকে চিত্রায়িত এবং বিমূর্তকে মূর্ত করার মধ্যেই তার জীবনের সার্থকতা। এমনিভাবে যাকেই জিজ্ঞেস করা যাবে তার জীবনের উদ্দেশ্য, লক্ষ ও সার্থকতার কথা, সে নিজের মনের একান্ত বাসনাই ব্যক্ত করে যাবে। এখানে কারোর বাসনার সাথে কারোর বাসনার মিল হবে একটা বিরল ঘটনা।

এর কারণ কি ? এর কারণ, এদের কেউই নিজের সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য জানে না। এদের সবাই যদি সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানতো তাহলে সবার জবাবের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যেতো। নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এরা জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ নির্ধারণ করতো এবং এর ফলে জীবনও সার্থক হতো। কিন্তু বিশ্বজগতের এই বিচিত্র কর্মব্যস্ততার মধ্যে মানুষের নিজের পক্ষে নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সঠিকভাবে চিহ্নিত করা মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। স্রষ্টাকে চিনে নেয়া যে পরিমাণ সহজ সৃষ্টির উদ্দেশ্য চিহ্নিত করা তার তুলনায় অনেক বেশী কঠিন। এ ব্যাপারে মূলগতভাবে বলা যায়, স্রষ্টা সম্পর্কে মানুষের ধারণা যে পর্যায়ের হবে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে তার সিদ্ধান্তও হবে তারি সাথে সামঞ্জস্যশীল। যেমন স্রষ্টাকে যদি মনে করা হয় এমন এক সত্তা যিনি এক সময় সৃষ্টি কর্ম সম্পন্ন করে বর্তমানে বসে বসে আরাম করছেন এবং এখন আর তাঁর করার কিছুই নেই। যাকিছু হবার স্বাভাবিকভাবে হয়ে যাচ্ছে এবং যাকিছু ঘটার স্বাভাবিকভাবেই ঘটে যাচ্ছে। এ অবস্থায় সৃষ্টির উদ্দেশ্য এক রকম বলে ধারণা হবে, বর্তমানে অথর্ব স্রষ্টার সৃষ্টি কর্মের সাথে যার থাকবে একটা মিল। আবার যদি স্রষ্টা সম্পর্কে এই বিশ্বাস গড়ে তোলা হয় যে, তিনি এমন এক সত্তা যিনি এই সমগ্র জগত সংসার সৃষ্টি করার পর একে একটা উদ্দেশ্যের দিকে প্রধাবিত করছেন, একে পরিচালনা করছেন এবং এর সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক, তাহলে আবার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটা ভিন্ন প্রকার ধারণা গড়ে উঠবে। এখানে আমরা এই দ্বিতীয় প্রকার ধারণাটার ব্যাপারে আলোচনা করবো। এই ধারণাটার মূল ভিত্তি গড়ে তুলেছে কুরআন মজীদ।

কুরআন মজীদে মানুষের সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে তা বড়ই অভিনব। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ -(الزريت : ٥٦)

অর্থাৎ 'মানুষ ও জিন প্রজাতিকে শুধুমাত্র আমার বন্দেগী করার জন্যই আমি সৃষ্টি করেছি।'-(সূরা আয যারিয়াত ঃ ৫৬)

এই উদ্দেশ্য বর্ণনার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা ও জড়তা নেই। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত ও বন্দেগী করাই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ এবং আল্লাহ মানুষকে এ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন।

এখন আমাদের দেখতে হবে এই ইবাদত শব্দের অর্থ কি ? আরবী ভাষায় ইবাদত বলতে কি বুঝানো হয়েছে ? আল্লামা রাগেব ইসফাহানী তাঁর মুফরাদাতুল কুরআন গ্রন্থে ইবাদত শব্দের অর্থ বলেছেন ঃ

العبادة غاية التذليل

অর্থাৎ ইবাদত হচ্ছে চরম দীনতা ও হীনতার নাম। অন্য কথায় বলা হয়, কারোর সামনে চরমভাবে নত ও বিনত হওয়াকে ইবাদত বলে।

আল্লামা যাচ্ছা লিসানুল আরব গ্রন্থের চতুর্দশ খণ্ডে বলেছেন ঃ

معنى العبادة فى اللغة الطاعة مع الخضوع -

অর্থাৎ আভিধানিক অর্থে ইবাদত বলা হয় এমন ধরনের আনুগত্যকে যার মধ্যে থাকে "খুযু" বা বিনত হওয়ার ভাব। মানে আনুগত্য করার মধ্যে কোনো প্রকার স্বেচ্ছাচারিতা ও শ্রেষ্ঠত্বের ভাব থাকবে না। বরং যার আনুগত্য করা হয় তার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিকিয়ে দেয়া হবে।

العبادة هى القياه بالفعل المطلوب شرعا (رساله قشيريته)

অর্থাৎ ইবাদত বলতে এমনসব কাজ করা বুঝায় যেগুলো শরীয়তের দৃষ্টিতে কাংখিত। অন্য কথায় বলা যায়, শরীয়ত যে কাজগুলো চায় সেগুলো করাই হচ্ছে ইবাদত-(রিসালাহ কাশীরীয়াহ, ৯১ পৃঃ)

ইবাদত শব্দের এ আভিধানিক অর্থগুলো বিশ্লেষণ করলে আপাতদৃষ্টিতে এর মধ্যে কিছু বিরোধ দেখা গেলেও আসলে এটাকে বিরোধ বলে চিহ্নিত করা যাবে না। বরং বলা যাবে, এগুলো হচ্ছে শব্দটির ব্যাপক ও বিস্তৃততর অর্থ। এই বিভিন্ন অর্থের মাধ্যমে ইবাদত শব্দটির আসল অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কুরআনের এই শব্দটিকে বিভিন্নভাবে এই ধরনের ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা

হয়েছে। কাজেই আভিধানিক ও কুরআনী অর্থের প্রেক্ষিতে আল্লাহর ইবাদত করার অর্থ দাঁড়ায় ঃ আল্লাহর সামনে বাহ্যিকভাবে ও প্রকাশ্যে এবং সংগোপনে ও মানসিকভাবে সকল রকমের প্রক্রিয়ায় পুরোপুরি ঝুঁকে যাওয়া ও বিনত হওয়া।

এখানে আভিধানিক অর্থের মধ্যে "খুযু" ও "যিল্লাত" তথা নত ও বিনত হবার কথা এসেছে। এ থেকে এ ধারণা করা সংগত নয় যে, এই নত ও বিনত হওয়াতো একটা মানসিক অবস্থা এবং এর কোনো বাহ্যিক কাঠামো নেই। কাজেই ইবাদতের সম্পর্ক শুধুমাত্র মনের সাথে। একথা ঠিক নয়। কারণ নত ও বিনত হওয়ার সম্পর্ক মনের সাথে সাথে বহিরংগ তথা অনুভব গ্রাহ্য পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাথেও সমানভাবে রয়েছে। বরং বলা যায়, বাইরে বিনত না হলে ভিতরে বিনত হওয়া যায় না। মন নত ও বিনত হওয়ার আগেই মাথা ও শরীরের সমস্ত অংগ প্রত্যংগ নত হয়। আর যদি এই পঞ্চেন্দ্রিয় বিনত না হয় তাহলে অনুভব গ্রাহ্যতার সীমানা পেরিয়ে মনের অভ্যন্তরে বিনত হওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার।

এ থেকে বুঝা যায়, ইবাদত শুধুমাত্র কোনো মানসিক কাজের নাম নয়। বরং তার একটা বহিঃকাঠামোও আছে। তবে হাঁ, এখানে এ ধরনের ধারণা পোষণ করা মোটেই অস্বাভাবিক হবে না যে, মানসিকভাবে বিনত হওয়াটা হচ্ছে ইবাদত কর্মের প্রাণ সমতুল্য এবং বাহ্যিক তথা অনুভব গ্রাহ্যভাবে বিনত হওয়াটা হচ্ছে তার কায়ার মতো। তবে মূলত ইবাদত শব্দের এ ধরনের কোনো বিভেদাত্মক অবস্থান বা রূপ নেই। এটা শুধুমাত্র তার একটা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ছাড়া আর কিছুই নয়। নয়তো জাহেরী ও বাতেনী উভয় অবস্থানই ইবাদতের জন্য জরুরী। অর্থাৎ মানুষের শুধুমাত্র কায়াকে বা তার শুধুমাত্র প্রাণ বা রূহকে যেমন মানুষ বলা যায় না ঠিক তেমনি শুধুমাত্র মানসিকভাবে বিনত হওয়া বা শুধুমাত্র বাহ্যিক শারীরিক অংগ-প্রত্যংগের বিনত হওয়াকে ইবাদত বলা যাবে না। বরং একদিকে অংগ-প্রত্যংগের বিনত হওয়া এবং অন্যদিকে মানসিকভাবে বিনত হওয়া উভয়ের একত্র সমাবেশের নামই ইবাদত।

ইবাদত সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা আলোচনা করা হলো তা থেকে মনে হয় ইবাদতের আসল তাৎপর্য ও অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। মোটামুটিভাবে সংক্ষেপে আমরা এই অর্থকে এখন এভাবে দাঁড় করাতে পারি ঃ মানুষের মন আল্লাহর সামনে বিনত ও বিনম্র থাকবে এবং এই সংগে তার শরীরের অংগ-প্রত্যংগ ও ইন্দ্রিয়সমূহও তাঁর সামনে ঝুঁকে পড়বে। সে মনে প্রাণে তাঁর আনুগত্য করবে। তাঁর আনুগত্যের দাবী পূরণ করার জন্য সে তাঁর বন্দেগী, আরাধনা ইত্যাদি

বাহিক্য কাজকর্মও করবে। এভাবে তার অন্তরের কোনো আবেগ, অনুভূতি ও প্রবণতা এবং বাইরের কথা ও কাজ থেকে একথা বুঝা যাবে না যে, তার মধ্যে এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্তার শ্রেষ্ঠত্ব মহত্ত্ব ও প্রাধান্যের ধারণা রয়েছে। অর্থাৎ তার মানসিক প্রবণতা ও দৈহিক কর্মকাণ্ড থেকে এক আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মের প্রকাশ ঘটবে। তার অন্তর ও বাহির এবং তার হৃদয় ও শরীর একযোগে এক আল্লাহর সামনে ঝুঁকে পড়বে।

এভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, কুরআনের বক্তব্য মতে মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ তার শরীরের সমস্ত অংগ প্রত্যংগ এবং হৃদয়ের সমস্ত আবেগ, অনুভূতি ও প্রবণতা একযোগে একমাত্র আল্লাহর সামনে ঝুঁকে পড়বে। সে নিজেকে পুরোপুরি তাঁর সামনে বিনত করবে এবং তাঁর কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করবে। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী চলবে। তাঁর হুকুম ও বিধান পুরোপুরি মেনে চলবে মনের সমগ্র অনুভূতি ও বাহ্যিক অংগ সঞ্চালনের সাহায্যে।

এখন আল্লাহ দুনিয়ায় 'মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্যে' এ বক্তব্য আর মোটেই দুর্বোধ্য থাকে না। এখন এর অর্থ দাঁড়ায়ঃ দুনিয়ার জীবন যাপনের জন্য মানুষকে যে সমস্ত কাজ করতে হয় তা সবই তাকে করতে হবে। কারণ তা না হলে তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু এইসব কাজ করার সময় তার মন ও শরীর আল্লাহর প্রতি সমর্পিত থাকবে। তাঁকে সন্তুষ্ট করাই হবে তার লক্ষ। তাঁর নির্দেশ ও বিধান অনুযায়ী সে সমস্ত কাজ করে যাবে। তাঁর নির্ধারিত হালাল হারামের সীমার মধ্যে অবস্থান করবে। হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতি এবং অংগ-প্রত্যংগের সমস্ত নড়াচড়ার মধ্যে এ সীমারেখা অতিক্রম করার কোনো প্রবণতাই দেখা যাবে না। এই সার্বক্ষণিক ইবাদতকে তরতাজা রাখা ও পরিপুষ্ট করার জন্য আল্লাহ্ নির্ধারিত আনুষ্ঠানিক ইবাদতও সে করতে থাকবে।

দুনিয়ার যে এলাকায় যে ধরনের পরিবেশে মানুষ বাস করুক না কেন তার জন্য এভাবে ইবাদত সম্পন্ন করা মোটেই কঠিন ও অস্বাভাবিক নয়। বরং ইবাদতের এ পদ্ধতি ও তাৎপর্য তার জীবনকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী করবে।

নবুওয়াত : একটি মানবিক প্রয়োজন

মানুষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মানুষের মধ্যে অনেক শ্রেষ্ঠ মানুষ। সাধারণের মধ্যে একদল অসাধারণ। দেখা যায়, একদল উন্নত চরিত্রের অধিকারী মানুষ ইতিহাসের পাতায় বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। দৈহিক শক্তি-সামর্থ-অবয়ব-কাঠামো-সৌন্দর্যের দিক দিয়ে তাদের এই পার্থক্য তেমন গণ্য করার মতো নয়। দেশ, গোত্র, বংশ, আবহাওয়া, পরিবেশের সাথে এর সম্পর্ক তেমন নেই। কিন্তু মানসিক, চিন্তাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক পার্থক্যটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট, যে কোনো অবস্থায় চোখে পড়ার মতো। আমাদের ভাষায় আমরা একে বলি প্রতিভা। প্রতিভা একটা প্রকৃতিগত। আবার এর একটা অনুশীলনগত রূপও আছে। অনুশীলনের সাহায্যে কম মানের প্রতিভাকে উচ্চমানে নিয়ে যাওয়া যায়। আবার উচ্চমানের প্রতিভাকে আরো উচ্চমানেও উন্নীত করা যায়। তবে প্রতিভার ছিটেফোটাও যার মধ্যে নেই তাকে অনুশীলনের সাহায্যে প্রতিভাধর করা যায় না।

মানুষের মধ্যে একদল শ্রেষ্ঠ মানুষ আছেন, তাদের প্রতিভা অনুশীলন ও পরিচর্যার মুখাপেক্ষী নয়। তারা শ্রেষ্ঠ প্রতিভা, উন্নত প্রতিভা। তাদের প্রতিভা যুগ ও কালের সীমানা সবসময় অতিক্রম করে যায়। দেশ ও ভুখণ্ডের চৌহদ্দীর মধ্যেও তারা আটকে থাকে না।

এমনি শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর মানুষেরা চিরকাল সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করে এসেছেন। সাধারণ মানুষ সবিস্ময়ে তাদের প্রতিভার সামনে মাথা নত করে এসেছে। এদের মধ্যে এমন একদল আছেন, যাদের প্রতিভার বিকাশ ও স্ফুরণ ক্রমিক পর্যায়ে সাধিত হয়। আবার একদলের প্রতিভার কোনো ক্রমিক বিকাশ দেখা যায় না। হঠাৎ এই প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁরা সাধারণ মানুষদের মতোই বাস করছিলেন। শৈশব, কৈশোর, যৌবনে তাদের মধ্যে কোনো বিশেষ প্রতিভার লক্ষণ দেখা যায়নি। হঠাৎ বয়সের একটা বিশেষ সন্ধিক্ষণে এসে দেখা যায় তাঁরা অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী। তাঁরা এমন সব কথা বলছেন এবং এমন সব কাজ করছেন যা সাধারণ প্রতিভাধর মানুষের পক্ষে বলা ও করা সম্ভব নয়। তাঁদের এই হঠাৎ প্রতিভার পেছনে কোনো লালন-পরিচর্যার সামান্যতম ভূমিকাও নেই। এই প্রতিভাকে ধর্মের পরিভাষায় আমরা বলি নবুওয়াত।

নবী ও অবতারের মধ্যে পার্থক্য

অবতার হন অতিমানবিক গুণের অধিকারী। মাটির মানুষ, রক্ত-মাংসের মানুষ জাতির সাথে তার কোনো বংশানুক্রমিক সম্পর্ক থাকে না। অবতার হচ্ছেন দেবতা বা ভগবানের অংশ। মানুষের রূপ ধরে তিনি পৃথিবীতে এসেছেন মানুষকে ধর্ম শিক্ষা দেবার জন্য। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সমস্ত কার্যকলাপই অলৌকিক। তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক মানবিক প্রতিভার স্ফুরণ ও বিকাশের প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই তিনি স্বেচ্ছাচারী।

অপরদিকে নবী হচ্ছেন সাধারণ মানুষের মাঝে জন্ম গ্রহণকারী একজন রক্ত-মাংসের মানুষ। তিনি কোনো অতিমানব (Superman) নন। আকাশ থেকে তাঁকে দুনিয়ায় ছেড়ে দেয়া হয়নি। বড়জোর তাঁকে একজন পূর্ণ মানুষ ও আদর্শ মানুষ (কামিল ইনসান) বলা যায়। তিনি মানুষের বংশোদ্ভূত। তাঁর একটা বংশধারাও আছে। জন্মের পর থেকে সাধারণ মানুষদের মধ্যে তিনি জীবন যাপন করতে থাকেন। খাওয়া দাওয়া, ওঠাবসা, চলাফেরা, কথাবার্তা সবই তাদের মতো। তাঁর আবেগ-অনুভূতি, দুঃখ-শোক, চিন্তা-ভাবনা সাধারণ মানুষের মতোই। মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষের মধ্য থেকে তাঁকে বাছাই করে নেন। তিনিই তাঁর মধ্যে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সৃষ্টি করে দেন। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা, অনুশীলন, পরিচর্যা তিনি নিজ তত্ত্বাবধানে করেন। তাঁর চরিত্রে কোনো দিক দিয়ে সামান্যতম ত্রুটি দেখা দেবার পথও তিনি বন্ধ করে দেন। মহাশক্তিধর আল্লাহর সাথে তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তিনি আল্লাহর ইংগিতে ওঠাবসা করেন। তিনি যাকিছু বলেন আল্লাহর নির্দেশে বলেন। তাঁর চিন্তা-ভাবনা, কার্জকর্ম সবকিছু আল্লাহর হুকুমে নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই তিনি স্বেচ্ছাচারী নন।

নবী আল্লাহর একজন পরিপূর্ণ বান্দা। মানুষের মধ্যে আল্লাহর হুকুম আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর দায়িত্ব। তিনি নিজে আল্লাহর হুকুম পুরোপুরি মেনে চলেন। একজন মানুষ হিসাবে আল্লাহর হুকুম পুরোপুরি মেনে চলে তিনি অন্য সকল মানুষের জন্য এ হুকুম মেনে চলার পথ খোলাসা করে দেন। নবী আল্লাহর হুকুম পালন করে একথা প্রমাণ করে দেন যে, আল্লাহর হুকুম কার্যকর করার বিষয়টা মানুষের সামর্থের বাইরে নয়। অন্যদিকে অবতারগণ হন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। কাজেই আল্লাহর যে-কোনো হুকুম মেনে চলা তাঁদের পক্ষে যতটা সহজ ও সম্ভবপর সাধারণ মানুষের জন্য ততটা সহজ ও সম্ভবপর হবার কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা হয়তো একেবারেই অসম্ভব হয়ে দেখা দিতে পারে।

কাজেই অবতার যে বিধান আনেন তা মানবিক না হয়ে অতিমানবিক হবার সম্ভাবনাই বেশী। আর মানুষের জন্য কোনো অতিমানবিক বিধান লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের মধ্যে হয়তো হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন মানুষের পক্ষেই মেনে চলা সম্ভবপর হতে পারে। তাও একমাত্র তাদের মানবিক চাহিদা, আবেগ-অনুভূতিগুলোর বিনাশ সাধনের পরই এটা সম্ভবপর।

নবী ও ধর্ম প্রবর্তকের মধ্যে পার্থক্য

ধর্ম প্রবর্তক একটা নতুন ধর্মের গোড়াপত্তন করেন। নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও সাধনা তাঁকে একাজে সহায়তা দান করে। ঈশ্বরের সাথে তার কোনো যোগাযোগও থাকতে পারে। কিন্তু তা তাঁর এই নতুন ধর্মের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। তিনি নিজের ইচ্ছামতো এই ধর্মের অবয়ব গঠন করেন। এর চেহারা কাটছাঁট করেন। এর পেছনে নিজের দার্শনিক ব্যাখ্যা জুড়ে দেন। এদিক দিয়ে তিনিও স্বেচ্ছাচারী।

অন্যদিকে নবী কোনো নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেন না। মানুষের নিজের মধ্যে যে ধর্মটি রয়েছে, যে ধর্মের বিধান অনুযায়ী মানুষের সমগ্র দেহ, অংগ-প্রত্যংগ ও তার মন-মানস পরিচালিত হয়, যে ধর্মের বিধান অনুযায়ী বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তু আন্দোলিত হয় এবং স্ব স্ব স্থানে নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে যায়, মানুষের বুদ্ধি, বিবেক, কর্মোদ্যম ও কর্মক্ষমতাকে সেই ধর্মের আওতাধীন করাই নবীর কাজ। তাই নবী যে ধর্মের বার্তা প্রচার করেন তাকে বলা হয় প্রকৃতির ধর্ম বা স্বভাব ধর্ম। নবী আনেন আল্লাহর কাছ থেকে একটি বিধান। তাঁর এ বিধান মানুষের মৌল প্রকৃতি ও স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যশীল। মানুষ বুদ্ধি ও বিবেকের সাহায্যে পরিচালিত হয়। তার বুদ্ধি ও বিবেককে আশপাশের প্রাকৃতিক বিধানের সাথে সামঞ্জস্যশীল করার জন্যই নবী আল্লাহর কাছ থেকে একটি স্বাভাবিক বিধান এনে মানুষের সমাজে প্রবর্তন করেন। প্রকৃতি জগতের পরিভাষায় একে বলা হয় ইসলাম। অর্থাৎ এ বিধানের কাছে সবাই আত্মসমর্পিত এবং এর কাছে সবাইকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কাজেই নবীর বিধান চিরন্তন ও মানবিক চাহিদার উপযোগী।

নবী ও দার্শনিকের মধ্যে পার্থক্য

দার্শনিকের চিন্তা কল্পনাশ্রিত। থাকতে পারে তার পেছনে সবল যুক্তির প্রাচীর। কিন্তু নিখাদ জ্ঞানের রাজ্য থেকে তিনি থাকেন অনেক দূরে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার রাতের পথিকের মতো দার্শনিক চলেন, আন্দাজ অনুমান করে। কোথায় পথের শেষ, কোথায় পথের শুরু, কোথায় গর্ত, কোথায় অসমতল,

আবার কোথায় সমতল ক্ষেত্র তার কোনো ঠিক ঠিকানা জানা নেই দার্শনিকের। তিনি যেন নিজের চিন্তা ও কল্পনার হাতে বন্দী একটা অক্ষম পাখি। উড়তে চান নিসীম নীলের বুকে পাখা মেলে কিন্তু পথ জানা নেই। তিনি যে পথে পাড়ি জমান তার শেষ দেখা পান না। যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তার উপর টিকে থাকতে পারেন না। নিজের মন ও মস্তিষ্কের সমস্ত শক্তি দিয়ে কোনো বিষয়কে চূড়ান্ত সত্য বলতে পারেন না। তাঁর সব সত্যই মিথ্যা। সব মিথ্যার মধ্যেই তিনি সত্যের ছায়া দেখতে পান। দার্শনিকের জ্ঞানের শুরু-সংশয়ে, শেষ সংশয়ে। তাঁর কাছে চূড়ান্ত সত্য বলে কিছু নেই।

দার্শনিক যে ধর্মের প্রবর্তন করেন তার মধ্যে চিন্তা ও কল্পনার বিস্তৃত চারণ ক্ষেত্র থাকলেও তাদের যথার্থ খোরাক নেই। মানুষকে সেখানে পদে পদে স্ববিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। দার্শনিকের অনুসারীরা ধীরে ধীরে সত্য থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। হাজার হাজার দার্শনিক বলেন, হাজার হাজার কথা। একজনের সাথে অন্যজনের কথার মিল নেই। বরং একজন যে সিদ্ধান্তের কথা বলেন, অনেক ক্ষেত্রে অন্যজন বলেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তের কথা। দুজন দার্শনিকের কোনো একটি বিষয়ে পুরোপুরি একমত হওয়া একটি বিরল ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়।

অন্যদিকে নবীর জ্ঞান পরিপূর্ণ বিশ্বাসের অপর নাম। তিনি আন্দাজ অনুমানে কোনো কথা বলেন না। তিনি যা বলেন, সেটাই সত্য, যা করেন সেটাই ন্যায়। অসত্য কথন ও অন্যায় কাজ নবীর দ্বারা অসম্ভব। নবী নিজের ইচ্ছামতো কোনো কথা বলতে পারেন না। আল্লাহ যে কথা বলাতে চান সে কথাই নবী বলেন। আল্লাহ যে কাজ করাতে চান সে কাজই নবী করেন। নবীর প্রত্যেকটি কথা সংশয়কে দূরে ঠেলে দেয় এবং প্রত্যয়কে কাছে টেনে আনে। নবী জানেন তাঁর পথের কোথায় শুরু ও কোথায় শেষ। নবী তাঁর পথের চড়াই-উতরাই, সমতল-অসমতল ক্ষেত্র সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। তাঁর পথের বাধা-বিপত্তি, অনুকূল-প্রতিকূল পরিবেশ সব তাঁর জানা। নবী নিজে যেমন সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছেন তেমনি তাঁর অনুসারীরাও পেয়েছে সঠিক পথ। নবীকে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে, যুক্তি প্রয়োগ করে কোনো সত্য আবিষ্কার করতে হয় না। আল্লাহর হুকুমে পূর্ণ সত্য তাঁর কাছে ধরা দেয়।

দুনিয়ার শত শত দেশে হাজার হাজার বছর ধরে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নবী একই কথা বলে গেছেন। তাদের কারোর কথার মধ্যে সামান্যতম গরমিল দেখা যায়নি। সবাই একই সত্যের পুনরাবৃত্তি করেছেন। একটি পূর্ণ সত্যের চেহারা তাঁদের সবার সামনে উন্মুক্ত হয়েছে এবং তাঁরা সবাই তারই সাক্ষ

দিয়েছেন। এটাই একটা নিশ্চিত বিশ্বাস এবং সংশয়মুক্ত জ্ঞান। দার্শনিকের কাছে এই জ্ঞানের ছিটেফোঁটাও নেই।

নবী যে ধর্মের দিকে মানুষকে নিয়ে যান তার ওপর তিনি নিজে যেমন পূর্ণ বিশ্বাস করেন তেমন তাঁর অনুসারীরাও। চিন্তাভাবনা যেমন সেখানে পায় উপযোগী চারণক্ষেত্র তেমনি পায় স্বাভাবিক মনের খোরাক। ফলে নবীর ধর্মের অনুসারীদের দেহের সাথে সাথে মনও পরিপুষ্ট হয়।

নবীর কাজ

এ বিশ্বজগতটাই মানুষের কাছে একটি রহস্য। এর সৃষ্টি, বিকাশ, সম্প্রসারণ, পরিচালনা, সবকিছুই রহস্যাবৃত। বিজ্ঞান এ রহস্য ভেদের চেষ্টা করেছে। কিন্তু তা বিজ্ঞানের আওতাধীন নয়। কারণ বিজ্ঞান তো উপস্থিত বস্তুর (যা দৃষ্টি বা অনুভবের আওতাধীন) সাহায্যে অনুপস্থিতের নাগাল পায়। আর বিশ্বজগতের অনেক কিছুই অনুপস্থিত। অনেক কিছুই দৃষ্টি ও অনুভবের নাগালের বাইরে। দার্শনিকও এ রহস্যের গভীরে প্রবেশের জন্য নিজের সমস্ত জ্ঞান, বুদ্ধিবৃত্তি ও চেতনাকে সক্রিয় করেছেন। কিন্তু এই অথৈ সমুদ্রের নাগাল পাওয়া তাঁর বুদ্ধি, যুক্তি, জ্ঞান ও হৃদয়ানুভূতির অসাধ্য। ফলে এখানে রহস্যের সবটুকুই রহস্য রয়ে গেছে।

এই রহস্য জগতের স্রষ্টা নিজেই যদি রহস্যভেদ না করেন তাহলে এ রহস্যের মর্মমূলে পৌঁছানো কারো পক্ষে সম্ভব নয়। স্রষ্টা নিজের ইলাহী সত্তাকে আবৃত রেখে ইলাহী গুণাবলীকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। ইলাহী গুণাবলীর মাধ্যমে ইলাহী সত্তার ধারণায় পৌঁছে যাওয়া একটি সম্ভাব্য বিষয়। এর আগে আরো অগ্রসর হবার ক্ষমতা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির নেই।

এখান থেকে শুরু নবীর আসল কাজ। মানুষের সৃষ্টির কারণ কি ? কোন্ দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে ? কোন্ পথে সে এ দায়িত্ব পালনে সক্ষম? আর এ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হলে বিশ্বজগতের সুশৃংখল ব্যবস্থাপনার মধ্যে মানুষও কিভাবে সুশৃংখল ও শান্তিময় জীবনের অধিকারী হবে ? একমাত্র নবীই এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব দিয়ে মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে পারেন।

'নবী' একটি আরবী শব্দ। এর মূলে আছে 'নাবা-উন'। মানে খবর। নবী মানে যিনি খবর আনেন। আরবীতে নবীর আর একটি প্রতিশব্দ আছে 'রসূল'। রসূল মানেও যিনি খরব বহন করে আনেন বা যাঁকে পাঠানো হয় খবর দিয়ে। ফারসীতে একে বলা হয় 'পয়গম্বর'। অর্থাৎ যিনি পয়গম বা বাণী বহন করে

আনেন। আসলে নবী, রসূল বা পয়গম্বর আল্লাহর কাছ থেকে খবর আনেন মানুষের জন্য। নবী ছাড়া মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী আর দ্বিতীয় কোনো সংস্থা নেই। মানব জগত ও ইলাহী জগত তথা আলমে মালাকুত-এর মধ্যে নবীই সংযোগ রক্ষা করে চলেন। কোনো বিজ্ঞানী, দার্শনিক, অবতার বা ধর্ম প্রবর্তকের পক্ষে এটা সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহ নিজেই তাদের সে মর্যাদা ও সম্মান দান করেননি।

নবী আমাদেরই মতো মানুষ। তবে আমাদের সাথে তাঁর পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, আল্লাহর সাথে তাঁর সরাসরি যোগ রয়েছে, যা আমাদের নেই (কুল ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম ইউহা ইলাইয়্যা)–'বলে দাও, হে মুহাম্মদ ! আমি তোমাদেরি মতো একজন মানুষ, তবে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, আমার ওপর আল্লাহর অহী বা বাণী অবতীর্ণ হয়।'–(আল কুরআন)

নবীর দ্বিতীয় কাজটি আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হচ্ছে, নিজে আল্লাহর সমস্ত বিধান পুরোপুরি মেনে চলে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। নবী যদি এ কাজটি না করতেন তাহলে আসলে নবী আগমনের কোনো প্রয়োজন হতো না। আল্লাহ তাঁর বাণী কোনো ফেরেশতাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারতেন। অথবা কোথাও কোথাও যেমন অবতারের ধারণা প্রচলিত আছে সেভাবেও পাঠাতে পারতেন। কিংবা সরাসরি আকাশ থেকে তাঁর বিধান সম্বলিত একটি কিতাব নামিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু এরপর সেটা মেনে নেয়া, তার বিধানগুলোর ব্যাখ্যা করা এবং পার্থিব জীবনে সেগুলো বাস্তবায়িত করে দেখিয়ে দেবার প্রশ্ন থেকে যেতো। তবে মানুষের মধ্য থেকে একজন মানুষকে বাছাই করে নিয়ে তার কাছে এ বিধানগুলো পাঠিয়ে দেবার পর যখন তিনি নিজের জীবনে এগুলো বাস্তবায়িত করে দেখিয়ে দেন তখন অন্য কোনো মানুষের পক্ষ থেকে এগুলো মানুষের পক্ষে মেনে চলা সম্ভব নয়—এ ধরনের কথা বলার আর কোনো অবকাশ থাকে না।

আদর্শ মানুষ

আদর্শ মানুষের আলোচনা আমরা কেন করি ? মানুষের জন্য শুধু আদর্শই যথেষ্ট নয়, আদর্শ মানুষেরও প্রয়োজন। একটা সুন্দর মহত্তম আদর্শ মানুষের মন জয় করতে পারে, তার চিন্তা অনুভূতিকে অভিভূত করে তার হৃদয়রাজ্যে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব করতে পারে। কিন্তু তাকে আদর্শ মানুষ হিসেবে তৈরী করতে পারে না। এজন্য ঐ আদর্শের রঙে রঞ্জিত আদর্শ মানুষের প্রয়োজন। এজন্য এমন একজন আদর্শ মানুষের গাইডেন্স বা নেতৃত্বের প্রয়োজন, যিনি প্রতি পর্যায়ে প্রতিক্ষেত্রে প্রতি পদক্ষেপে নিজের জীবনে এ আদর্শের বাস্তবায়ন করবেন। এটা শুধু তাত্ত্বিক ফরমূলা নয়, বাস্তব জীবনের কার্যোপযোগী উপাদান, এর পেছনে কোনো অতি মানবিক শক্তির প্রয়োজন নেই, সাধারণ মানবিক শক্তি-সামর্থ, পরিবেশ, কাঠামো এর পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট—একথা তিনি নিজের জীবনে এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রমাণ করে গেছেন।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কেমন চমৎকারভাবে একথাটি তুলে ধরেছেন ঃ "কানা খুলুকুহুল কুরআন" অর্থাৎ কুরআন যে আদর্শের বাণী প্রচার করেছে রসূলের সমগ্র জীবন সেই আদর্শেরই মূর্তিমান প্রতিচ্ছবি; কাঠামো, অবয়ব, বাস্তব প্রাণবান দেহ। তাঁর জীবনের নিত্যকার কার্যবিবরণী আর কিছুই নয়, কুরআনের ধারা বিবরণী মাত্র। তাঁর ইবাদত বন্দেগী, নিশি জাগরণ, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, কুরআনের বাইরের কোনো চাপানো বিষয় নয়। তাঁর সংসার জীবন যাপন, স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয়দের সাথে ব্যবহার কুরআনের নির্দেশের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তাঁর সাধারণ মানুষের সাথে লেনদেন, আচার-ব্যবহার, সেনাদল গঠন, যুদ্ধ পরিচালনা, দেশ শাসন সবকিছুই কুরআনিক বিধানের বাস্তব প্রাণবন্ত রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। কুরআনকে ও রসূলের জীবনকে পাশাপাশি রাখলে মনে হয় কুরআনই রসূলের জীবন এবং রসূলের জীবনই কুরআন।

মানুষের জন্যই শুধু আদর্শের প্রয়োজন নয়, আদর্শের জন্যও মানুষের প্রয়োজন—একথা আজ প্রমাণিত সত্য। দুনিয়ায় কত মানুষ আদর্শের বাণী বহন করে এনেছেন সুন্দর থেকে সুন্দরতম। সেই আদর্শের বাণী ঝংকারে নন্দিত হয়েছে দশদিক। সভ্যতার প্রাসাদে ফাটল ধরেছে। গড়ে উঠেছে নতুন সমাজ-সংস্কৃতি-সভ্যতা। এই আদর্শের বাণীবাহকদের একটি দল শুধুমাত্র পার্থিব জীবনের মধ্যেই তাদের চিন্তা ও কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

নিজেদের সীমিত বুদ্ধি, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, আবেগ, অনুভূতির আলোকে তাঁরা মানব জাতির জন্য একটি পথের সন্ধান দিয়েছেন। সমাজ-সভ্যতার কাঠামো নির্মাণে ও পরিবর্তনে তারা একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন। প্লুটো, এরিষ্টটল থেকে নিয়ে ডারউইন, মার্কস পর্যন্ত আমরা এমনি অনেক জ্ঞানী, গুণী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, আইন শাস্ত্রবিদ, ইতিহাসবিদ, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, রাষ্ট্রনায়ক, সমরনায়ক ও সমাজসেবীর সাক্ষাত পাই। তারা মানুষের জন্য যেসব পথের সন্ধান দিয়েছেন সেগুলোর পরিভ্রমণ শুধু পার্থিব জীবন পরিসরে সীমাবদ্ধই নয়, সেগুলোর একটির সাথে অন্যটির পার্থক্য, বিরোধ ও সংঘাত অত্যন্ত প্রবল। তার উপর সেগুলোর পরিবর্তনশীলতাও সুস্পষ্ট। তাই তাদের কোনো দীর্ঘস্থায়িত্ব নেই। তাদের একটি অন্যটির সমালোচনা ও ভুল নিরূপণে এতই তীক্ষ্ণ যে, আজ তাদের কোনটিরই ভ্রান্তি অপ্রমাণিত সত্য নয়। ফলে সভ্যতা, সমাজ, সংস্কৃতির ধ্বংসকার্যে তারা সবাই কমবেশী সমানভাবে অংশ নিয়েছে।

এহেন আদর্শের বাণীবাহকদের মানব সমাজের আদর্শ হবার প্রশ্ন ওঠে না। তা ছাড়া একটি বিবর্তনমূলক চিন্তার মাধ্যমে তাদের মতবাদ ও আদর্শের গঠন ক্রিয়া চলেছিল বলে তাদের মানস ও চরিত্র গঠনে তার প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। এহেন চরিত্রের কোনো স্থির ও একনিষ্ঠ ঐতিহ্য থাকে না যা মানবতার জন্য আদর্শ হতে পারে। তাই মানুষের জন্য কোনো আদর্শ তাঁরা আনতে পারেন কিন্তু আদর্শ মানুষ হবার যোগ্যতা তাঁদের নেই।

আদর্শের বাণীবাহকদের দ্বিতীয় দলটি পার্থিব জীবনের সাথে সাথে পারলৌকিক জীবন এবং জীবনের বস্তুগত চাহিদার সাথে সাথে তার আত্মিক চাহিদা পূরণের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তাঁদের কার্যক্রমের মধ্যে জাগতিক শক্তির পেছনে একটি অতি জাগতিক শক্তিকে সক্রিয় দেখা যায়। তাঁদের আদর্শের পেছনে তাঁরা নিজেদের কোনো চিন্তা, অভিজ্ঞতা, আবেগ-অনুভূতির সামান্যতম যোগ আছে বলে দাবী করেন না। তাঁদের কারোর আদর্শ ও বক্তব্যের মধ্যে মূলগতভাবে কোনো বিরোধ ও সংঘাত নেই। তাঁদের সবার একই বক্তব্য ঃ উ'বুদুল্লাহা ওয়াজতানিবুত্ তাগুত অর্থাৎ 'আল্লাহর ইবাদত কর এবং আল্লাহ বিরোধী শক্তির ইবাদত ও আনুগত্য পরিহার কর।'

জরথুস্ত্র, বর্ধমান মহাবীর, গৌতম বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ ধর্ম নেতারা, যাঁদের ধর্মের বিকৃতরূপটুকু শুধু আজ আমাদের সামনে আছে, আসল ধর্ম কি ছিল তার কোনো হদিসই পাওয়া যাচ্ছে না, তাঁরাও অতি জাগতিক শক্তির প্রবক্তা

এবং দেহের সাথে সাথে আত্মার চাহিদা পূরণের ব্যাপারে তাঁরাও সোচ্চার। নিজেদের আদর্শের পেছনে তাঁরা অতি জাগতিক শক্তির প্রেরণাকে সক্রিয় দেখিয়েছেন। অন্যদিকে নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা আলাইহিস সালাম প্রমুখ নবীদের যতটুকু চিত্র বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায় তার এবং শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শের মধ্যে কোনো অমিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁরা সবাই একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেছেন। তাঁদের আদর্শ ও বক্তব্যগুলো কোনো চিন্তার বিবর্তন বা অভিজ্ঞতার ফসল নয়। সবই অতি জাগতিক সত্তা মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে আরোপিত। ফলে তাদের জীবন ও চরিত্রের মধ্যে কোনো অপরিপক্কতা, খাদ ও বৈসাদৃশ্য দেখা যায় না। তাঁরা মানব সমাজের আদর্শ হবার যোগ্যতা রাখেন।

তাঁরা সবাই আমাদের আদর্শ এতে সন্দেহ নেই। তবে তাঁরা আমাদের আদর্শ হওয়া সত্ত্বেও একমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া তাঁদের কারোর জীবনের সমস্ত দিক বিশ্ববাসীর সামনে নেই। সভ্যতার উন্নতি লাভের পূর্বে তাঁদের কর্মকাণ্ডের বিকাশ লাভের কারণে তাঁদের সমগ্র কর্মকাণ্ড ও জীবন চিত্র সংরক্ষিত রাখা সম্ভবপর হয়নি। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব হয় এমন এক যুগে যখন বিশ্ব সভ্যতা উন্নতির শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। ফলে তাঁর সমগ্র জীবন ও কর্মকাণ্ড পুরোপুরি ও হুবহু সংরক্ষিত রাখা সম্ভবপর হয়েছে। এছাড়াও তিনি এমন একদল নিবেদিত প্রাণ কর্মী তৈরী করে যান যারা তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর সমগ্র কার্যাবলী যথাযথভাবে সংরক্ষিত রাখার জন্য প্রাণপাত করে গেছেন। তাদের পর তাদের অনুসারীরা এবং এভাবে তাদের পরবর্তী বংশধররা এগুলো সংরক্ষণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। এভাবে আমাদের কাছে পর্যন্ত সেগুলো আসল চেহারায় পৌঁছে গেছে। তাই আজ আমাদের কাছে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার ও মেনে চলার মতো এই একজন মাত্র নবীর জীবন রয়ে গেছে।

এতো গেলো আমাদের আলোচনার একটি দিক। অর্থাৎ যাদেরকে আমরা আদর্শ বলে মেনে নিয়েছি তাদের সমগ্র জীবন ও কর্মকাণ্ড আমাদের সামনে আছে কিনা—আমাদের এ আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো, অন্তত একজন অর্থাৎ শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমগ্র জীবন ও কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত রূপ আমাদের সামনে আছে। এখন দেখা দরকার মহানবীর জীবন ও কর্মকাণ্ড আমাদের আদর্শ কিভাবে?

মহানবীর জীবনের প্রত্যেকটি কাজ আমাদের জন্য আদর্শ। নবী হিসাবে আল্লাহর সাথে তাঁর একটি বিশেষ সম্পর্ক ছিল। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ ইন্নামা

আনা বাশারুম মিছলুকুম ইউ হা ইলাইয়্যা 'নিসন্দেহে আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ তবে পার্থক্য শুধু এতটুকু আমার ওপর অহী নাযিল হয়।'

তাঁর ওপর অহী নাযিল হবার কারণে ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে কিছু বর্ধিত শক্তি সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল। এজন্য এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের তুলনায় তাঁর মধ্যে কিছু বেশী শক্তি ছিল। যেমন তিনি দিনের পর দিন রোযা রাখতেন, মাঝখানে কোনো ইফতারি করতেন না। সাধারণ মানুষের জন্য এটা সম্ভবপর ছিল না। সাধারণ মুসলমানদেরকে তাই তিনি এইভাবে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের অন্যান্য দিকে তিনি একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন। সাধারণ মানুষের আবেগ অনুভূতি-আকাংখা সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না সবই তাঁর জীবনে ছিল।

স্ত্রীদের কাছে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ স্বামী। নবুওয়াতের মহান দায়িত্ব পালন করার পরও তিনি ঘর সংসারের কাজে স্ত্রীর সাথে সহযোগিতা করতেন। স্ত্রীদের মনোরঞ্জন করতেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার অনেক কম বয়সে বিয়ে হয়। তিনি বর্ণনা করেছেন "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংসারে এসেও আমি পুতুল নিয়ে খেলা করতাম। আমার কয়েকজন সই ছিল। তারা আমার সাথে খেলা করতো। রসূলুল্লাহ (স) ঘরে আসলে তারা লুকিয়ে পড়তো। তিনি তাদের খুঁজে খুঁজে বের করে এনে আমার সাথে খেলা করার জন্য পাঠিয়ে দিতেন।"-(বুখারী ও মুসলিম)

সন্তানদের প্রতি স্নেহ মায়া মমতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আদর্শ। কখনো তিনি তাদের সাথে রূঢ় ব্যবহার করতেন না। তাঁর দুই নাতি হাসান ও হোসাইনকে কোলে কাঁধে করে নিয়ে ফিরতেন। নামাযের সময় তাদেরকে খেলতে বসিয়ে দিয়ে তিনি নামায পড়তেন। তিনি সিজদায় গেলে তারা নানার পিঠে চড়ে বসতো। কিন্তু সিজদা থেকে উঠতে গেলে তারা পড়ে যাবে এ ভয়ে তারা পিঠ থেকে নেমে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি সিজদা থেকে মাথা তুলতেন না।

এমনিভাবে ভাই-বেরাদর ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি তাঁর ব্যবহারও ছিল আদর্শ স্থানীয়।

সামাজিক পর্যায়ে মানুষের সাথে দেনা-পাওনা ও লেন-দেনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সে সমাজের আদর্শ। নবুওয়াত লাভের পূর্ব থেকেই এ ক্ষেত্রে তাঁর সুনাম প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি এ ব্যাপারে পুরোপুরি বিশ্বস্ত ছিলেন বলেই কেউ তাঁর কাছে আমানত রাখতে কখনো দ্বিধা করতেন না। সংসারের ব্যয় নির্বাহের

জন্য তাঁকে অনেক সময় ইহুদী মহাজনের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হতো। কিন্তু আর্থিক সামর্থ লাভ করার সাথে সাথেই তিনি ঋণদাতাদের ঋণ প্রথমেই পরিশোধ করে দিতেন।

মদীনায় আসার পর এখানে একটি পূর্ণাংগ ইসলামী রাষ্ট্র তিনি গড়ে তুললেন। এ রাষ্ট্রের তিনিই হলেন প্রধান। তিনি ছিলেন এ রাষ্ট্রের আদর্শ শাসক। এ রাষ্ট্রে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান কাজ, যা সমকালীন সমাজ পরিবেশে ছিল একান্ত দুর্লভ। কিন্তু তিনি এ দুর্লভ কাজটি সমাধা করে প্রমাণ করলেন, ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকারের দিক দিয়ে সবাই সম মর্যাদা সম্পন্ন। ফাতিমা নাম্নী এক সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলার বিরুদ্ধে তার কাছে চুরির অভিযোগ আসে। কেউ কেউ মেয়েটির উচ্চবংশ মর্যাদার কারণে তাকে ক্ষমা করার সুপারিশ করেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থেকে বলেন, এ যদি আমার মেয়ে ফাতিমা হতো তাহলেও আমার সিদ্ধান্তের নড়চড় হতো না।

হকদারকে তার হক আদায় করার ব্যাপারে তিনি এতই সজাগ ছিলেন যে, একদিন নামায শেষে সালাম ফিরেই তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং লাইন ভেদ করে দ্রুত নিজের হুজরার মধ্যে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলেন ঃ কিছু সাদকার অর্থ এসেছিল। সেগুলো বিলি করে দায়িত্বমুক্ত হয়ে এলাম।

তাঁর জীবদ্দশায় যতগুলো জিহাদ হয়েছে তার অনেকগুলোতে তিনি সশরীরে হাজির ছিলেন। তিনি নিজেই সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন। সৈন্য যে কোনো যুদ্ধে পাঠাবার আগে তিনি নির্দেশ দিতেন ঃ নারী, বৃদ্ধ ও শিশুদের হত্যা করবে না, কোনো ফলন্ত শস্যক্ষেতের ওপর দিয়ে সৈন্য পরিচালনা করে শস্যের ক্ষতি করবে না। যুদ্ধক্ষেত্রে কোনো মুশরিক কালেমা পড়ার সাথে সাথেই তিনি তার বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করতে নিষেধ করেন। একবার হযরত খালেদ ইবনে অলীদকে (রা) ইয়ামনে পাঠান। তিনি সেখানে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে জনৈক ইয়ামনী ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু হযরত খালেদ (রা) তার অঙ্গীকারকে চালবাজী মনে করে তার কথায় বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেন এবং তাকে হত্যা করেন। এ ঘটনার খবর মদীনায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে এসে পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন ঃ 'হে আল্লাহ ! খালেদ যা করেছে তার কোনো দায়িত্ব আমার ওপর নেই।'

এভাবেই রসূলের সমগ্র জীবন আলোচনা করলে আমরা দেখি তিনি একদিকে যেমন একজন আদর্শ পিতা, আদর্শ স্বামী, আদর্শ আত্মীয় তেমনি অন্যদিকে একজন আদর্শ নাগরিক, আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক ও আদর্শ শাসক। মোটকথা মানব সমাজের কোনো সদস্যকে তাঁর মতো এমন সার্থক ও আদর্শ জীবন যাপন করতে আমরা দেখি না। তাই মহান আল্লাহ কুরআনে উদ্ধৃত করেছেন ঃ লাকাদ কানা লাকুম ফি রসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ। 'তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে একটি মহত্তম আদর্শ।'

রসূলের দাওয়াতের বুদ্ধিদীপ্ত সূচনা

মানুষের প্রতি আল্লাহর করুণার অন্ত নেই। তবে বিশ্ব-মানবতার প্রতি তাঁর সবচাইতে বড় করুণা ও রহমত হচ্ছে নবুওয়াত। আল্লাহ নিজে অসীম করুণার বশবর্তী হয়ে যদি নবীদের মাধ্যমে মানুষকে পথ দেখাবার ব্যবস্থা না করতেন তাহলে মানুষ নিজের বুদ্ধি-জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে কখনো নিজের প্রচেষ্টায় সঠিক পথের সন্ধান পেত না।

এ তো গেল সামগ্রিকভাবে মানুষের প্রতি আল্লাহর করুণার একটি দিক। আর বিশেষ করে শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির প্রতি তাঁর করুণা ধারা বর্ষিত হয়। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে যতজন নবী এসেছেন, তাঁরা যে দেশে ও যে জাতির মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন সে জাতি যদি সাধারণভাবে তাঁদের গ্রহণ না করত বা তাঁদের দাওয়াত মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাত তাহলে সরাসরি আল্লাহর আযাব এসে তাদেরকে ধ্বংস করে দিত। কারণ তারা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করে যেত এবং তাদের হিদায়েতের কোন পথ খোলা থাকত না। আল্লাহর এ চিরন্তন নীতি অনুযায়ী নূহ আলাইহিস সালামের কওমকে জল প্লাবনের সাহায্যে ধ্বংস করা হয়। হুদ আলাইহিস সালামের জাতিকে ধ্বংস করা হয় ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের সাহায্যে। সালেহ আলাইহিস সালামের কওম মারাত্মক ভূমিকম্পের ফলে চিরকালের জন্য ধরার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আরো কয়েকজন নবীর কওমের সাথে এ ধরনের ব্যবহার করা হয়। নাফরমানী করার কারণে দুনিয়ার বুক থেকে তাদের নাম-নিশানা মুছে ফেলে দিয়ে মানব জাতির অনাগত বংশধরদের জন্য এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে ঃ

فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ-

'মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছে তা একবার তোমরা প্রত্যক্ষ কর।'—কুরআনের এ আয়াতের মধ্যে এ সত্যটির প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে।

অন্যান্য নবীর কওমের ন্যায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কওমও তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা নবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজেদের জন্য আল্লাহর আযাব দাবী করে বসে। কিন্তু অন্যান্য নবীর কওমের মত আল্লাহ তাঁর কওমকে ধ্বংস করেননি। কারণ তিনি

শেষ নবী। তাঁর ওপর আরোপিত দায়িত্ব তাঁর ইন্তিকালের পরে খতম হয়ে যাবে না বরং তা তাঁর উম্মতের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে। কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বমানবতাকে আল্লাহর দীনের দাওয়াত দেবার দায়িত্ব তাঁর উম্মতের ওপর অর্পিত হবে। তাই আল্লাহ তাদেরকে সুযোগ দেন যাতে তারা নিজেরাই কুফরী ও গোমরাহীর গলদ উপলব্ধি করে বিদ্রোহের পথ পরিহার করে, যাতে তারা আল্লাহর অবারিত করুণার স্পর্শে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ইসলামের ইহকালীন ও পরকালীন শান্তির ছায়ায় এসে আশ্রয় নেয়। তাই কাফেরদের আযাবের দাবী উপেক্ষা করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কওমকে আল্লাহ তাদের ভুল সংশোধন করার সুযোগ দেন–এটা তাঁর অপার করুণা। কুরআনে কাফেরদের এই দাবীর কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

> 'হে আল্লাহ ! যদি এ দীন ইসলাম সত্য হয়ে থাকে এবং তোমার পক্ষ থেকে এসে থাকে, তাহলে তুমি আকাশ থেকে আমাদের ওপর পাথর বর্ষণ করো এবং আমাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক আযাব নাযিল করো। কিন্তু (তাদেরকে বলে দাও) হে রসূল ! যতক্ষণ তুমি তাদের মধ্যে আছ, আল্লাহ তাদেরকে আযাব দেবেন না। অনুরূপভাবে যতক্ষণ তারা নিজেদের গোনাহর জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে, ততক্ষণও আল্লাহ তাদেরকে আযাব দেবেন না।'-[সূরা আল আনফাল ঃ ৩২-৩৩]

দাওয়াতের সূচনা

আল্লাহর এ উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দাওয়াতকে পর্যায়ক্রমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করেন। প্রথম পর্যায়ে দাওয়াতের পথে যাতে দুস্তর বাধার সৃষ্টি না হয় এবং স্বাভাবিক গতিতে সহজে স্বচ্ছন্দে তা এগিয়ে যেতে পারে সে জন্য তিনি প্রথমে কুরাইশদের বড় বড় সরদারদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেননি। কারণ এ সরদাররা যেমন একদিকে ছিল অহংকারী, তেমনি অন্যদিকে নিজেদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যের প্রতি ছিল অন্ধ বিশ্বাসী। আর জনগণের অন্ধ বিশ্বাসকে পুঁজি করে গড়ে উঠেছিল তাদের স্বার্থ, প্রতিপত্তি ও গৌরবের বিরাট কারবার। কাজেই তাদের এ স্বার্থের কারবারের গায়ে সামান্য আঁচড় লাগলেই তারা যে চতুরদিক থেকে মারমুখো হয়ে তেড়ে আসবে এবং ইসলামের দাওয়াতকে প্রথম পর্যায়েই গলা টিপে হত্যা করবে, তাতে সন্দেহ ছিল না। এজন্য রসূলুল্লাহ (স) সর্বপ্রথম তাদেরকে দাওয়াত দেন যাদের সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, তারা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করবে। তাই তিনি প্রথমে দাওয়াত দিলেন তাঁর স্ত্রী খাদীজাকে (রা), যিনি তাঁর সুখে-দুঃখে

চিন্তা-ভাবনায় পূর্ণ মাত্রায় শরীক ছিলেন এবং তাঁর দাওয়াত উপলব্ধি করার ব্যাপারে যাঁর বিন্দুমাত্রও ভুল হবার কারণ ছিল না। দ্বিতীয় যে ব্যক্তিকে তিনি দাওয়াত দিলেন, তিনি তাঁর চাচাত ভাই হযরত আলী (রা)। চাচা আবু তালিবের কাছ থেকে তিনি এ ভাইটিকে নিয়ে লালন-পালন করেছিলেন। তাঁর এ দাওয়াতের প্রথম পর্যায়ে তৃতীয়জন ছিলেন তাঁর প্রিয় গোলাম যায়েদ ইবনে হারিসা (রা)। এ যায়েদ তাঁর গোলাম হলেও তিনি তাকে এত ভালবাসতেন যে, তাকে নিজের পুত্র বানিয়ে নিয়েছিলেন। সুখে-দুঃখে যায়েদ ছিলেন তাঁর নিত্য সহচর। এরপর চতুর্থ যে ব্যক্তির ওপর তাঁর দৃষ্টি পড়ে এবং যিনি তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেন, তিনি তাঁর পরিবারের লোক না হলেও সমগ্র কুরাইশ সমাজে ছিলেন তাঁর সবচাইতে অন্তরংগ বন্ধু। রসূলের পরই কুরাইশদের মধ্যে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ সৎ ব্যক্তি। কুরাইশদের গোমরাহী ও পাপাচারের প্রতি তিনি কেবল বিমুখই ছিলেন না বরং অনেক ক্ষেত্রে ছিলেন তার বিরূপ সমালোচক। এহেন সৎ ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) প্রথম পর্যায়ে তাঁর দাওয়াতে সাড়া দেবার কারণে দাওয়াত সত্যিকারভাবে একটি শক্তিশালী ভিত্তি খুঁজে পায়।

ঘরে বাইরে দু'টি শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব তাঁর দাওয়াত ও আন্দোলনের ভিত মজবুত করে। ঘরে ছিলেন হযরত খাদীজা (রা)। তাঁর স্ত্রী। তাঁকে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসতেন। তাঁর নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে তিনি পুরোপুরি সহায়তা করেন। তাঁর দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য হযরত খাদীজা (রা) ছায়ার মত সবসময় তাঁর পেছনে থাকতেন। বিরোধীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যখনই তিনি শ্রান্ত ক্লান্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ঘরে ফিরে আসতেন, হযরত খাদীজার প্রেমপূর্ণ কথাবার্তা তাঁর হৃদয়ে শান্তির সুশীতল ধারা প্রবাহিত করত। তাঁর সমস্ত ধন-দৌলত আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামী দাওয়াতের এই প্রাথমিক পর্যায়ে এ অর্থ সম্পদকে পুরোপুরি কাজে লাগান।

দ্বিতীয় শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন বাইরের। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)। তিনি ছিলেন মক্কার একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী। তাঁর স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার মক্কার জনপদে ছিল তুলনাবিহীন। উন্নত চরিত্রগুণে তিনি ছিলেন জনপদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। কুরাইশদের বড় বড় ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ সবসময় তাঁর কাছে যাওয়া আসা করতেন। তিনি নিজে কেবল ইসলাম গ্রহণ করে ক্ষান্ত হলেন না বরং নিজের অন্তরংগ বন্ধু মহলেও ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রা), হযরত

যুবাইর ইবনে আওয়াম (রা), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা), হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) ও হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। এঁরা সবাই ছিলেন মক্কার সমাজের অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। পরবর্তীকালে ইসলামে এঁদের অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থেকে এই মুহূর্তে এঁদের ইসলাম গ্রহণের মূল্য নিরূপণ করা মোটেই কঠিন নয়।

এভাবে শুরুতেই এমন আট ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলেন, সমাজে যাঁদের ছিল বিশিষ্ট ভূমিকা। সমাজে তাঁরা প্রভাবশালী ছিলেন। কিন্তু কুরাইশ সরদারদের ন্যায় তাঁদের কারো স্বার্থ সমাজের সাথে জড়িত ছিল না। ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে সামাজিক স্বার্থকে বিব্রত না করার কারণে সমাজের উপরি মহলে কোন আলোড়ন সৃষ্টি হয়নি। এহেন বিজ্ঞতাপূর্ণ ও বুদ্ধিদীপ্ত কর্ম-কৌশল অবলম্বনের কারণে সূচনা-পর্বেই ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের কাফেলা নির্বিঘ্নে শক্ত মাটিতে শিকড় গেড়ে বসতে সক্ষম হয়। প্রথম পর্যায়েই যদি কুরাইশ সরদারদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হত এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশ সমাজে যে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাতে তাঁর পক্ষে এ দাওয়াত পেশ করার পথে কোনো বাধা ছিল না, আর প্রথম পর্যায়ে যদি ইসলামী দাওয়াতকে একেবারে সাধারণ লোকদের পর্যায়ে উপস্থাপিত করা হত, তাহলে শুরুতেই প্রভাবশালী সরদাররা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতো এবং সাধারণ মানুষ তাঁর দাওয়াত সম্পর্কে আন্তরিকভাবে চিন্তাভাবনা করার পূর্বেই চতুরদিকে বিরোধিতার এক ভয়ারহ তুফান সৃষ্টি হত, যার ফলে ইসলামী দাওয়াতের কুঁড়িটি অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যেত।

দাওয়াতের গোপনীয়তা রক্ষা

ইসলামী দাওয়াতের এই ছোট কাফেলাটি ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগল। তাঁরাও একান্ত সংগোপনে নিজেদের বন্ধুমহলে ও নিকট-আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত ছড়াতে লাগলেন। দিনের পর দিন তাঁদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। কিন্তু যেহেতু ইসলামী দাওয়াতের এ প্রক্রিয়াটি চলছিল একান্ত সংগোপনে, তাই কুরাইশদের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য দেখা দিল না। রসূল করীম (স) ও তাঁর সাহাবাগণ নির্বিঘ্নে নিজেদের কাজ করে যেতে লাগলেন। মুসলমানরা সালাত ও অন্যান্য দীনি দায়িত্ব পালন করার জন্য মক্কার আশেপাশের পার্বত্য উপত্যকায় চলে যেতেন এবং সেখানে লোক চক্ষুর আড়ালে থেকে নিজেদের ইবাদত অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করতেন।

কিন্তু হঠাৎ এ সময় একদিনকার একটা ছোট ঘটনা মক্কার সমাজে সাময়িকভাবে একটা বিস্ময় মিশ্রিত উত্তেজনার সৃষ্টি করে। হযরত সাদ ইবনে

আবি ওয়াককাস (রা) নিজের কয়েকজন সংগী সাথীসহ এক পার্বত্য উপত্যকায় সালাত আদায় করছিলেন। ঘটনাক্রমে কুরাইশ মুশরিকদের একটি দল তাঁদেরকে এ অবস্থায় দেখে ফেলে। ফলে ঘটনাস্থলেই দু পক্ষের মধ্যে একটা প্রায় খণ্ড যুদ্ধই বেধে যায়। রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে এ সংবাদ পৌছলে তিনি মুসলমানদেরকে আরো সতর্কতা এবং আরো বেশী সহিষ্ণুতার পথ অবলম্বন করার নির্দেশ দেন। মুসলমানরা যখন যথার্থই কোনো শক্তি অর্জন করেনি এ অবস্থায় তিনি অনর্থক কুরাইশদের প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হতে চাননি। মুসলমানদের সংখ্যা যখন ছিল অতি সামান্য এবং তাদের অধিকাংশের ঈমান হৃদয় অভ্যন্তরে পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে একটি প্রচণ্ড শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারেনি, সে অবস্থায় তিনি প্রকাশ্যে কুরাইশদের মুকাবিলায় নেমে আসা পছন্দ করেননি। বরং এ অবস্থায় তিনি চাচ্ছিলেন মুসলমানদের হৃদয়ে ঈমান এমনভাবে শিকড় গেড়ে বসুক যার ফলে তারা ইসলামের বিরুদ্ধবাদিদের মুকাবিলায় নিজেদের ধন-প্রাণ, সহায়-সম্বল, সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন কোনো কিছুর পরোয়া করবে না। ইসলামের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা তাদের শিরা-উপশিরায় রক্ত সঞ্চালনের কাজ করবে এবং তারা নিজেদের প্রিয়তম বস্তুও এ পথে কুরবানী করতে কোনো প্রকার ইতস্তত করবে না। রসূলুল্লাহ (স) এ ব্যাপারে একেবারে নিসন্দেহ ছিলেন যে, তাঁর অনুসারীদের ঈমান যখন এই পর্যায়ে মজবুত হয়ে যাবে এবং কাফেরদের সকল প্রকার জ্বালা-যন্ত্রণা ও নির্যাতন নিপীড়ন তারা মুখ বুজে সহ্য করতে পারবে, তখন ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো চ্যালেঞ্জ, হুমকীর আক্রমণে তারা একটুও বিচলিত হবে না, পূর্ণোদ্যমে এর মুকাবিলা করে যাবে এবং ইসলামকে চূড়ান্ত বিজয়ের দ্বার প্রান্তে না পৌছিয়ে তারা ক্ষান্ত হবে না। কিন্তু শুরুতেই যদি কুরাইশদের জ্বালা-যন্ত্রণা ও জুলুম-নির্যাতনের ব্যাপক সিলসিলা শুরু হয়ে যায়, তাহলে হয়তো অনেক দুর্বল ঈমানদার মুসলমান এর মুকাবিলা করতে পারবে না। এভাবে প্রারম্ভেই ইসলামী আন্দোলনের কাফেলা বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, যা তার ভবিষ্যৎ বিস্তৃতির পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে।

এসব দিক বিবেচনা করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্থির করলেন, মক্কার কেন্দ্রে অবস্থান করে ইসলামী আন্দোলনকে কোনোক্রমেই গোপন রাখা সম্ভব হবে না। এজন্য এমন একটি স্থান নির্বাচন করতে হবে, যা লোকালয় থেকে দূরে হবার সাথে সাথে সব লোক যেখানে সহজে পৌছতে পারবে না। এ উদ্দেশ্যে তিনি আরকাম ইবনে আরকাম আল-মাখযুমী নামক জনৈক নিবেদিতপ্রাণ সাহাবার বাড়ি নির্বাচন করলেন। এ বাড়িটি ছিল মক্কা

থেকে বেশ কিছু দূরে পূর্ব দিকে সাফা পাহাড়ের পাদদেশে। তিনি এই 'দারে আরকাম'-এ নিজের কেন্দ্র স্থাপন করলেন এবং এখানেই ইসলামী দাওয়াত ও অনুশীলনের কাজ চালাতে থাকলেন। সাহাবাগণ এখানে দীনী শিক্ষাগ্রহণ করতেন ও ইবাদতের পদ্ধতি শিখতেন। সালাত আদায়ের জন্য তাঁদের আর মক্কার পাহাড় ও উপত্যকাগুলোয় যাওয়ার প্রয়োজন হত না। ফলে কাফেরদের সাথে সরাসরি সংঘর্ষের কোনো সম্ভাবনাও রইল না।

এভাবে চারটি বছর ধরে তিনি নিরবে নিশ্চিন্তে এই ঘরে বসে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করতে থাকলেন। এভাবে তিনি ও তাঁর সাহাবাগণ কুরাইশদের ক্ষোভ, রোষ, হিংসা ও বিদ্বেষ এবং তাদের জ্বালা-যন্ত্রণা ও নির্যাতনের আঘাত থেকে দূরে থাকলেন। চার বছরের মধ্যে কুরাইশরা অনুভবই করতে পারল না যে, তাদেরই ঘরের আঙিনায় মক্কার উপত্যকায় এমন একটি আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে যা সামনে অগ্রসর হয়ে একদিন তাদের সমগ্র ব্যবস্থাকে নেস্তনাবুদ করে দেবে, দুনিয়ার বুক থেকে তাদের নাম-নিশানা বিলুপ্ত করে দেবে—এমন একদিন আসবে যখন মক্কার প্রত্যেকটি যুবকের মুখে এই আন্দোলনের নাম উচ্চারিত হবে। মক্কার সমস্ত কাফেররা মিলে সেদিন তাদের সমস্ত শক্তি, সম্পদ, শৌর্য, বীর্য ও শ্রেষ্ঠতম যোগ্যতা ব্যয় করেও এ আন্দোলনের তিলার্ধ পরিমাণ ক্ষতি করতে পারবে না। বরং উলটো এর বর্ধিষ্ণু প্রতিপত্তি ও শক্তির মুখে তারা নিজেদের পরাজয় ও ব্যর্থতার চিহ্ন সুস্পষ্ট হতে দেখে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

কুরাইশরা এ নতুন আন্দোলন সম্পর্কে যে একেবারে অজ্ঞ ছিল, তা নয়। এ সম্পর্কে তাদের কানে অনেক কথা আসতো। কিন্তু ইসলামের কোনো সুস্পষ্ট চেহারা তাদের সামনে ফুটে ওঠেনি। আর অন্যদিকে মুসলমানদের সংখ্যা খুব কম ও অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ে থাকার কারণে এবং এ পর্যন্ত যারা ঈমান এনেছিলেন, তাঁদের ঈমান এতই মজবুত ও রসূলের প্রতি তাঁদের ভালবাসার গভীরতা ও আনুগত্যের প্রকৃতি এতই উন্নত পর্যায়ের ছিল, যার ফলে কাফেরদের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার গোয়েন্দাগিরি করে তাঁদের সম্পর্কে কোনো সঠিক খবর সংগ্রহ করাও সম্ভবপর ছিল না। তাই তারা এ পর্যায়ে ইসলামের বিরোধিতা করার তেমন কোনো প্রয়োজন অনুভব করেনি। এ সুযোগে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের মানসিক ও নৈতিক অনুশীলনের কাজ নির্বিঘ্নে ও দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যান। ইসলামের প্রতি তাদের ঈমান ও ভালবাসাকে আরো মজবুত করেন। ইসলামের নীতি-নির্দেশগুলো মেনে চলার ব্যাপারে তাঁদের মনে প্রত্যয় ও দৃঢ়তার সৃষ্টি

করেন। এভাবে তিনি ছোট্ট হলেও মুসলিম সমাজকে একটি মজবুত ইস্পাত-প্রাচীরের অবয়ব দান করতে সক্ষম হওয়ার ফলে ভবিষ্যতে কোনো প্রকার প্রলোভন, প্রবঞ্চনা, জুলুম, নির্যাতন তথা দুনিয়ার যে কোনো অস্ত্র ব্যবহার করে মুসলমানদেরকে তাদের পথ থেকে সরিয়ে আনা মানুষের সাধ্যাতীত প্রমাণিত হয়েছিল। তাই দেখা গেছে, পরবর্তী পর্যায়ে মুসলমানদের ওপর যেসব অমানুষিক জুলুম-অত্যাচার হয়েছে তার সমস্ত আঘাত মজলুম মুসলমানরা বুক পেতে নিয়েছে কিন্তু একজনও তার বুকের ধন ঈমানের গায়ে একটুও আঁচড় লাগতে দেননি। ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের সূচনা পর্বে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিজ্ঞানসম্মত ও বুদ্ধিদীপ্ত কর্মপদ্ধতি ও কর্মকৌশল অবলম্বনের কারণেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

রসূলের (স) আদর্শ বাস্তবায়ন ঃ আধুনিক প্রেক্ষাপট

বিজ্ঞানের উন্নতির সূচনা হয়েছিল ইসলামী সভ্যতার আমলেই। আজও যদি বিশ্ব ইসলামী সভ্যতার আওতাধীন থাকতো তাহলে বিজ্ঞানের উন্নতি মানুষের সভ্যতার জন্য ধ্বংস ডেকে আনতো না। ভোগ-লালসা কেন্দ্রিক সংকীর্ণ স্বার্থভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পৃথিবীতে মানুষের আগমনের উদ্দেশ্য সফল করতে সক্ষম হয়নি। মানুষ এ দুনিয়ায় ব্যর্থ এবং আখেরাতেও ব্যর্থ হয়েছে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের পর দু হাজার বছর পার হতে চললো। আর শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের পর চান্দ্র মাসের গণনা অনুযায়ী দেড় হাজার বছর পূর্ণ হতে আর বেশী দেরী নেই। মানুষের সভ্যতার ও সামাজিক জীবন গঠনের ইতিহাসে এ দেড় হাজার ও দু হাজার বছরকে আধুনিক প্রেক্ষাপটে বিচার করা চলে। বর্ণমালার উদ্ভব, আইনশাস্ত্র প্রণয়ন, ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের সূচনা, বিশ্বব্যাপী সামরিক অভিযান এবং ব্যাপক যোগাযোগ ব্যবস্থা শুরু থেকেই এ আমলকে বিশিষ্টতা দান করেছে—বিশেষ করে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের তিরোধানের পর ছ শো বছর পার হতে না হতেই বিশ্ব সভ্যতার এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছে যায়, যার ফলে একজন বিশ্বনবীর প্রয়োজন দেখা দেয়।

সভ্যতা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিরই একটি বিকশিত রূপ। সভ্যতা মানুষের আছে, পশুর নেই। অন্যান্য জীবরা তো এই আঙিনারই বাইরে। জানি না কত হাজার বছর মানুষের এই সভ্যতার ইতিহাস। কিন্তু যেদিন থেকে পৃথিবীর বুকে মানুষের ঠাঁই হয়েছে সেদিন থেকে সভ্যতারও যাত্রা শুরু। প্রথমে দুজন মানুষ––একজন পুরুষ ও একজন নারী পৃথিবীর বুকে বসতি স্থাপন করেন। তাদের সাথে ছিল তাদের দুজনের মস্তিষ্কের উর্বর ক্ষেত, দুজনের বুদ্ধিবৃত্তি, মননশীলতা ও গভীর অনুভূতিশীল হৃদয়। এখানে প্রথম সভ্যতার ভিত্ গড়ে তোলেন তাঁরা। তবে সভ্যতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে পশুদের অপারগতা যেমন সুস্পষ্ট এবং সকল প্রকার বিতর্কের উর্ধে ঠিক তেমনি মানুষ সভ্যতার জন্মদাতা ও একটি মননশীল হৃদয়বৃত্তির অধিকারী হলেও ভালো ও মন্দ এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের সঠিক বিচার পর্যালোচনা করার ক্ষমতা তার নেই। এ ক্ষেত্রে স্রষ্টা তার মধ্যে একটি অপূর্ণতা রেখে দিয়েছেন। এ অপূর্ণতার ক্ষতি থেকে মানুষকে উদ্ধারের দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়েছেন। পৃথিবীর এ দুর্গম পথে মানুষকে পাঠাবার প্রথম দিনেই তিনি বলে দিয়েছেন ঃ "আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে পথনির্দেশ যাবে। যারা তা মেনে নেবে এবং সেই মতো চলবে তাদের

কোনো ভয় নেই। তাদের দুঃখ-কষ্টও পোহাতে হবে না। তবে যারা আমার এ পথনির্দেশ অস্বীকার করবে এবং মিথ্যা বলে তা প্রত্যাখ্যান করবে তারা চিরকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ৩৮ ও ৩৯) এভাবে মানুষের মস্তিষ্কের শক্তি ও সৃষ্টিশীলতাকে মহান আল্লাহ তাঁর অপার অনুগ্রহে কল্যাণকামিতার পথে এগিয়ে দিয়েছেন। সভ্যতা সৃষ্টির পথে মানুষ যেসব ভুলক্রটি করে যায় সেগুলো শুধরাবার জন্য আল্লাহ প্রতি যুগে তাঁর হেদায়ত, পথনির্দেশ ও বিধান দিয়ে চলেছেন তাঁর শ্রেষ্ঠ বান্দা নবীদের মাধ্যমে। কিন্তু ঈসায়ী ষষ্ঠ শতকের পর প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে নিয়ে মানুষের হাজার হাজার বছরের জীবনচর্চা একটি ঐতিহাসিক পূর্ণতার পথে পা বাড়িয়েছে। ইতিপূর্বে সারা বিশ্বে ছিল সভ্যতার আঞ্চলিক ও গোত্রীয় বিকাশ। এক দেশের সাথে আর এক দেশের এবং এক জাতির সাথে আর এক জাতির সম্পর্কের মধ্যে গভীরতা ও ব্যাপকতা খুব বেশী সৃষ্টি হয়নি। চীনে, বেবিলনে, মিসরে, ভারতবর্ষে এক এক এলাকায় এক একটি সভ্যতা গড়ে উঠেছে। আঞ্চলিকতাই তখন ছিল মানব সভ্যতার বৈশিষ্ট। তাই মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ নবী পাঠিয়েছেন এক একটি এলাকা ও জাতি ভিত্তিক।

কিন্তু হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের তিরোধানের পর কয়েক শ' বছরের মধ্যে সভ্যতার অংগনে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। দুটি প্রবল পরাক্রান্ত রাজশক্তি আফ্রো-ইউরোশীয় জনঅধ্যুসিত এলাকার বৃহত্তম অংশে প্রভাব বিস্তার করে। তদানীন্তন সভ্য জগতের অধিকাংশ এলাকায় এ রাজশক্তির মুদ্রার প্রচলন হয়। এদের বিজয় অভিযান চলতে থাকে নতুন নতুন এলাকায়। একদিকে স্থলপথে যেমন আফ্রিকার উত্তর ও পূর্বাঞ্চল এবং ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের সাথে এশিয়ার পূর্ব ও দক্ষিণ ভূখণ্ডের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে তেমনি অন্যদিকে জলপথে ভূমধ্যসাগর, ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলীয় এলাকাসমূহ তথা ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত থেকে সূদুর চীন পর্যন্ত বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্প্রসারিত হয়।

এভাবে ঈসায়ী ষষ্ঠ শতকে দুনিয়া এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যখন সারা দুনিয়ার মানুষের জীবন পরিচালনা এবং তাদেরকে ভালো-মন্দ ও কল্যাণ অকল্যাণের পথনির্দেশ দেবার জন্য একজন মাত্র নেতার ও আল্লাহ প্রেরিত একজন মাত্র নবীর প্রয়োজন দেখা দেয়। মানুষ সৃষ্টির প্রথমে যেমন ছিলেন একজন মানব ও একজন মানবী। তাদের দুজনের মধ্যে ছিল পূর্ণ একাত্মতা। আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর বিধান অনুধাবন করার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো বিভেদ ও পার্থক্যবোধ ছিল না। ঠিক তেমনি মানব জাতির বিকাশের চরম

পর্যায়েও আল্লাহ মানুষের মধ্যে এ পার্থক্যবোধ খতম করতে চাইলেন। কুরআনে একথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে যে, প্রত্যেক নবী তাঁর এলাকার মানব গোষ্ঠীর কাছে একই দাওয়াত নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের সবার বক্তব্য ছিল 'আল্লাহর বন্দেগী করো এবং আল্লাহ বিরোধী শক্তির সান্নিধ্য পরিহার করো।' নবীদের দাওয়াত যদি বিভিন্ন হতো এবং বিভিন্ন নবী ভালো মন্দ এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের বিভিন্ন মানদণ্ড পেশ করতেন তাহলে মানব জাতির মধ্যে বিভিন্ন প্রকার বিভক্তি সম্ভব হতো। কিন্তু নবীদের দাওয়াতের অভিন্নতাই প্রমাণ করে মানুষের মধ্যে সমস্ত বিভেদ ও বিভিন্নতাই কৃত্রিম। বিশেষ জাগতিক কারণে এতদিন এ কৃত্রিমতার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ নবীর আগমনের সাথে সাথেই এ সমস্ত কৃত্রিমতার অবসান ঘটেছে। তিনি সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের নবী, পথপ্রদর্শক নেতা ও পরিচালক।

তাই ঈসায়ী সপ্তম শতকের শুরুতে আল্লাহর শেষ নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছ থেকে মানুষের জন্য এমন এক বাণী আনলেন যা সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য সমানভাবে গ্রহণীয়। তাঁর বাণীর এ সর্বজনীনতার কারণেই এ বাণী দুনিয়ার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছতে পঞ্চাশ বছরের বেশী সময় লাগেনি। এর আগে আর কোনো ধর্মই দুনিয়ার সমগ্র এলাকায় বিস্তার লাভ করতে পারেনি। একমাত্র বৌদ্ধ ধর্মই এশিয়া মহাদেশের বেশ কিছু দেশে বিস্তার লাভ করেছিল। কিন্তু এশিয়ার উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমাংশে এবং ইউরোপে ও আফ্রিকায় তার কোনো পরিচিতি ছিল না। আর খৃষ্টধর্মের বিশ্বব্যাপী বিস্তার তো আধুনিক পশ্চিমা ডিপ্লোম্যাসি এবং ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের কীর্তি। স্বাভাবিক মানবিক চাহিদা পূরণের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

বৌদ্ধ ধর্ম, খৃষ্ট ধর্ম ও ইসলামের গত দেড় হাজার দু হাজার বছরের ইতিহাস যদি আমরা বিশ্লেষণ করি এবং এ সময় মানুষের জীবনে এর প্রভাব ও কার্যকারিতা পর্যালোচনা করি তাহলে ইসলামের সর্বজনীন আবেদন উপলব্ধি করা আমাদের জন্য মোটেই কঠিন হবে না।

বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি হয় উত্তর ভারতের একটি অংশে। পরকালীন জীবনে মুক্তি ও মোক্ষ লাভ করাই ছিল তার লক্ষ। ইহকালীন জীবন, সংসার সমাজ, রাষ্ট্র কিভাবে পরিচালিত হবে, একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের সাথে কি আচরণ করবে, তাদের পারস্পরিক লেনদেন কিভাবে চলবে, সমাজে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক কি হবে, এ ধরনের দুনিয়ার জীবনের হাজারো প্রশ্নের সেখানে

কোনো জবাব ছিল না। ইহকালীন জীবনের হাজারো প্রসংগ এড়িয়ে শুধুমাত্র জীবে দয়া, কৃচ্ছ্রসাধনা, ভোগে অনাসক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে কতিপয় নৈতিক বৃত্তির উন্নয়নই ছিল এর ইহকালীন জীবনের কর্মসূচী। সমকালীন ভারতবর্ষের আর্য ধর্মগুলোর অত্যধিক গোঁড়ামী ও বর্ণবৈষম্যের লাঞ্ছনার কারণে বর্ণবাদ বিরোধী গৌতম বুদ্ধের ধর্মনীতি সারা ভারতের বৃহত্তম অনার্য সমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। বুদ্ধের মৃত্যুর কয়েকশো বছরের মধ্যে এ ধর্ম মধ্য ও পূর্ব এশিয়ায়ও ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সর্বত্র মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন পরিগঠন ছাড়া রাষ্ট্রিয় ও সমাজ জীবনে এর কোনো প্রভাব ছিল না।

অন্যদিকে খৃষ্টধর্মকেও আমরা প্রায় ঐ একই পর্যায়ে কার্যকর দেখি। রাষ্ট্রের যাবতীয় বিষয়কে রাষ্ট্র পরিচালকের হাতে, সমাজের সমস্ত বিষয়কে সমাজ নায়কের হাতে এবং সংসারের সববিষয় সংসার ও পরিবার প্রধানের হাতে ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র ব্যক্তি মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নয়নের লক্ষে ধর্মকে গীর্জার মধ্যে সীমাবদ্ধ করেই এ ধর্মের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে। ধর্মের এ সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগির কারণে খৃষ্ট্রীয় দেশগুলোতে মানুষের হাতে মানুষ লাঞ্ছিত হয়েছে। নারী তার পরিবারে সমাজে কোনো মর্যাদা পায়নি। বরং সর্বত্র তাকে ভোগ্য পণ্য মনে করা হয়েছে। জ্ঞান চর্চা ব্যাহত হয়েছে। ধর্মগ্রন্থকে বিকৃত করে গীর্জার পরিচালক ও ধর্মের প্রশাসকরা অবাধ জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার বিরুদ্ধে এক বিরাট বাধার পাহাড় সৃষ্টি করেছে। অনেক বিজ্ঞানীকে তারা শূল বিদ্ধ করেছে ও আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে। এসব ঘটনা থেকে বাস্তবের সাথে এ দু ধর্মের আকাশচুম্বী তফাতটা চোখে পড়ে। এ ধর্ম যে সর্বজনীন নয়, এগুলো তারই প্রমাণ। এ সর্বজনীনতা দুনিয়ার এলাকা ও মানব বসতির ব্যাপকতার দিক দিয়ে যেমন তেমনি একজন মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রের ব্যাপারেও সমানভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ এই ধর্ম যেমন সারা দুনিয়ার সব এলাকার জন্য প্রযোজ্য নয় তেমনি একজন মানুষের জীবনের সকল বিভাগের জন্যও এর কার্যকর ক্ষমতা নেই।

এরপর আমরা ইসলামের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারি। এর প্রথম বৈশিষ্ট হচ্ছে, মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির সাথে এর রয়েছে গভীর মিল ও সামঞ্জস্য। এজন্য একে বলা হয়, 'দীনে ফিতরাত' বা স্বভাব ধর্ম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "প্রত্যেক শিশু জন্ম নিয়েছে স্বভাব ধর্মের (কোনো কোনো হাদীস অনুযায়ী ইসলামী স্বভাব ধর্ম) ওপর। তারপর তার বাপ মায়েরা তাকে ইহুদী, অগ্নি উপাসক ও খৃষ্টানে পরিণত করে।" অর্থাৎ মানুষ তার জীবনের প্রথম থেকে যে স্বভাবের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তার

প্রকৃতিগত ও স্বাভাবিক প্রবণতার সাথে তার কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু অন্যান্য সমস্ত বিধান তার ওপর বাইর থেকে আরোপিত এবং প্রতি পদে পদে মানুষের প্রকৃতির সাথে তার বিরোধ চলতে থাকে। ফলে যে আধ্যাত্মিক উন্নতির বিধান সেখানে রয়েছে তা আসলে তার আধ্যাত্মিক অবনতি ঘটায়। অন্যদিকে স্বভাব ধর্ম হবার কারণে ইসলামী বিধান মেনে চলার পর মানুষের ইহকালীন জীবনে যেমন ভারসাম্য সৃষ্টি হয় তেমনি তার পরকালীন জীবনের সাফল্যও হয় সুনিশ্চিত।

ইসলামের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট হচ্ছে, মানুষের জীবনকে সে বিভিন্ন এককে ও বিভাগে বিভক্ত করে না। এখানে দীন ও দুনিয়ার কোনো বিষয় সম্পর্কে বলা যাবে না যে, এটা দীনি বিষয় এবং ওটা দুনিয়াবী বিষয়। বরং দুনিয়ার জীবনের প্রত্যেকটি বিষয় দীনের সাথে সম্পর্কিত। কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে ঃ ওয়া মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়া'বুদুন–'মানুষ ও জিনকে আমার ইবাদত করা ছাড়া অন্য কোনো কাজের জন্য এবং অন্য কোনো দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠাইনি।' অন্য কথায় বলা যায়, শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত অর্থাৎ একমাত্র তাঁর হুকুমের আনুগত্য করাই এ দুনিয়ায় মানুষের কাজ। দুনিয়ার কোনো কাজ আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছামতো করার অধিকার মানুষের নেই। অন্যদিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আদদুনিয়া মাযরিআতুল আখিরা'—এ দুনিয়ার জীবনই হচ্ছে আখেরাত বা পরকালীন জীবনের ক্ষেত্র। অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনের প্রত্যেকটি কাজে যদি আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করা হয়, তাহলে পরকালীন জীবনে সাফল্য সুনিশ্চিত হয়। আর দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর বিধানের প্রতি বিদ্রোহাত্মক আচরণ করে আখেরাতের জীবনে ব্যর্থতা সুনিশ্চিত করা হয়।

ইসলামের তৃতীয় বৈশিষ্ট হচ্ছে, ইসলাম মানুষকে মানুষ হিসাবেই গণ্য করে। তাকে কোনো অতিমানবিক বা মানবেতর জীব মনে করে না। ফলে এমন কোনো বিধান বা দায়িত্ব সে মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়নি যা মেনে চলা মানুষের সাধ্যের অতীত। অন্যান্য ধর্মীয় বিধানে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যে কঠোর সাধনা ও অমানবিক কৃচ্ছ্রতার ব্যবস্থা রয়েছে ইসলামে তার ছিটেফোঁটাও নেই। ইসলামে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত বা যিকির আযকারের যে বিধান রয়েছে তার মধ্যে কোনো কৃচ্ছ্রতা নেই। অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে মানুষ এগুলো মেনে চলতে পারে। এমনকি কোনো ব্যক্তি সফরে থাকলে তার নামায চার রাকাতের জায়গায় দু রাকাত ফরয করা হয়েছে। রোগের কারণে বা সফরে থাকাকালে রোযাও সাময়িকভাবে মুলতবী করা হয়েছে। সুস্থ ও স্বাভাবিক

অবস্থায় নিজের বাড়িতে অবস্থান করার সময় সেই রোযা সে পূরণ করে দিতে পারে। এভাবে ইসলামের বিধান মানুষকে কোনো বাড়তি কষ্টের মুখে ঠেলে দেয়নি।

ইসলামের চতুর্থ বৈশিষ্ট হচ্ছে, ইসলাম একটি পূর্ণাংগ বিধান। মানুষের প্রত্যেকটি কাজ এবং তার জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগের জন্য ইসলাম বিধান দিয়েছে। তার কোনো একটি কাজ এবং তার জীবনের কোনো একটি বিভাগও এ বিধানের আওতার বাইরে নেই। একটি কাজ আল্লাহর হুকুম মোতাবেক করা এবং অন্য একটি কাজ তাগুতের হুকুম অনুযায়ী করার ফলে মানুষের জীবনে যে সংঘাত সৃষ্টি হয় তার অভিশাপ থেকে মানুষকে সে রেহাই দিয়েছে। শুধু আজকের জগতে নয়, অতীতের বিভিন্ন জাতির মধ্যেও দেখা গেছে, মানুষ একদিকে তাগুতের (খোদাদ্রোহী শক্তি) আনুগত্য করে অর্থাৎ নিজের জীবনের সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করে জীবনকে অভিশপ্ত করে তুলেছে। ঠিক তেমনি অন্যদিকে একদল লোক কিছু কাজে আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য এবং অন্য কিছু কাজে তাগুতের হুকুমের আনুগত্য করে সমানভাগে নিজেদের জীবনকে অভিশপ্ত করে তুলেছে। এখানে শিরক্ ও কুফরী সমানভাবে মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ঈসায়ী ষষ্ঠ শতকের শেষের দিকে আল্লাহর শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের সবচাইতে অনুন্নত আরব উপদ্বীপের মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। পার্বত্য ও মরু অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত এ শহরটির অধিবাসীদের আর্থিক দৈন্য ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাছাড়া বছরে দুবার বাণিজ্য কাফেলার সাহায্যে সিরিয়া, ইরাক, ইয়ামেন ও ইথিওপিয়ার সাথে যোগাযোগ ছাড়া সভ্য জগত থেকে এ এলাকাটি প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে অবস্থান করছিল। কোনো সুসংহত রাষ্ট্রীয় শাসন এখানে কোনোদিন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিস সালামের পর কয়েক হাজার বছরের মধ্যে কোনো নবীরও এখানে আবির্ভাব হয়নি। ফলে সমগ্র এলাকাটি বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক সবদিক দিয়ে ছিল অত্যন্ত পশ্চাতপদ।

ঈসায়ী সপ্তম শতকের প্রথমার্ধেই মাত্র তেইশ বছরের প্রচেষ্টায় এ ধরনের একটি অনুন্নত এলাকায় এ ধরনের একটি অনগ্রসর জাতির মধ্যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্যের এমন একটি প্রেরণা সৃষ্টি করলেন এবং তাদেরকে এমন ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত করলেন যার ফলে পরবর্তী মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সমকালীন বিশ্বের দুটি বৃহৎ রাজশক্তি তাদের হাতে সম্পূর্ণ রূপে পর্যুদস্ত হলো। তারা একটি নতুন

সভ্যতার জন্ম দিল। ঈসায়ী সপ্তম শতক থেকে নিয়ে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এই সভ্যতা সমগ্র বিশ্বকে তার প্রভাবাধীনে রেখেছিল।

ইসলামের অভ্যুদয়

এক. ইসলাম মানুষের বৈষিয়ক উন্নতি বিধান করেছে। দুনিয়ার দরিদ্রতম জাতিটি মাত্র দশ বছরের মধ্যে উদ্বৃত্ত সম্পদের অধিকারী হয়েছে। শুধু দেশ জয় ও মালে গানীমাতের বিপুল সমাবেশের কারণে এটা হয়নি। বরং ইসলাম এমন একটি সুষ্ঠু ও ইনসাফপূর্ণ অর্থব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল যার ফলে এটা সম্ভবপর হয়েছে। ইসলামের সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থার কারণে অর্থ এক হাতে পুঞ্জীভূত না হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

দুই. ইসলাম একটি সুশৃংখল প্রশাসনিক ব্যবস্থা কায়েম করে মানুষের জীবনে স্বস্তি, শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করেছে। যে দেশে ইতিপূর্বে আইন শৃংখলা বলে কোনো জিনিসের অস্তিত্ব ছিল না, যে দেশের লোক দিনের বেলা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতো, কিন্তু রাতের শেষে দেখা যেতো সে অন্যের ক্রীতদাস হয়ে শিকল টানতে টানতে তার পেছনে পেছনে চলেছে। যে দেশের যে কোনো জনপদ নিশীথ রাতে অজানা শত্রুর অতর্কিত আক্রমণে মুহূর্তে বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। মানুষের জীবনের, তার প্রাণের ও রক্তের কোনো মূল্য যে দেশে ছিল না, সে দেশে এখন একটি যুবতী সুন্দরী মেয়ে পূর্ণ অলংকারে সজ্জিত হয়ে একাকী সানআ থেকে মদীনা পর্যন্ত কয়েকশো মাইল সফর করে; কিন্তু কেউ তার ওপর আক্রমণ করা তো দূরের কথা লোলুপ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়ও না। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে আইন শৃংখলার এ বৈপ্লবিক পটপরিবর্তন একথা প্রমাণ করে যে, বিপ্লবটা বাহির জগতে যে পরিমাণ প্রসার লাভ করেছিল তার চেয়ে বেশী প্রসারিত হয়েছিল মনোজগতে।

তিন. ইসলাম ব্যাপক জ্ঞান চর্চার একটি পথ উন্মুক্ত করেছিল। ইসলামী বিপ্লবের আগে সারা দেশে মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন লোক লেখাপড়া জানতো। মৌখিক কবিতা আবৃত্তি বা বাগ্মিতাই ছিল জ্ঞানচর্চার প্রধান অবলম্বন। কিন্তু ইসলামের আগমনের মাত্র এক দুশো বছরের মধ্যে মুসলমানরাই হয়ে উঠলো সারা দুনিয়ার শিক্ষক এবং ইসলামী শহরগুলো হলো জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রস্থল।

কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে জ্ঞান ও শিক্ষার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা গড়ে উঠলো। এছাড়া মুসলমানরা গ্রীকদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উত্তরাধিকার লাভ করলো। ফলে গ্রীকদের থেকে যে বিজ্ঞান, দর্শন, অংক ও সাহিত্য চর্চা হারিয়ে যাচ্ছিল মুসলমানরা সেগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করলো।

মুসলমানদের এ পুনরুজ্জীবিত জ্ঞানের চর্চাই আজ চলছে ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইউরোপের খৃষ্ট সমাজকে এ জ্ঞান চর্চার জন্য অনেক ধর্মীয় নির্যাতন সইতে হয়েছে। কিন্তু মুসলমানরা যখন এ জ্ঞান চর্চা করে তখন তাদের কোথাও ধর্মীয় নির্যাতন সইতে হয়নি। ইসলামী অনুশাসন এ জ্ঞান চর্চার পথে বাধা নয়। বরং ইসলাম ঘোষণা করে, "আল হিকমাতু দাল্লাতুল মুমিন"—জ্ঞান মুমিনের হারানো সম্পদ।

চার. ইসলাম মানুষের আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করেছে। ইবাদত বন্দেগীকে মানুষের জন্য বোঝা হিসাবে তার ওপর চাপিয়ে দেয়নি। মানুষের সাথে তার স্রষ্টার সম্পর্ককে সহজ ও স্বাভাবিক করেছে। প্রথমত প্রত্যেকটি কাজের মাধ্যমে এ সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়েছে এবং তারপর বিশেষ আনুষ্ঠানিক ইবাদতের সাহায্যে একে আরো গভীর করা হয়েছে। এজন্য কোনো রাহবানিয়াত ব্রহ্মচর্য বা বৈরাগ্য অবলম্বন করার প্রয়োজন দেখা দেয়নি।

প্রায় একটানা এগারো বারোশো বছর ধরে সারা বিশ্বে ব্যাপক প্রভাব বিস্তারের পর ইসলামী সভ্যতার পতন ঘনিয়ে আসে। মুসলমানদের মধ্যে নির্জীবতা ও নির্বীর্যতা বাসা বাঁধে। অন্যদিকে সতের আঠার শতকে শিল্প বিপ্লবের পর ইউরোপে এমন এক সভ্যতার জন্ম হয় যার পেছনে প্রেরণা যুগিয়েছে ধর্ম বৈরিতা ও খোদাদ্রোহিতা। ফলে সেখানে একের পর এক এমন সব জীবন দর্শনের জন্ম হয়েছে যা মানুষকে আল্লাহর বিধান থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। বিজ্ঞান চর্চার নামে এমন সব দার্শনিক তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটেছে সত্য ও বাস্তবের সাথে যার দূরতম কোনো সম্পর্কও নেই। মানুষের উৎস সন্ধানে গিয়ে তাকে বানরের সাথে এক করে দেয়া হয়েছে। এভাবে পশু ও মানুষের সমাজের মূলে শ্রেণী দ্বন্দ্ব এবং তার ফলে Survival of the fittest - এর থিয়োরী আবিষ্কার করা হয়েছে। মানুষের সভ্যতা ও ইতিহাসের এ বস্তুবাদী ব্যাখ্যা ইউরোপে এক বস্তুবাদী সভ্যতার জন্ম দিয়েছে। বিশ শতকে সারা বিশ্বে এ সভ্যতার প্রভাব অপ্রতিহত। দু একটি দেশ বাদে শিক্ষা, অর্থনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি সবকিছুই এরই বিশ্লেষণ ও বিধান অনুযায়ী চলে।

আজ আমরা যদি ইসলামী সভ্যতা ও ইউরোপের আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতার বিশ্লেষণ করি তাহলে কি পাই ?

ইসলামী সভ্যতার আওতায় এ দুনিয়া কাটিয়েছে এক হাজার বছরের বেশী সময়। এ সময় মানুষের সংসার জীবনের ভিত মজবুত ছিল। মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত ছিল। অর্থ ও সম্পদ এবং উপার্জনের

উপকরণ গুটিকয় লোকের হাতে পুঞ্জীভূত ছিল না। খিলাফতের তিরিশ বছর ছাড়া প্রায় সমস্ত সময়টাই মানুষ রাজতান্ত্রিক শাসনের আওতায় বাস করলেও খিলাফতী শাসনের মানবিক ও ইনসাফ ব্যবস্থা সেখানে আদর্শ হিসাবে বিবেচিত ছিল। উপরন্তু বিচার ব্যবস্থা ছিল শাসন ব্যবস্থা থেকে আলাদা। ফলে ব্যক্তিতান্ত্রিক শাসনের স্বাভাবিক জুলুম-নির্যাতনগুলোর পরও সেখানে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা মানুষের জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিল। জ্ঞান চর্চা ও বিজ্ঞানের উন্নতির পথে কোনো বাধা ছিল না। জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা ইলাহী বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবার কারণে তা মানুষ ও মানুষের সভ্যতার জন্য ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠেনি। ইসলামী সভ্যতার অগ্রগতির যুগে মুসলমানরা যদি জ্ঞান চর্চার ভিত গড়ে তাকে সামনের দিকে এগিয়ে না নিয়ে আসতো তাহলে আজকের বিশ্বের বিজ্ঞান চর্চার এই অভূতপূর্ব সাফল্য সম্ভবপর হতো না। ইসলামী সভ্যতার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে, মানুষের সাথে স্রষ্টার নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টি এবং স্রষ্টার প্রতি মানুষের আনুগত্যশীলতার কারণে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করা, যা মানুষের জীবনকে সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরে দিয়েছিল।

অন্যদিকে ইউরোপের বস্তুবাদী সভ্যতার আওতাধীনে দুনিয়ায় মানুষের বিগত দু তিনশো বছরের জীবন চর্চা আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি। এ সভ্যতা যে দেশে যতবেশী বিস্তার লাভ করেছে সেখানে সংসার জীবনের ভিত্ তত বেশী দুর্বল হয়ে পড়েছে। ব্যক্তিগত যৌন স্বার্থ ও ভোগ ছাড়া নারী পুরুষের মিলনের আর কোনো উদ্দেশ্যই সেখানে নেই। ভবিষ্যত বংশধরদের প্রতি দায়দায়িত্বহীনতা ও অবহেলা সর্বত্র অত্যন্ত প্রবল। অর্থনৈতিক শোষণ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য ব্যক্তি পুঁজিবাদের পর শ্রমিকের মালিকানার নামে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের দিকে প্রত্যাবর্তনও চলেছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের প্রতি শোষণ নিপীড়নের কোনো সীমা নেই। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চরম নিষ্পেষণমূলক রাজতন্ত্রের পরে মাথা গণনার গণতন্ত্র এবং আবার কোথাও শ্রমিকদের শাসনের নামে পার্টি একনায়কতন্ত্র। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই সভ্যতা সারা দুনিয়াটাকে তার ইউরোপীয় পতাকাধারীদের উপনিবেশে বিভক্ত করে দিয়েছিল। এখনো এর জের কাটেনি। দুনিয়া এখন তাদের রাজনৈতিক গোলামী মুক্ত হলেও অর্থনৈতিক গোলামীর হাত থেকে মুক্ত হতে পারেনি। আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে, চলতি শতকের মধ্যে বিশ্ব মানবতাকে দু দুটো বিশ্ব মহাযুদ্ধ উপহার দিয়েছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি এ সভ্যতার একটি কৃতিত্ব সন্দেহ নেই। বিশেষ করে মহাকাশ বিজ্ঞানে উন্নতি অকল্পনীয়। কিন্তু এই বিজ্ঞান চর্চা ইলাহী বিধান দ্বারা

নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় সারা দুনিয়ার সাড়ে পাঁচশো কোটি মানুষ আজ মাত্র দুটি পরাশক্তির কাছে মাথা বন্ধক দিয়ে বসে আছে। তাদের ব্যক্তিগত আক্রোশ ও স্বার্থ উদ্ধার প্রচেষ্টা যে কোনো সময় সারা দুনিয়ায় কিয়ামত ঘটিয়ে দিতে পারে। বিজ্ঞানের এ অভাবিতপূর্ব উন্নতি একটি লাগাতার প্রচেষ্টার স্বাভাবিক পরিণতি। এ প্রচেষ্টার সূচনা হয়েছে ইসলামী সভ্যতার আমলেই। বিশ্ব যদি আজ ইসলামী সভ্যতার আওতাধীন থাকতো তাহলেও বিজ্ঞানের এ উন্নতিতে কোনো বাধা থাকতো না। উপরন্তু ইলাহী বিধানের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকার কারণে বিজ্ঞানের এ উন্নতি মানুষের সভ্যতার জন্য ধ্বংস ডেকে আনতো খুব কমই। বরং ইসলামী অনুশাসনের পূর্ণ আওতাধীন থাকলে ধ্বংসের সকল সম্ভাবনাই তিরোহিত হতো। আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে বড় অভিশাপ হচ্ছে, এ সভ্যতা মানুষকে তার স্রষ্টা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। মানুষকে আল্লাহর বান্দা বানাবার পরিবর্তে সে তাকে নফসের বান্দা বানিয়েছে। ফলে ব্যক্তিগত জীবনে অশান্তি, অপূর্ণতা ও অতৃপ্তি আজ পৃথিবীর বুকে মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। ভোগ-লালসা কেন্দ্রিক সংকীর্ণ স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনা পৃথিবীতে মানুষের আগমনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে সক্ষম হয়নি। মানুষ এ দুনিয়ায় ব্যর্থ এবং আখেরাতেও ব্যর্থ হয়েছে।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ আজো পৃথিবীর বুকে সমুজ্জল। তিনি যে বাণী এনেছিলেন তা কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে। মানুষের সাফল্যের পয়গাম একমাত্র সেই বাণী ও তাঁর আদর্শের মধ্যে নিহিত। তিনি মানুষকে যে একমাত্র আল্লাহর গোলামী ও বন্দেগী করার দিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন যখনই মানুষ এই আহ্বানে সাড়া দেবে তখনই সে জীবনের সব জটিলতা ও আবিলতা মুক্ত হয়ে যাবে। এ বাণীর ও এ আদর্শের প্রয়োজন বিশ্ব মানবতার আজকের চাইতে আর কোনোদিন এত বেশী অনুভূত হয়নি।

ইসলামের সমাজ চিন্তা বিভ্রান্তিমুক্ত

মুসলমানরা নয়, ইসলাম আজ আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ঘরে ও বাইরে আজ প্রায় একটি সমধর্মী পরিস্থিতির উপস্থিতি অনুভূত হচ্ছে। ইসলামের মূল্যায়ন, পুনরমূল্যায়ন, সমালোচনা, আলোচনা ও ব্যাখ্যা আজকে যতটা হচ্ছে এর আগে বিগত দু তিন শ বছরে ততটা হয়নি। বিশেষ করে মুসলমানরা নিজেরাই এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী উৎকণ্ঠা অনুভব করছে। এ ক্ষেত্রে মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে তফাতটা হচ্ছে ঃ অমুসলমান নিজের শ্রেষ্ঠত্ব হারাবার ভয়ে আতংকিত এবং মুসলমান গত কয়েক শ বছরের স্থবির আদর্শ নিয়ে আধুনিক পরিবেশে দ্বিধাগ্রস্ত।

মুসলমানদের বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী ও আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীর বৃহত্তর অংশের দ্বিধা এখন সুস্পষ্ট। দুনিয়ার সব মুসলিম দেশের মতো আমাদের দেশেও আধুনিক শিক্ষা মুসলিম মানসে ইসলাম সম্পর্কে অনেক সংশয়ের বীজ বপন করেছে। যদিও কুরআন, হাদীস, ফিকহ, সীরাত ইত্যাদি ইসলামী জ্ঞানের মৌল উৎসগুলো এখনো অবিকৃত অবস্থায় মুসলমানদের সামনে রয়েছে তবুও শিক্ষিত শ্রেণীর বিভ্রান্তির শেষ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, শ্রেষ্ঠ লেখক-সাহিত্যিক সমাজ, আইনজীবী, সাংবাদিক এবং এ পর্যায়ের বুদ্ধিজীবীগণ আধুনিক জীবন ধারার সাথে অনেক ক্ষেত্রে ইসলামী ধ্যান-ধারণাকে মিলাতে পারছেন না। তাঁদের কেউ কেউ ইসলামকে পুরোপুরি অস্বীকার করে বসেছেন। তাদের যুক্তি, হাঁ, এক সময় ছিল ইসলাম তার জায়গায় সঠিক, এখন আর তার সেই কার্যকারিতা নেই। একটা বিরাট অংশ তো ইসলামকে ব্যক্তিগত জীবনেই সীমাবদ্ধ রাখতে চান। ইবাদত বন্দেগী এবং আল্লাহর সাথে আত্মিক সম্পর্ক ব্যস এতটুকুই ইসলাম। আবার একটা অংশ তো ইসলামকে ব্যক্তিগত জীবন থেকে সামাজিক জীবনেও নিয়ে আসতে চান কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁরা ইসলামের মধ্যে কিছু কাটছাঁট করার প্রস্তাব দেন। যেমন ধরুন, নামায একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। যার মন চাইবে, নামায পড়বে। কিন্তু তা বলে সবাইকে নামায পড়ার জন্য চাপ দেয়া হবে কেন ? মেয়েরা পুরুষদের মতো স্বাধীনভাবে খোলামেলা ঘুরে বেড়াবে, পুরুষের সাথে অবাধে মেলামেশা করবে, তাদেরকে পর্দানশীনা করা হবে কেন ? পশ্চিমা ও হিন্দু সংস্কৃতিতে নাচ-গান, যাত্রা-থিয়েটার, সিনেমা যেভাবে বিনোদনের বৃহত্তর মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ইসলামে তা হবে না কেন ? এগুলোকে ওদের মতো করে গ্রহণ না করলে

আমাদের হাজার হাজার সংস্কৃতি সেবী ও শিল্পী ইসলামকে এড়িয়ে চলবেন। কাজেই এগুলো গ্রহণ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

ইসলাম সম্পর্কে আধুনিক মুসলিম বুদ্ধিজীবী সমাজের এই যে দৃষ্টিভংগী এটাকে আমরা ইসলামের মূল্যায়ন বা পুনরমূল্যায়নের পর্যায়ে ফেলতে পারি না। কারণ মূল্যায়ন বা পুনরমূল্যায়ন তো হবে মূল্যবোধের ভিত্তিতে। মূল্যবোধই যদি ক্ষুণ্ন হয় তাহলে মূল্যায়ন হবে কিসের ? এ অবস্থায় তো মূল্যবোধ ক্ষুণ্ন হবার ফলে ভিন্ন জিনিসের সৃষ্টি হয়। সে জিনিসটি ইসলাম নয়। ইসলাম তো তাই যা মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ কুরআনে উচ্চারণ করেছেন এবং তাঁর নবী যাকে একটি বাস্তব কাঠামো দান করেছেন। ইসলামের পরবর্তী রূপকার হচ্ছে সাধারণ মুমিন সমাজ। কিন্তু মুমিন সমাজের এ রূপায়ন সব সময় আল্লাহর বাণী ও নবীর কাঠামোর মধ্যেই থাকতে হবে। এ কাঠামোর বাইরে ভিন্ন কোনো কাঠামোকে আর ইসলাম বলা যাবে না। তাকে ভিন্ন নামে অভিহিত করতে হবে। তাই মুমিন সমাজ প্রতি যুগে ইসলামের চর্চা করবে। পরিবেশ ও পরিস্থিতি এবং স্থান ও কাল তাদের জীবন চর্চায় যে প্রভাব ফেলে তাকে তারা গ্রহণ করবে এই কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করেই, এর বাইরে বের হয়ে বা বের হবার চেষ্টা করে নয়। একজন লোক তার হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্য নিয়ে ইহুদী, দ্বিতীয় একজন লোক তার হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্য নিয়ে খৃষ্টান, তৃতীয় একজন লোক তার হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্য নিয়ে হিন্দু থাকতে পারে, তাদের বিশ্বাস ও জীবন কাঠামো যেমনই হোক না কেন তা তাদের ইহুদীত্ব, খৃষ্টানত্ব ও হিন্দুত্বকে প্রভাবিত বা বিনষ্ট করতে পারে না। কিন্তু একজন মুসলমানের বেলায় তা সঠিক নয়। মুসলমানের পরিচয় তার বিশ্বাসে ও বিশেষ জীবন কাঠামোয়। এই বিশ্বাস ও জীবন কাঠামো যদি ভিন্ন হয় তাহলে কোনো ব্যক্তির মুসলমানী নাম থাকতে পারে, হয়তো সে মুসলমানী ঐতিহ্যেরও অধিকারী হতে পারে কিন্তু সে মুসলমান নয়।

মুসলমান ও ইসলাম সারা দুনিয়াটাকে এবং দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে স্পষ্ট দু ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। যারা মুসলমান এবং যারা মুসলমান নয়, এরা স্পষ্ট দু দল। যারা খৃষ্টান এবং যারা খৃষ্টান নয় অথবা যারা হিন্দু এবং যারা হিন্দু নয়, এভাবে কিন্তু দুনিয়াকে স্পষ্ট দু ভাগে ভাগ করা যাবে না।

কারণ যারা খৃস্টান নয় তাদের মধ্যে আবার মুসলমানরা কিন্তু ভিন্ন ধরনের। যারা হিন্দু নয় তাদের মধ্যে মুসলমানরা ভিন্ন রকমের। তাদের সাথে অ-খৃষ্টান ও অ-হিন্দুর মিল নেই। প্রথমে তওহীদবাদকে ধরা যায় এবং তারপর এ ধরনের আরো বহু জিনিস রয়েছে যা মুসলমানদের থেকে সবাইকে আলাদা

করে দেবে। কিন্তু অ-মুসলমান অর্থাৎ যারা মুসলমান নয় তাদের মধ্যে বড় ছোট বহু রকমের মিল রয়েছে। মুসলমানদের মোকাবিলায় তাদের সবাইকে এক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। শিরক তাদের মধ্যে একটা সাধারণ বিষয়। স্রষ্টার সার্বভৌম ক্ষমতার স্বীকৃতি তাদের মধ্যে নেই। স্রষ্টার কোনো প্রেরিত প্রতিনিধির নেতৃত্ব জীবনের সবক্ষেত্রে তারা মেনে নেয়নি। এ ধরনের আরো বহু সাধারণ বিষয় তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে।

এভাবে অ-মুসলমান ও মুসলমানের মধ্যে বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে মহা পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই এ দু দল একই ধারায় ও একই পথে এগিয়ে যেতে পারে না। অ-মুসলমানরা তাদের পূজা-পার্বণ-উপাসনা-আরাধনাকে ব্যক্তিগত ব্যাপার মনে করতে পারে। চাইলে এগুলো করতে পারে, চাইলে নাও করতে পারে। ধর্ম তাদের আত্মিক উন্নতির বাহন, জীবন যাপনের জন্য অপরিহার্য নয়। ধর্মকে বাদ দিয়ে তারা জাগতিক উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করতে পারে। কিন্তু মুসলমানের ব্যাপারটা তা নয়। মুসলমান বা মুসলিম শব্দের মধ্যেই রয়েছে ইসলাম। ইসলাম মানে আত্মসমর্পণ। আংশিক নয়, পূর্ণাঙ্গ। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ উদখুলু ফিস্‌সিলমি কা-ফ্‌ফাহ—অর্থাৎ ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করো পুরোপুরি। এ আত্মসমর্পণ আল্লাহ ও রসূলের বিধানের কাছে। তার মানে একজন মুসলমান প্রথমত সে পুরোপুরি আত্মসচেতন। অর্থাৎ সে একজন সচেতন আত্মসমর্পণকারী। দ্বিতীয়ত সে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে আল্লাহ ও রসূলের বিধানের কাছে। তৃতীয়ত এখানে আধ্যাত্মিক জীবনের আত্মসমর্পণকে বৈষয়িক জীবনের আত্মসমর্পণ থেকে আলাদা করা হয়নি। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জীবনে সে যে আল্লাহ ও রসূলের বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে বৈষয়িক জীবনেও কোনো দুনিয়াবী স্বার্থ বা শক্তির কাছে নয় বরং সেই একই আল্লাহ ও রসূলের বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। কাজেই প্রত্যেকটি মুসলমান এবং তার সমগ্র জীবন আল্লাহ ও রসূলের পুরোপুরি আনুগত্যের অধীন।

এটাকে ঠিক এভাবে বিচার করা যায়, একটা স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক নিজেকে সেই রাষ্ট্রের কোনো আইনের আওতার বাইরে রাখতে পারে না। এ রাষ্ট্রের আইন তাকে পুরোপুরি মেনে চলতে হবে। আর এ রাষ্ট্রে বাস করে এবং এর অধিবাসী হয়ে সে কেমন করে এর কোনো কোনো আইন অমান্য করতে পারে? সে নিজেকে কি একজন উচ্ছৃংখল ও বিদ্রোহী নাগরিক হিসাবে চিহ্নিত করতে চায়? তাই যদি হয়, তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের একজন মুসলমানের জন্য সেই রাষ্ট্রের বৈষয়িক আইন মেনে চলা ও নামায পড়ার মধ্যে কি কোনো ফারাক থাকতে পারে? আইনটা আল্লাহর,

নামাযটাও আল্লাহর। ফারাকটা হচ্ছে প্রচলনের। সারা দুনিয়ায় আজকের রেওয়াজ হচ্ছে ঃ ইবাদত ও উপাসনার বিধান আল্লাহ দিয়েছেন, এটা আল্লাহর জন্য এবং আইনের বিধান আমরা তৈরী করেছি, এটা আমাদের জন্য। অন্যদিকে ইসলাম বলেছে ঃ ইবাদতের বিধান আল্লাহ দিয়েছেন, এটা আল্লাহর জন্য এবং আইনের বিধানও আল্লাহ দিয়েছেন, তবে এটা আমাদের জন্য। ফলে ইসলামে ইবাদত বন্দেগী ও রাষ্ট্রের আইন মেনে চলা উভয়ই সমান পর্যায়ের। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্রে নামাযটা ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকছে না বরং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরিণত হচ্ছে। তাছাড়া নামাযটা শুধুমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ব্যাপার নয় বরং এর মধ্যে ব্যক্তি চরিত্র গঠন, নিয়ম-শৃংখলার অনুশীলন ইত্যাকার আরো বহু ব্যাপার রয়েছে যার সাথে রয়েছে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের গভীর সম্পর্ক। কাজেই প্রত্যেকটি মুসলমানের জন্য নামায সমান গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য বিষয়। একে বাদ দিয়ে কোনো মুসলমান একটি ইসলামী রাষ্ট্রের যথার্থ নাগরিক হওয়ার যোগ্যতা লাভ করতে পারে না।

এখানে আসতে পারে অমুসলিমদের প্রশ্ন। অমুসলিমদের জন্য ইসলাম ধর্মীয় ক্ষেত্রে পূর্ণ সুযোগ সুবিধা দিয়েছে। তারা নিজেদের ধর্ম পুরোপুরি ও স্বাধীনভাবে মেনে চলতে পারবে। বরং অন্য কোনো ধর্মহীন, ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্ম বিরোধী রাষ্ট্রের তুলনায় তারা এখানে ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে চলার ব্যাপারে সুযোগ-সুবিধা পাবে আরো অনেক বেশী। অন্যদিকে বৈষয়িক আইনেও তাদের প্রতি অবিচার ও জুলুম করা হবে না।

এতো গেল ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে। অন্যদিকে পার্থিব জীবনের বিষয়াবলীর প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, সমাজে নারীর মর্যাদা একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইউরোপীয় রেনেসাঁর পর থেকে নারী স্বাধীনতার প্রক্রিয়া চলছে। এটা ইউরোপ থেকেই শুরু হয়েছে। এর লক্ষ হচ্ছে, সমাজে নারীর মর্যাদা পুরুষের সমান করা, নারী নির্যাতন বন্ধ করা এবং নারীর প্রতি অবিচার না করা। ইউরোপে নারী চিরকাল একটি ঘৃণিত সত্তা ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। দূর অতীতের কথা বাদ দিলাম। নিকট অতীতের ইউরোপের শ্রেষ্ঠ লেখক এবং ইংরেজদের অহংকার উইলিয়াম সেক্সপিয়রের নাটকে নারীকে কিভাবে চিত্রিত করা হয়েছে ? একজন শ্রেষ্ঠ লেখক ইউরোপের সমাজ চিত্রই এঁকেছেন। নারীর প্রতি তাঁর যে কটাক্ষ ও অবজ্ঞা এটাতো সমগ্র ইউরোপীয় পুরুষের মানসচিত্র। এটা সমগ্র ইউরোপীয় পুরুষদের দীর্ঘকালীন মানস চর্চার ফসল। ইউরোপে আধুনিককালের নারী স্বাধীনতার হিড়িক এরি প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া। ইসলামী দুনিয়াকে বাদ দিলে

অ-ইসলামী দুনিয়ার এশীয় আফ্রিকীয় এলাকার অবস্থাও ছিল প্রায় একই। কাজেই পশ্চিমের নারী স্বাধীনতার হুজুগ এদিকেও চলেছে।

কিন্তু মুসলিম সমাজের অবস্থা ঠিক একই পর্যায়ভুক্ত ছিল না। আজ থেকে হাজার বছর আগেও খিলাফতে রাশেদার পর দু-তিনশ বছর পর্যন্ত ইসলামী সমাজের যে সম্প্রসারণ ঘটে সেখানে ইসলামী চিন্তাই পুরোপুরি প্রবল ছিল এবং বিশ্বসমাজের ওপর এর প্রভাবও পড়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে অবিরাম সম্প্রসারণ ও সংঘাত এবং চিন্তার গতিশীলতার ক্রমাবনতি ইসলামী সমাজের মধ্যেও অনেক অনৈসলামী চিন্তা ও রীতিনীতির অনুপ্রবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়। ফলে বিগত হাজার বছরে আমাদের সমাজেও মেয়েরা অনৈসলামী সমাজের মতো বেশ কিছুটা অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে। কুরআনে ও হাদীসে মেয়েদের অধিকার ও মর্যাদা যেভাবে লিপিবদ্ধ আছে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মুসলিম সামাজিক অংগনে ঠিক তার তেমনি ধরনের প্রয়োগ হয়নি। বিগত দু তিন শ বছরে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাধান্যের যুগে এ অবস্থার আরো অবনতি হয়েছে। ফলে নারী স্বাধীনতার জিগির আমাদের সমাজেও উঠেছে। এ জিগিরটা পুরোপুরি পাশ্চাত্য কায়দায় এগিয়ে চলছে। নারী ও পুরুষ উভয় গোষ্ঠী এ ব্যাপারে ইসলাম কি মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে তা জানার ও চর্চা করার প্রয়োজন বোধ করছে না। আমাদের সমাজের একটা বিশেষ ধারা আছে। তার মধ্যে অন্য সমাজের প্রভাবে যে বিরূপ পরিবর্তনটা এসেছে সেটি দূর করাই ছিল প্রাথমিক প্রয়োজন। তারপর এর নিজস্ব ধারায় উন্নয়ন ও পরিবর্তন প্রক্রিয়া চলতো। এটিই ছিল আমাদের স্বাধীন সত্তা ও আত্মমর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যশীল পদ্ধতি। কিন্তু তা না করে আমরা পুরোপুরি পাশ্চাত্যের গোলামী ও লেজুড়বৃত্তির দিকে এগিয়ে চলছি।

পাশ্চাত্যের সামাজিক বিধানে নারী ছিল পুরুষের দাসী। এখন নারী সেখানে স্বাধীনতা লাভ করেছে কিন্তু নারীত্বের মর্যাদা সেখানে আগেও ছিল না, এখনো নেই। এখন নারী সেখানে পুরুষের সমপর্যায়ে চলে এসেছে কিন্তু নারী হয়ে নয়, পুরুষ হয়ে। এজন্য তাকে তার নারীত্ব বিসর্জন দিতে হয়েছে। তাকে লেবাসে-পোশাকে, চলনে-বলনে, মন-মানসিকতায় পুরুষ সাজতে হয়েছে। এজন্য তাকে সংসারকে লণ্ডভণ্ড করে দিতে হয়েছে। অর্থ উপার্জনের স্বাধীনতা লাভ করার জন্য তাকে হতে হয়েছে পুরোপুরি পুরুষের কামসহচরী। যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াকু সৈনিক হতে গিয়েও সে তার এই মর্যাদা রক্ষা করতে পারেনি।

ইসলাম গোড়াতেই এ ধরনের অস্বাভাবিকতা বর্জন করেছে। ইসলামে নারী পুরুষের দাস নয়। বরং পুরুষের সমান একটি মর্যাদাসম্পন্ন সামাজিক ও মানবিক সত্তা। ইবাদত বন্দেগী, সম্পত্তির অধিকার, অর্থনৈতিক কর্মের

স্বাধীনতা, শিক্ষা লাভের অধিকার ইত্যাদি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের মতো তারও রয়েছে। তার এই অধিকারকে তার সক্ষমতার আওতায় রাখা হয়েছে। পুরুষের সক্ষমতা এবং তার সক্ষমতা সমান পর্যায়ের নয়, এটা একটা বাস্তব সত্য। কিন্তু পাশ্চাত্য যেখানে নারীর নিজস্ব সক্ষমতার ক্ষেত্রেই তার অধিকার ও মর্যাদা দেয়নি সেখানে ইসলাম প্রথম দিন থেকেই তা দিয়ে আসছে। নারীর সক্ষমতার এই বিশেষ সীমাবদ্ধতার কারণে তুলনামূলকভাবে অধিকতর সক্ষমতার অধিকারী পুরুষকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে নেতৃত্বের অগ্রাধিকার দান করা হয়েছে। এটা স্বাভাবিকতার সাথে সামঞ্জস্যশীল।

মানবিক সমাজের দুটো বৃহৎ ক্ষেত্র। গৃহ ব্যবস্থাপনা এবং অর্থনৈতিক উৎপাদন। সক্ষমতার দিক বিবেচনা করে একটায় নারীকে এবং অন্যটায় পুরুষকে প্রধান ভূমিকায় রাখা হয়েছে। গৃহ ব্যবস্থাপনায় নারী এবং অর্থ উৎপাদনে পুরুষ সর্বাধিনায়ক। প্রয়োজনে উভয়ে অন্যের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারবে।

দ্বিতীয়, সমাজে নারী ও পুরুষের যথেচ্ছ বিচরণকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। এর পেছনে রয়েছে শান্তি ও শৃংখলা সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্য। যেখানে পথ চলতি পুরুষদেরকে মেয়েদের দেখলে দৃষ্টি আনত করতে বলা হয়েছে সেখানে মেয়েদেরকেও দৃষ্টি আনত করতে বলা হয়েছে। এখানে ফারাক শুধু এতটুকুন যে, মেয়েদের শরীর পুরুষদের তুলনায় বেশী ঢাকতে বলা হয়েছে, এর মূল কারণ দুটো। এক, পুরুষদের মূলত বাইরে ও ভারী কাজ করতে হয়। তাই তারা শরীরের বেশীর ভাগ অংশ খুলে রাখতে অভ্যস্ত হয়। অন্যদিকে মেয়েদের কাজ করতে হয় গৃহে এবং তাদের কাজ সাধারণত হয় হালকা। কাজেই শরীরের বেশীর ভাগ অংশ ঢাকা দিয়ে বাইরে বের হওয়া তাদের জন্য অস্বাভাবিক হয় না। দুই, পুরুষের শরীরেও মেয়েদের জন্য আকর্ষণ আছে ঠিকই কিন্তু তার তুলনায় মেয়েদের শরীরে পুরুষদের জন্য আকর্ষণ আছে অনেক অনেক গুণ বেশী। শরীরের বেশীর ভাগ অংশ ঢাকা দিয়ে এই আকর্ষণ সৃষ্ট বিশৃংখলা থেকে সমাজকে রক্ষা করা হয়।

এটা কোনো অমানবিক, অভদ্রজনোচিত ও অবিচারমূলক ব্যবস্থা নয়। বরং একটি সম্পূর্ণ প্রকৃতি সম্মত ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থা। মেয়েদের খোলামেলা ও উড়নচণ্ডীর মতো স্বাধীনভাবে চলা মোটেই এর সাথে খাপ খায় না। পাশ্চাত্য সামাজিকতার সাথে সেটার মিল বেশী। আর "পর্দানশীনা"র যে ধিক্কার দেয়া হচ্ছে সেটা আসলে কতদূর যথার্থ তা বিচার্য বিষয়। কারণ এর পেছনে কোনো দাসত্ব মনোবৃত্তি নেই বরং আত্মমর্যাদাবোধ পুরোপুরি সক্রিয়। তবে অবশ্যই পর্দার ধরনটা বাস্তবসম্মত ও জীবন ধারণের উপযোগী হতে হবে।

ইসলামী আইন অপব্যবহারের সুযোগ নেই

আইন মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষ আইনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে আসছে। সুসভ্য মানুষ একটা উন্নত আইনের অধীনে চলে আর অসভ্য মানুষরাও নিজেদের মনের মতো করে কিছু আইন তৈরী করে নিয়ে তার কঠোর অনুশাসনের আওতায় নিজেদেরকে আটকে রাখতে চায়।

ইউরোপে রোমান আইনের প্রচলন বেশ কিছুটা প্রাচীনত্ব দাবী করতে পারে। পাশ্চাত্য দেশগুলোর আইন এ রোমান আইনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এ আইনের মূলে একদিকে যেমন ছিল সংকীর্ণতার দোষ তেমনি অন্যদিকে এটি ছিল শক্তিশালীর জুলুম ও শোষণেরও হাতিয়ার। তাই বিশ্বে ইসলামী আইনের প্রচলনের পর এ রোমান আইনের মধ্যে শুরু হয় ব্যাপক সংশোধন ও সংস্কার। এখনো এ সংশোধন অব্যাহত আছে।

আসলে কোনো আইন তা যত উন্নত পর্যায়েরই হোক না কেন কোনোদিনই কোনো উন্নত সমাজ ব্যবস্থার গ্যারান্টি দিতে পারে না যতক্ষণ না তার সাথে যুক্ত হয় আর একটি বাড়তি শক্তি। সেটি হচ্ছে, যাদের ওপর সে আইন প্রযুক্ত হবে তাদের তা গ্রহণ করার ক্ষমতা। আইন নিজে তো কোনো শক্তি নয়। শক্তির মাধ্যমে আইনের প্রয়োগই আইনকে শক্তিতে পরিণত করে। এ শক্তি হয়ে থাকে রাষ্ট্রের, সমাজের বা গোষ্ঠীর। এই শক্তি যাদের ওপর প্রযুক্ত হয় সেই মানব সমাজ যদি এ শক্তিকে যথাযথ সমীহ্ করে, একে মনেপ্রাণে গ্রহণ ও উপলব্ধি করে এবং এর নির্দেশ অনুযায়ী আন্তরিকভাবে নিজের জীবন গড়ে তুলতে চায় তবেই এ আইন যথার্থই তার শক্তির ক্যারিজমা দেখাতে সক্ষম হয়। রোমান আইনের মৌল প্রকৃতি ঠিক এভাবে গঠিত হয়নি। তাই আজ সারা বিশ্বে রোমান আইনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়লেও সমাজ ব্যবস্থায় তা কোনো গভীর সংস্কার সাধনে সক্ষম হয়নি। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে সাদা ও কালোর ঝগড়া আজো প্রাচীন যুগকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অথচ ইসলামের নবী আজ থেকে চৌদ্দশো বছর আগে "আজমের ওপর আরবের কোনো প্রাধান্য নেই এবং কালোর ওপর সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই" আইনের এ মূল নীতির ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন এবং সে সমাজের মৌল প্রাণশক্তি আজো মুসলিম সমাজে অক্ষুণ্ন আছে।

আজ থেকে চৌদ্দশো বছর আগে পৃথিবীতে একটা ইনসাফ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবী নিয়ে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। মানুষকে মানুষের জুলুম ও

শোষণ থেকে রক্ষা করাই ছিল তার কাজ। এজন্য ইসলাম যে আইন প্রবর্তন করে অতি অল্প দিনেই তা সারা পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর মূল বৈশিষ্ট ছিল এর গঠন ও প্রবর্তন পদ্ধতি। ইসলামকে বলা হয় প্রকৃতির ধর্ম। অর্থাৎ মানুষের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে এর আইনগুলো তৈরী করা হয়েছে এবং সেগুলো প্রবর্তন করার জন্য রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শক্তির সাথে সাথে এ প্রকৃতির শক্তির সহায়তাও গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকৃতি নিজেই এর চাহিদা প্রকাশ করে। এর ক্ষেত্র প্রথমে প্রকৃতির মধ্যেই তৈরি হয় এবং সে নিজেই হয় এর প্রত্যাশী। কাজেই এর প্রবর্তনে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শক্তি শুধু সহায়তা করে মাত্র। জোর করে একে কোথাও চাপিয়ে দেয়া হয় না বা দেয়া যায় না।

যেমন চুরি করলে ইসলাম হাত কাটার শাস্তির বিধান দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে সম্পদের একটা সর্বনিম্ন পরিমাণও নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, কমপক্ষে এ পরিমাণ মূল্যের জিনিস চুরি করলে হাত কাটা যাবে এবং এর কম হলে হাত না কেটে অন্য কোনো প্রকার শারীরিক কষ্টের শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেয়া হবে। এ শাস্তিকে মানুষের প্রকৃতি সম্মত করার জন্য অর্থাৎ মানুষকে শাস্তি দেয়ার যে মূল লক্ষ তার চারিত্রিক সংশোধন ও সামাজিক শৃংখলা বিধান এ লক্ষে পৌছার উদ্দেশ্যে প্রথমে যে সমাজে এ শাস্তির বিধান প্রবর্তিত হচ্ছে তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাও সামনে রাখছে। তাই যেখানে দুর্ভিক্ষ চলছে, রাষ্ট্র মানুষের খাদ্যবস্ত্রের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হচ্ছে না সেখানে এ আইন প্রবর্তনকে সাময়িকভাবে রহিত ও শিথিল করে দেয়া হয়েছে।

সমাজ চায় নিজেকে দুর্নীতি ও কলুষমুক্ত করতে। কাজেই শাস্তি এমন হতে হবে যার ফলে দুর্নীতি ও কলুষতার উৎপাদন রহিত এবং লালন সম্ভব না হয়। চোরের হাত কাটার শাস্তি তেমনি একটি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। অন্য কোনো প্রকার শারীরিক নির্যাতন বা কারাগারে আটক রাখার শাস্তি এ লক্ষে পৌঁছুতে সক্ষম হয় না। বরং এর ফলে অপরাধ প্রবণতা আরো বেড়ে যায়। একটি সমাজে ও দেশে লাখো লাখো দুর্নীতিবাজ ও চোরের লালনের ব্যবস্থা না করে যদি দশজন দুর্নীতিবাজ চোর, হাইজ্যাকার ও সন্ত্রাসীর হাত কেটে শাপলা চত্বরে, গুলিস্তানের মোড়ে, সদর ঘাট টার্মিনালে, নিউ মার্কেটের পুলের নীচে, ফার্মগেটে ইত্যাদি প্রকাশ্য স্থানে রাস্তার মাঝখানে ঝুলিয়ে রাখা হয়, তাহলে দুদিনেই দেশ থেকে দুর্নীতি, চুরি, ডাকাতি, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাস খতম হয়ে যেতে বাধ্য।

ইসলাম এসব শাস্তির ক্ষেত্রে যেমন কঠোরতা বিধান করেছে তেমনি সতর্কতা অবলম্বনও করেছে। যেমন মিথ্যা সাক্ষ দিয়ে একজন আর একজনকে

ফাঁসিয়ে দিতে পারে। এজন্য মিথ্যা সাক্ষদানকারীকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে ব্যভিচারের শাস্তি পর্যালোচনা করলে এ সতর্কতার গভীরতা পরিমাপ করা যাবে। ব্যভিচারের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে অবিবাহিতের জন্য একশ ঘা বেত্রাঘাত এবং বিবাহিতের প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু। এ ক্ষেত্রে তিনজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীকে সাক্ষদান করতে হবে। তাদেরকে এমন পর্যায়ে সাক্ষ দান করতে হবে যেমন তারা এ ঘটনাকে স্বচক্ষে দেখেছে এবং অপরাধী দুজনকে এমন অবস্থায় দেখেছে যেমন সুঁইয়ের গর্তে সুতো লাগানো থাকে। তিনজনের বর্ণনার মধ্যে একজনের বর্ণনাও যদি সামান্য অস্পষ্ট বা দ্বিধাজড়িত হয়ে যায় তাহলে তিনটি সাক্ষই বাতিল গণ্য হবে এবং পাল্টা তিনজনের বিরুদ্ধে "হদ্দে কাযাফ" তথা সৎ চরিত্রবান পুরুষ ও নারীকে অসৎ চরিত্রের অধিকারী হিসেবে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা চালাবার দায়ে কঠোর বেত্রাঘাতের শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ কারণে রসূল, সাহাবা ও তাবেঈদের যুগে এবং পরবর্তীকালে যতদিন এ শাস্তির বিধান রাষ্ট্রে প্রবর্তিত ছিল খুব কমই এ শাস্তি দেবার সুযোগ এসেছে এবং সমাজও দুর্নীতি ও ব্যভিচার মুক্ত থেকেছে।

আবার এ সংগে এ বিষয়টাও সমান গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলাম এ ধরনের কোনো শাস্তির বিধানকে জনতার হাতে তুলে দেয়নি। কোনো এলাকার জনতা ইচ্ছামতো কাউকে এ শাস্তি দিতে পারে না। একমাত্র রাষ্ট্রই এ দায়িত্ব পালন করবে। যেখানে ইসলামী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও কাঠামো প্রতিষ্ঠিত আছে সেখানে একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রই এ শাস্তি বিধান করতে পারে। কারণ ইসলামের শাস্তির বিধানগুলো রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও সমাজ ব্যবস্থার সাথে জড়িত। এ শাস্তি বিধানের উদ্দেশ্য অপরাধ বৃদ্ধি নয় বরং অপরাধের উৎখাত। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ছাড়া এ ধরনের শাস্তি দেবার প্রচেষ্টা ইসলামের শাস্তি বিধানকে হেয় প্রতিপন্ন করারই একটি প্রচেষ্টায় পরিণত হবে। এর ফলে সমাজে বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়বে এবং দুর্নীতির প্রসার ঘটবে।

এ দৃষ্টিতে আমরা কিছুদিন আগে সিলেটের ছতকছড়া গ্রামের একটি ঘটনা পর্যালোচনা করতে পারি। সেখানে এলাকার একজন তথাকথিত মাতবর এবং শক্তিশালী টাউট, সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজের নেতৃত্বে গ্রামের আরো কিছু অসৎ প্রভাবশালী লোকের সহযোগিতায় 'আমপারা পড়া হামবড়া' মসজিদ ইমামের ফতুয়ার জোরে গ্রামের একজন বৃদ্ধ কৃষকের নিরপরাধ মেয়ের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ এনে তাকে জীবন্ত অবস্থায় মাটিতে গেঁড়ে দিয়ে পাথর মেরে মেরে ফেলা হয়। এই সংগে মেয়েটির বুড়ো বাপ-মা ও তার দ্বিতীয় স্বামীকে একশ ঘা করে ছড়ি মারা হয়। মেয়েটির প্রথম স্বামী তাকে তালাক দেয়। তার কাছ থেকে লিখিত তালাকনামা আদায় করার পর তার বাপ তাকে

দ্বিতীয়বার বিয়ে দেয়। এলাকার ঐ মাতবর মেয়ের বাপের কাছ থেকে এক হাজার টাকা চাঁদা আদায়ের লক্ষে এ শাস্তির নাটক তৈরী করে। মাতবরের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সমগ্র এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সে তার এই অর্থ সংগ্রহের কাজ দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে আসছে। এখন মাতবর, ইমাম ও এ চক্রের কতিপয় সহযোগী গ্রেফতার হয়ে হাজত ভোগ করছে।

আমরা প্রসংগটা এখানে এজন্য আনলাম যে, আইনের শাসন আমাদের দেশে দীর্ঘকাল থেকে শিথিল হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে ষড়যন্ত্রকারীরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইসলামী আইনের নাম নিয়ে তাদের মিথ্যা নাটকের মধ্যে তার ব্যবহার করলে সেটা একটা ষড়যন্ত্র ও হীন স্বার্থসিদ্ধি হিসেবেই গণ্য হবে। এ ধরনের নাটকে যে কোনো আইনকেই ব্যবহার করা যায় এবং ষড়যন্ত্রকারীরা তা করে আসছে। তাদের দৃষ্টিতে তো নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও অর্থলিপ্সার কাছে কোনো কিছুর পবিত্রতা ও যৌক্তিকতার কোনো মূল্য নেই। কাজেই এর ফলে ইসলামী আইনের যৌক্তিকতা ও শ্রেষ্ঠত্বে সামান্যতমও পার্থক্য সৃষ্টি হয় না এবং এর অপপ্রয়োগের কারণে এ আইন মধ্যযুগীয়ও হয়ে যায় না।

তবে ইসলামী আইনের নামে এ মিথ্যার নাটক তৈরী করে নারকীয় হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচার চালানোর দায়ে অভিযুক্ত অপরাধীদের কঠোর শাস্তিদানের প্রয়োজন রয়েছে এবং এই সংগে নিহত মেয়েটিকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হবার কারণে সরকারের উচিত তার বাপকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া।

আত্ম প্রতিষ্ঠার শক্তি ইসলামের মধ্যেই রয়েছে

ইসলামের আগমনের আগে কোনো ধর্মমত কোনো চিন্তাদর্শন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েনি। ইসলাম এসেছে এবং দ্রুত সমস্ত মানব গোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ তিনটি মহাদেশ পাশাপাশি লাগোয়া। মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তিনটি মহাদেশের সকল মানব গোষ্ঠীর মধ্যে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়েছে।

অথচ ভৌগোলিক দিক দিয়ে এরও কয়েক হাজার বছর আগে থেকে এ তিনটি মহাদেশ পাশাপাশি বিরাজ করছে কিন্তু কোনো একটি ধর্মমত এ তিনটি মহাদেশে এককভাবে বিস্তার লাভ করেনি। বড় জোর জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের কথা বলা যেতে পারে। জৈন ধর্ম একটি বিশেষ এলাকায় অর্থাৎ মধ্য এশিয়া থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। বৌদ্ধ ধর্ম অবশ্য এর চেয়ে বেশী দূরে চলে যায়। এ ধর্মমতটির উদ্ভব হয় ভারতে। এখান থেকে একদিকে মধ্য এশিয়া এবং অন্যদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এর বিস্তৃতি দেখা যায়। কিন্তু এ বিস্তৃতি হতে যেমন কয়েকশ' বছর লেগে যায়, তেমনি বিস্তার লাভ করতে করতে এর রূপ ও আকৃতির বহু পরিবর্তন ঘটে। অন্যদিকে এশিয়ার বাইরে ইউরোপে বা আফ্রিকায় এ ধর্ম দুটির ছড়াবার কোনো পথ তৈরী হয়নি।

ইসলামের আগমনের পূর্বে পশ্চিমা বিশ্বে খৃস্টবাদই ছিল প্রবল ধর্মমত। এশিয়ার দক্ষিণে ও পূর্বাঞ্চলে এবং আফ্রিকায় এর প্রভাব ছিলই না বললে চলে। একমাত্র ব্যতিক্রম মিসর ও আবিসিনিয়া। মিসরের সাথে রোমানদের দীর্ঘ সংঘাত এবং মিসর ও আবিসিনিয়ায় রোম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির ফলে সে এলাকায় খৃস্টধর্মমতের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়। যে এশিয়ায় হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম সে এশিয়ার বিভিন্ন এলাকায় তাঁর ধর্ম বিস্তার লাভ করেনি। মধ্য ও পূর্ব এশিয়ার সীমিত এলাকায় এর বিস্তৃতি ঘটে। আর ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপে এবং আফ্রিকার দু তিনটি দেশে।

এর মূল কারণ দু'টি। এক, বিশ্বে আসলে তখনো উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে দ্রুত চলাচলের ব্যবস্থা ছিল না। বাণিজ্য পথ ছিল দুটি—স্থল এবং নৌ-পথ। এস্থল পথেই সারা দুনিয়ায় তথা এ তিনটি মহাদেশের মধ্যে যোগাযোগের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে অনেক সময় এসব স্থল পথে দীর্ঘকাল অবাধ চলাচল বন্ধ থাকতো। ফলে এক দেশের মানব গোষ্ঠীর থেকে আর এক দেশের

মানব গোষ্ঠীর দূরত্ব বেড়ে যেতো। অন্যদিকে নৌ-পথের একমাত্র বাহন ছিল পাল তোলা নৌকা। মওসুম ও আবহাওয়ার প্রতিকূলতা এবং গতির ধীরতা একে এমনিতেই পিছিয়ে রেখেছিল।

দ্বিতীয় কারণটি ছিল ধর্মমতের বিশুদ্ধ ও মৌলিকত্ব। একটি ধর্মমতের আহবায়ক যখন প্রথমে জনসমক্ষে তার দাওয়াত দেন, তখন তিনি তাকে উপস্থাপিত করেন সঠিক ও নির্ভেজাল রূপে এবং তার প্রকৃত আকৃতিতে। ইসলামের মতে নবী বা পয়গম্বরদের সংখ্যা হাজার হাজার বরং লাখও ছাড়িয়ে গেছে এবং সকল পয়গম্বর আল্লাহর কাছ থেকে একই দাওয়াত নিয়ে এসেছেন। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর ইবাদত এবং আল্লাহ বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করতে বলেছেন। তাঁদের ইন্তিকালের পর তাঁদের অনুসারীরাই এ দাওয়াতের মধ্যে সংশোধন ও সংযোজন করে এর মূল চেহারা পাল্টে দেয়। ফলে এর প্রাথমিক আকর্ষণ বিনষ্ট হয়। এরপর চেহারা বদল হতে হতে একদিন এর আসল চেহারার ঝাপসা কোনো আদল বা রূপেরই সন্ধান পাওয়া যায় না। তখন এর সমস্ত আকর্ষণই খতম হয়ে যায় এবং স্থানীয় আর দশটা বিভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও মানুষের তৈরী ধর্মমত তথা দার্শনিক মতবাদের সাথে একাকার হয়ে যায়। ফলে মূল আহ্বায়কের মৃত্যুর পর এ ধর্মমতটি অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়লেও এর মূল প্রাণশক্তি নিশ্চিহ্ন বা নিস্তেজ হয়ে পড়ার কারণে এর গতিশীলতা স্থবিরত্বে রূপান্তরিত হয়। ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্মমত ও জীবন দর্শনের মধ্যে এই স্থবিরতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ইসলামই একমাত্র মৌলিক ধর্মমত ও জীবন দর্শন হিসেবে সারা বিশ্বে টিকে আছে।

ইসলামের আগমনকালে পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যই ছিল বিশ্বে প্রবল। এ দুটি ছিল শক্তিধর সভ্যতা। বিশেষ করে পারস্য সভ্যতা তো হাজার বছরের ঐতিহ্যের অধিকারী। তারা ছিল অগ্নি উপাসক। তারা সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল ঠিকই কিন্তু তাদের এ ধর্ম বিস্তার লাভ করতে পারেনি ব্যাপকভাবে। অন্যদিকে রোম সম্রাটরা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার পর ইউরোপে খৃষ্টধর্মের প্রসার ঘটে। আজকে যারা সমাজ ও সভ্যতায় ধর্মকে প্রভাবহীন করার চেষ্টা করছে—মানব জাতির ও সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাস কিন্তু তার অসারতা প্রমাণ করছে। বরং বিগত হাজার হাজার বছরে ধর্মই ছিল সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রের মূল নিয়ামক শক্তি। কোন জাতির ইতিহাসে ধর্মের শক্তির অস্বীকৃতি নেই। বরং ধর্ম সেখানে প্রবল শক্তিধর। আর আজকের আধুনিক বিশ্বে মার্কসবাদের পতনের পর সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ায় ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্তির একটি রেখা ফুটে উঠেছে। সাবেক যুগোশ্লাভিয়ায় সার্ব, ক্রোট ও বসনিয়ার মধ্যে যুদ্ধও চলছে ধর্মের ভিত্তিতে। সার্ব ও ক্রোটরা প্রথমে বসনিয়ার মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক জোট

হয়ে গিয়েছিল। এখন আবার ক্রোটরা বসনীয় মুসলমানদের সাথে এক জোট হয়ে গেছে সার্বদের বিরুদ্ধে। কারণ সার্বীয়রা খৃষ্টান হলেও তারা পূর্ব দেশীয় অর্থোডক্স গীর্জার অনুগত। যার মূল শক্তি রুশ ও পোলিশ গীর্জার হাতে। অন্যদিকে ক্রোটরা হচ্ছে রোমান ক্যাথলিক গীর্জার অনুগত। আর এ দু গ্রুপের মধ্যে সংঘাত অতি পুরাতন। বৃটেন, জার্মানীর মতো আরো কয়েকটি প্রটেষ্ট্যান্ট দেশ এবং পাঁচ ছয়টি পূরবীয় অর্থোডক্স ক্রিশ্চিয়ান দেশ ছাড়া সমগ্র ইউরোপই রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান। আর এজন্যই এখন তারা ক্রোটদের কারণেই সার্বীয়দের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হচ্ছে আগের তুলনায় বেশী জোরেশোরে। এটা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ও সভ্যতায় ধর্মের প্রভাবেরই ফল।

ইসলামের আমগনকালে পারসিক ও রোমানদের মধ্যে চলছিল লড়াই। পারসিকরা এ যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ নাম দিয়েছিল। কিন্তু এরপরও পারসিকদের মধ্যে সেই ধর্মীয় চেতনা জাগেনি এবং শেষতক তারা যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেছিল। রোমানরা জয়লাভ করলেও পারস্য সাম্রাজ্যে খৃষ্টধর্ম প্রসার লাভ করেনি। কিন্তু একই সময়ে মুসলমানদের বিজয়ের সাথে ইসলামেরও বিজয় সূচিত হয়েছে। কারণ ইসলাম কোনো অন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি। মুসলমানরা কোনো আগ্রাসী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েনি। বরং হযরত উমরের আমলে যখন রোমানদের সাথে বারবার লড়াই চলছিল, তখন খলীফা নিজেই আল্লাহর কাছে এ ফরিয়াদ করেন, হে আল্লাহ ! কতই না ভালো হতো যদি তুমি সিরিয়ার রোমান ও মুসলিম এলাকার মাঝখানে একটা আগুনের পাহাড় তৈরী করে দিতে।

ইসলাম এ বিশ্বে একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে। মানুষ নিজের ক্ষমতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করে অন্য মানুষের ওপর জুলুম, অত্যাচার ও শোষণ চালাবে—এটা ইসলাম বরদাশত করতে পারে না। কারণ মানুষকে সে আল্লাহর দাস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কাজেই মানুষকে যে নিজের দাস বলে দাবী করবে, সে আসলে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। আল্লাহর দাস হিসেবে এ বিদ্রোহ দমন করার দায়িত্ব অবশ্যই মুসলমানদের ওপর এসে পড়ে। কিন্তু বিদ্রোহীকে দমন করে সে তাকে নিজের দাসে পরিণত করতে পারে না। তাই বিদ্রোহী যদি নিজেকে আল্লাহর দাস হিসেবে ঘোষণা দেয়, তাহলে সে তার ভাইয়ে পরিণত হয় এবং তার সাথে সব বিরোধেরও অবসান ঘটে। ইসলামের এ বিপ্লবী দাওয়াতই তাকে অকল্পনীয় গতিশীলতা দান করে। মুসলমানরা কোনো দেশে প্রবেশ করার আগেই তাদের দাওয়াত সেখানে পৌঁছে গেছে এবং তারা কোনো দেশ জয় করার আগেই সে দেশের জনতা বিজিত হয়ে গেছে। খৃষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতকের বিশ্বে এটা ছিল একটা অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়। ইসলামের প্রতি মুসলমানদের ঐকান্তিকতা,

খুলুসিয়াত, বিশ্বস্ততা ও ত্যাগ যতদিন অক্ষুণ্ন ছিল ততদিন এ গতি ছিল দুর্বার ও অপ্রতিরোধ্য। বর্তমানে এ গতির মন্থরতার কারণ এ গুণগুলোর নেতিবাচক উপস্থিতি। বর্তমানেও সারা বিশ্বে ইসলামের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যায়নি। কিন্তু এখন মুসলমানদের কারণে নয় বরং ইসলামের কারণে অন্যেরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে এবং তার গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করছে।

সে যুগে ইসলামের দ্রুত ও বিশ্বব্যাপী প্রসারের আর একটি কারণ ছিল বিশ্ব যোগাযোগ ব্যবস্থায় আরবদের আধিপত্য। ইসলামের আগমনের বেশ কিছুকাল আগে থেকেই ইউরোপ ও এশিয়ার মূল বাণিজ্য পথের বিশাল অংশ আরব বণিকদের করায়ত্ব হয়। ফলে সমগ্র আরব ইসলাম গ্রহণ করার পর নিবেদিত প্রাণ আরব বণিকদের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত চীন থেকে শুরু করে ইউরোপের ভূমধ্যসাগরীয় এলাকাগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। এসব এলাকায় কোনো প্রকার লড়াই ও যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়াই লক্ষ লক্ষ লোক ইসলাম গ্রহণ করে। এ আমলেই এ উপমহাদেশের দক্ষিণ ও পূর্ব উপকূলে আরব বণিকদের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারিত হয়। আজ এ উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে প্রায় ৪৫ কোটি মুসলমানের বাস। আজ থেকে আটশো বছর আগে মুসলমানরা যখন উপমাহদেশের কেন্দ্র দিল্লী অধিকার করে এখানে তাদের শাসন সম্প্রসারিত করে, তখন যদি ইসলাম তারও পাঁচশ বছর আগের শক্তিতে তাদের মধ্যে বিরাজ করতো, তাহলে এ উপমাহদেশে আর শিরকের চিহ্নই থাকতো না। এটি হতো বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশ। অথবা যদি মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু জয় করার পর দামেশকে ক্ষমতার হাত পরিবর্তন না হতো এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধু থেকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে দামশকে হত্যা না করা হতো তাহলে আজ উপমহাদেশের ইতিহাসই বদলে যেতো। সিন্ধুর মতো সমগ্র উপমহাদেশই হতো বিপুল মুসলিম প্রধান এলাকা।

বর্তমানে খৃষ্টবাদ সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এটা মাত্র গত কয়েকশো বছরের ঘটনা। আবার এই ছড়িয়ে পড়াটা স্বাভাবিক পথে হয়নি। দুটি পথে এটা সম্ভব হয়েছে। এক, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের খৃষ্টানদের আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মতো দুটি মহাদেশসহ আরো বহু দেশে উপনিবেশ স্থাপন। দুই, বিগত দু তিন শো বছর থেকে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ইউরোপীয় জাতিদের ঔপনিবেশিক শাসন। এ শাসনের পথ ধরে সংশ্লিষ্ট দেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার আবার খৃষ্টধর্ম প্রচারের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম। খৃষ্টধর্ম প্রচার করার জন্য ইউরোপের অত্যাধুনিক টেকনোলজিরও তারা সাহায্য নিয়েছে। দুঃস্থ-দুর্গত

জনতার সাহায্যের নামে সেবাকর্ম, রোগীর চিকিৎসার নামে হাসপাতাল, অশিক্ষিতের শিক্ষার জন্য স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি উদ্দেশ্যমূলক কর্মের মাধ্যমে সুকৌশলে আবার কোথাও বাধ্যতামূলকভাবে খৃষ্টধর্ম প্রচারের কাজে তারা এগিয়ে গেছে। বিশেষ করে আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার অনুন্নত উপজাতির মধ্যে তারা এ টেকনিক অবলম্বন করে বিশেষ কামিয়াবী অর্জন করেছে। এভাবে অনেক ক্ষেত্রে লোভ, প্রলোভন ও প্রবঞ্চনার শিকার হয়েছে এই ধর্মান্তরিত জনগোষ্ঠী।

ইসলাম কিন্তু তার বিশ্বব্যাপী বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য এ পদ্ধতি অবলম্বন করেনি। যদি তাই করতো, তাহলে ভারতে সাড়ে ছয়শ বছরের মুসলিম শাসনের পরে এ উপমাহাদেশে কোনো অমুসলিম থাকার কথা নয়। কিন্তু বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিম এখানে রয়ে গেছে। মুসলিম শাসনামলের তুলনায় ইংরেজ শাসন আমলেই অমুসলিমরা ইসলাম গ্রহণ করেছে বেশী। এমনকি আমরা দেখি মুসলমানদের সাড়ে ছয়শ বছরের শাসনের পরও তাদের রাজধানী দিল্লী একটি বিপুল অমুসলিম প্রধান মহানগরী। কাজেই আজকের ভারতের কিছু হিন্দু সাম্প্রদায়িক দল যে কথা প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে, সেদেশের হিন্দুদেরকে মুসলিম শাসনামলে জোর করে মুসলমান করা হয়েছে, এর ভেতরে শতকরা একভাগও সত্য নেই। তাদের দাবী অনুযায়ী এই জোর করে ধর্মান্তরিত মুসলিমদেরকে প্রথমে তারা জোর করে হিন্দু করে নেবার প্রচেষ্টা চালায় কিন্তু তাতে সফল না হয়ে এখন ধনে-প্রাণে ধ্বংস করার কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে চলছে।

গত কয়েকশ বছরে বিশ্বব্যাপী খৃষ্টবাদের অগ্রগতি যেমন স্বাভাবিক পথে হয়নি, ঠিক তেমনি আজ ভারতে সাম্প্রদায়িক হিন্দুবাদের অভ্যুত্থানও স্বাভাবিক নয়। আর আসলে এর মধ্যে হিন্দুবাদের কিছুই নেই। ভারতে তারা যে আধুনিক রাষ্ট্র কায়েম করতে চায়, তার অর্থনীতি, রাজনীতি সবকিছু পাশ্চাত্য ধাঁচেই গড়ে উঠবে। কারণ সেখানকার শিক্ষকদের ছাত্র তারা। আর তাছাড়া তাদের ধর্মে এর কোনো বিধান নেই। তবে সামাজিক ক্ষেত্রে তারা যদি বর্ণাশ্রম ভিত্তিক কোনো সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়, তাহলে ভারতীয় সমাজে এ অতি সংখ্যালঘু ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়গণের এতে সফল হবার কোনো সম্ভাবনা তো নেই-ই বরং এটা যে তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে—এতে সন্দেহ নেই। দুশ বছর ইংরেজের ছত্রছায়ায় এককভাবে গড়ে উঠে এবং বিগত পঞ্চাশ বছর থেকে দেশের ক্ষমতার মসনদ দখল করে থাকার সুযোগ পেয়ে তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করার ক্ষমতা তারা হারিয়ে ফেলেছে। তারা এ জিনিসটা বুঝতেই অক্ষম হচ্ছে যে, ইসলামের মধ্যে

টিকে থাকার নিজস্ব শক্তি রয়েছে। গত আটশ বছর থেকে ইসলাম ও মুসলমান ভারতের উন্নতি ও সমৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। অন্যদিকে ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি, চতুর্দশ শতকে স্পেন থেকে মুসলমানদেরকে খেদিয়ে দেবার পর স্পেনের সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। মুসলিম আমলে সমগ্র ইউরোপে স্পেনের যে মর্যাদা ছিল, সে মর্যাদা আর তারা কোনো দিন ফিরে পায়নি। ভারতের এই বর্ণাশ্রমবাদী সাম্প্রদায়িক দলগুলোকেও এমনি ধরনের আত্মঘাতী কর্মোন্মাদনায় পেয়ে বসেছে।

মুসলিম মেয়েরা পূর্ণ অধিকার ভোগ করবে

মুসলিম সমাজে মেয়েরা পিছিয়ে পড়েছে, তাদেরকে এগিয়ে নিতে হবে। সারা দুনিয়ার প্রায় সব মুসলিম দেশে আজ এই একই কথা। এজন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েদের সুবিধা দেয়া হচ্ছে। চাকরী ক্ষেত্রে তাদের জন্য অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এভাবে জীবনের সব ক্ষেত্রে মেয়েদের এগিয়ে নেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। ফলে মুসলিম মেয়েরা ঘরের বাইরে বের হয়ে পড়েছে। কাজেই তাদের খোলামেলা ঘুরে বেড়াবার এবং মুসলিম নারীর স্বাভাবিক পরদা টিকে থাকার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

দুটি কারণে মেয়েদের বাইরে বের হবার প্রয়োজন দেখা দেয়। এক, মেয়েদের নিজেদের প্রয়োজনে। দুই, আর্থ-সামাজিক কারণে আয়-রোজগারের জন্য। দুটোর ধরন সম্পূর্ণ আলাদা এবং ক্ষেত্র আলাদা। আয়-রোজগার বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত এবং এর ক্ষেত্রগুলোও নির্দিষ্ট, অন্যদিকে প্রয়োজনের ক্ষেত্রগুলোও সীমাহীন নয়। যেমন শিক্ষা লাভ, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা-সাক্ষাত ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে পুরুষ ও মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য থেকেই যাচ্ছে। কারণ মেয়েদের প্রধান কর্মস্থল গৃহ, প্রয়োজনের খাতিরে তারা বাইরে আসছে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিচ্ছে। একথা মনে রাখতে হবে, মেয়েদেরকে যত বেশী বাইরে আনা হবে, গৃহের সংকট ততবেশী বাড়বে। একদিকে গৃহ-সংকট, অন্যদিকে বাইর সংকট। তাহলে তো মেয়েদেরকে বাইরে এনে সংকট কমাবার পরিবর্তে আরো বাড়ানো হচ্ছে। কাজেই অর্থোপার্জনে মেয়েদেরকে শামিল করার বিষয়ে অনেক ভেবে-চিন্তে পদক্ষেপ নিতে হবে। গৃহকে কেন্দ্র করে মেয়েদেরকে অর্থোপার্জনে শামিল করা যায় কিভাবে— সেদিকটা আগে ভেবে দেখতে হবে।

সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ইরিত্রিয়াসহ ৫৭টি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র। কিন্তু এদের স্বাধীনতা কোথায় ? প্রত্যেকটি বিষয়ে যখন এরা পাশ্চাত্যের হুবহু অনুসরণ করতে এবং তাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নীতি পুরোপুরি কার্যকর করতে যায়, তখন এদের স্বাধীনতা কোথায় থাকে ? আমাদের দেশে গৃহ একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। মেয়েরাই এ প্রতিষ্ঠানের পরিচালিকা। কোনো কারণে মেয়েদের যদি বাইরে যেতে হয়, তাহলে এ প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতি করে নয়। বরং এ প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পেই তারা বাইরে যাবে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তাদের জন্য কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা ঠিক সেভাবেই গ্রহণ করতে হবে। গৃহ প্রতিষ্ঠানের চার দেয়ালের মধ্যে মেয়েদেরকে বন্দী করে রাখার প্রশ্ন নেই। কিন্তু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তারা

বাইরে বের হলে তাদের জন্য ইসলামী শরীয়তের নিয়ম-নীতি রয়েছে। সে নিয়ম-নীতি মেনে চললে তবেই প্রমাণ হবে আমরা স্বাধীন, পাশ্চাত্যের গোলাম নই। ইসলামের সে নিয়ম-নীতি কি স্বাভাবিক জীবন যাপনের অনুকূল নয়? বরং স্বাভাবিক জীবন যাপনের সাথে সবচেয়ে বেশী সামঞ্জস্যশীল এবং সবচেয়ে বেশী প্রকৃতি সম্মত। গৃহের বাইরে বের হবার সময় মেয়েদের পোশাকের সীমানা নির্ধারণ করে কুরআনে বলা হচ্ছে ঃ

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ -

"আর তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ হয়ে যায়, তাছাড়া তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে এবং তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দিয়ে আবৃত করে ---।"–(সূরা আন নূর ঃ ৩১)

এখানে মূল বিষয় হলো বাইরে বের হবার সময় মেয়েদের আভরণ বা যীনাত প্রকাশ না করা। এই 'যীনাত' মূলত শারীরিক বা প্রকৃতিগত এবং একে আরো বাড়াবার জন্য কৃত্রিম সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্য চর্চা করা হয়। কাজেই বাইরে বের হবার সময় পাশ্চাত্যের গোলামী মুক্ত একজন স্বাধীন মুসলিম মেয়ে পুরুষদের মতো বা তাদের চেয়ে বেশী করে শরীরের অংগ-প্রত্যংগ অনাবৃত রাখতে পারে না। যে মেয়ে অনাবৃত রাখবে এবং যে পুরুষরা তাকে অনাবৃত রাখতে উদ্বুদ্ধ করবে, তারা উভয়েই প্রমাণ করবে যে, তারা এখনো পাশ্চাত্যের গোলামীমুক্ত হয়নি। আর এই 'যীনাত'–এর মধ্যে বাইরে চলাফেরা ও কাজকর্ম করার জন্য যা সাধারণভাবে খুলে যায় এবং যার উদ্দেশ্য যীনাত বা সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জা দেখিয়ে বেড়ানো নয়, তা সে খোলা রাখতে পারে। এর আওতায় হাত, পা, চোখ, নাক, মুখ আসতে পারে। এ কারণেই পুরুষ ও নারীর সতরের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। পুরুষের সতরের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত কিন্তু এর মোকাবিলায় নারীর সতর হচ্ছে মাথা থেকে পা পর্যন্ত।

অবশ্য মেয়েদের শরীর ঢাকার জন্য বোরকার ব্যাপক প্রচলন অনেক পরবর্তীকালের ঘটনা। মনে হয়, ইসলামী বিশ্বে যখন আর্থিক সচ্ছলতা প্রতিষ্ঠিত ও পাকাপোক্ত হয়ে যায় এবং মুসলিম মেয়েদের অর্থোপার্জনে শামিল হয়ে ব্যাপক হারে বাইরে যেতে হতো না, তখন মেয়েদের শরীর ঢাকার জন্য এ আবরণটির প্রচলন বেড়ে যায়। নয় তো কুরআনে "খুমুর" ও "জিলবাব" তথা এমন ধরনের ওড়না বা চাদরের কথা বলা হয়েছে—যার সাহায্যে মাথা, গ্রীবা, বুক ও পিঠ ঢাকা যায়। নবী (স), সাহাবা ও তাবেঈদের যুগে এরই প্রচলন ছিল।

মোটকথা আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, ইসলামী সমাজ পত্তনের প্রথম দিন থেকেই মেয়েরা নারীত্বের মর্যাদার মধ্যে অবস্থান করে পুরুষদের মতোই পুরোপুরি স্বাধীনতা ও সামাজিক অধিকার ভোগ করেছে। ইসলামী সমাজে কোন দিন মেয়েদেরকে পুরুষদের দাসী করা হয়নি। মুশরিক সমাজের মতো প্রতিদিন সকালে স্বামী দেবতার পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করে তবে তাদের গৃহ-কর্ম শুরু করতে হতো না এবং তাদেরকে শয়তানের চর হিসেবে চিহ্নিত করে অসূর্যম্পশ্যাও করা হয়নি। আমাদের সমাজে গত কয়েকশ বছরে নারী অধিকার হরণ ও নারীত্বের অবমাননার যে কসরত চলেছে, তা পুরোপুরি মুসলমানদের অবনতি, ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, মুসলমানদের ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং মুশরিকী সংস্কৃতির প্রভাবের ফলেই সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে আবার বিগত একশ বছর থেকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিনীতির স্রোত মুসলিম সমাজে বয়ে যাচ্ছে প্রবল বেগে। আমাদের রাষ্ট্রনায়ক, (রাষ্ট্র বিজ্ঞানী তো আমাদের নেই) পাশ্চাত্য দর্শনের চর্বিত চর্বণকারী আমাদের চিন্তাবিদ ও রাজনীতিবিদরা কোনো প্রকার চিন্তাভাবনা করার শ্রম স্বীকার না করে পাশ্চাত্য কায়দায় আমাদের মেয়েদেরকে ঘর থেকে বের করে আনার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

সবার আগে শুরু করেছেন এই শতকের গোড়ার দিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে তুরস্কের মোস্তফা কামাল পাশা। ইহুদী মায়ের কোলে তিনি লালিত। ইসলামী মূল্যবোধের তার কাছে এক কানাকড়িও মূল্য ছিল না। আরবদের বিরুদ্ধে আক্রোশের ভিত্তিতে তিনি তুর্কী জাতীয়তার আগুন জ্বালিয়ে তাতে পুড়িয়ে দগ্ধীভূত করলেন যাবতীয় ইসলামী মূল্যবোধকে। পূত-চরিত্রা মুসলিম তুর্কী নারীকে বের করে আনলেন অন্তপুর থেকে। তার মুখের নেকাব ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। তার শরীর থেকে বোরকা, চাদর, ওড়না ছিনিয়ে নিয়ে নিক্ষেপ করলেন আবর্জনার স্তুপে। মিনিস্কার্ট পরালেন। চুল ছেঁটে দিলেন। তিনি যাচ্ছেন ভেনিসের বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতায়। আক্রোশ, আবেগ ও প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে জনগণের ম্যাণ্ডেট না নিয়ে প্রায় এক ধরনের সামরিক কায়দায় যুদ্ধের পরে পরাজয়ের ডামাডোলের মধ্যে পরাজিত, পর্যুদস্ত, হতাশাগ্রস্ত জাতিকে সোনার হরিণ দেখাবার তথা নতুন জীবনের স্বাদ দেবার নামে এভাবে পূত-চরিত্রা মুসলিম ললনাকে ঘরের বাইরে অর্ধ উলঙ্গ করে দাঁড় করানো হয়। কই সত্তর বছর পরেও তো আমরা তুর্কী সমাজের তার অর্থনীতির ও স্বাধীনতাবোধের কোনো উন্নতি দেখছি না। বরং তুরস্ক আজ পাশ্চাত্যের একটা আশ্রিত দেশের পর্যায়েই নিজেকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

মোস্তফা কামাল পাশাকে হিরো বানিয়ে তারপর একের পর এক বিভিন্ন মুসলিম দেশে এ প্রচেষ্টা চলেছে। আমাদের এ দেশে পঞ্চাশের দশকের শেষের

দিকে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান তার সামরিক শাসনের ছত্রছায়ায় পাশ্চাত্য কায়দায় মেয়েদেরকে ঘর থেকে বের করে আনার চেষ্টার উদ্বোধন করেন। তিনি ছাত্রীদের জন্য আঁটসাঁট পোশাক বাধ্যতামূলক করেন। তাদের মাথা খালি রেখে ওড়নাটাকে দু' ভাঁজ করে একটা ফিতের আকারে বুক থেকে পিঠের দিকে এমনভাবে টেনে দেবার এবং কোমরে বেল্ট বাঁধার ব্যবস্থা করেন—যার ফলে শরীরের উঁচু-নীচু সমস্ত ভাঁজ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এভাবে উঠতি বয়সের কিশোরী মেয়েদের ইসলামী ভাবধারার বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও প্রয়োগ করে তার ভিত্তিতে নিরীক্ষা না চালিয়ে এই যে স্বাধীনতার নামে অন্যের দাসত্ব করার প্রবণতা, এটা গত সত্তর বছরেও তুরস্ককে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ দেয়নি এবং আমাদেরও দেবে না। আমাদের দাঁড়াতে হবে আমাদের আদর্শ, মতবাদ, ভাবধারা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং তারই ভিত্তিতে তৈরি করা ও তার সাথে সামঞ্জস্যশীল সুষম সমাজ কাঠামোর ওপর নির্ভর করে। অন্যদের থেকে যা গ্রহণযোগ্য তা আমরা গ্রহণ করবো কিন্তু তাদের গোলামী করবো না। অন্তত এতটুকু স্বাধীনতাবোধ তো আমাদের থাকা উচিত। আর সবচেয়ে লজ্জার ব্যাপার হচ্ছে, আজকে আমাদের নেতৃত্ব ও সমাজ চিন্তাবিদরা এমনই দেউলিয়া হয়ে পড়েছেন যে, পাশ্চাত্য সমাজ যেখানে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে, আমরা সেখানে প্রবেশ করছি মুখ থুবড়ে পড়ার জন্যই এবং যেখানে তারা ধ্বংসস্তুপের সৃষ্টি করেছে, আমরা সেখানে সেই ধ্বংসস্তুপের মধ্যে প্রবেশ করছি নিজেদের ধ্বংস ত্বরান্বিত করার জন্য। পাশ্চাত্যের সমাজ কাঠামো ও সামাজিক শৃংখলা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। সেখান থেকে আমাদের নেবার তেমন কিছু নেই।

বরং আধুনিক চাহিদার প্রেক্ষিতে আমাদের সমাজকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে হবে। নারী হচ্ছে সমাজের মধ্যমণি। যে সমাজ নারীকে সঠিক মর্যাদা দান করতে এবং তাকে তার প্রকৃত আসনে বসাতে পেরেছে ; সে সমাজ শান্তি, শৃংখলা ও সমৃদ্ধি লাভ করতে পেরেছে। আধুনিক যুগে ইসলামী মূল্যবোধই একমাত্র এ ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ কায়েম করার ক্ষমতা রাখে। বাকী সবই মরীচীকা। পাশ্চাত্যের নারী যেমন এ মরীচীকার পেছনে ছুটে আজ নিস্ব ও সর্বস্বান্ত হয়েছে, তেমনি মুসলিম নারীও তাদের অনুসরণ করে একদিন সর্বস্বান্ত হবে।

তাই মুসলিম মেয়েদের খোলামেলা ঘুরে বেড়াবার বা পরদানশীনা হবার ব্যাপারটি বড় নয় ; বড় হচ্ছে তাদের সমাজে মর্যাদার সাথে বসবাস করা। একমাত্র ইসলামী ভাবধারা, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যই তাদেরকে মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের গ্যারান্টি দেয়, পাশ্চাত্য ভাবধারা ও জীবনবোধ নয়।

রসূলুল্লাহর (স) সমাজ চেতনা

সামাজিক চেতনা ও বোধ মানুষের প্রকৃতিগত। দুনিয়ার প্রথম মানুষটি সৃষ্টির প্রথম দিনই নিজের মধ্যে যে অভাব বোধ করেছিলেন সেটি ছিল তার স্বাভাবিক সামাজিক বোধেরই তাগিদ। পুরুষের আকংখার সাথে একজন নারীর প্রেরণাই এ বোধকে পূর্ণতা দান করে। তাই দুজন নারী ও পুরুষের সমাজ দুনিয়ার প্রথম সমাজ। মানব সভ্যতার ইতিহাসে একথা প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই যে, একটি নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষ ইতিহাসের কোন এক বিস্মৃত অধ্যায়ে বনে-প্রান্তরে পাহাড়ে-পর্বতে বিচ্ছিন্নভাবে ঘুরে বেড়াতো তারপর একদিন তাদের মধ্যে সংঘ চেতনা জাগলো এবং সামাজিক বোধের উদয় হলো। বরং ইতিহাসের প্রথম দিকে মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ও দলেরই সন্ধান পাওয়া যায়। এই দল ও গোষ্ঠী সংঘ চেতনারই ফল। তাই প্রথম মানুষ আদম ও হাওয়া ছিলেন একটি দল, একটি গোষ্ঠী, একটি সংঘ, একটি সমাজ।

মানুষের এ প্রথম দলটির সাথে মহান আল্লাহ যে চুক্তি সম্পাদন করেন সেটিই মানব সভ্যতার ইতিহাসে চূড়ান্ত নীতি নির্ধারক শক্তি হিসেবে কাজ করে। কুরআন মজীদের সূরা আল বাকরার ৩৮ ও ৩৯ আয়াতে এ চুক্তিটি বিবৃত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ج فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُوْلٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○(البقرة : ٣٨ـ٣٩)

"কাজেই আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যখনই কোনো হেদায়াত ও পথনির্দেশনা যাবে, যারা তা মেনে নেবে এবং তার অনুসরণ করবে তাদের ভয় নেই, তাদের দুঃখ-কষ্টও পোহাতে হবে না। আর যারা আমার এ নির্দেশগুলো অস্বীকার করবে এবং মিথ্যা বলে তাকে প্রত্যাখ্যান করবে তারা চিরকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে।"–(বাকারা ঃ ৩৮-৩৯)

কাজেই প্রথম দুটি মানুষকে সামাজিক বিধান দান করেই আল্লাহ দুনিয়ায় পাঠান। তাদেরকে শুধু তাদের বুদ্ধিবৃত্তির ওপর নির্ভর করে ছেড়ে দেননি। যদি এ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হতো, তাহলে বুদ্ধিবৃত্তিকে ব্যবহার করে তারা হাজারো

পথে ছুটে বেড়াতো। জীবন ব্যাপী চলতো তাদের পরীক্ষা নিরিক্ষা। কিন্তু কোন্ পথে আদের কল্যাণ ও সাফল্য এবং কোন্ পথে সুন্দর, সুখী, সমৃদ্ধ, সমতাপূর্ণ সমাজ গঠন সম্ভব তা তারা কখনো নির্ণয় করতে পারতো না।

তাই মানুষের সামাজিক চেতনা যেমন প্রকৃতিগত অর্থাৎ সৃষ্টি লগ্নেই মানবিক উপাদানের মধ্যেই মহান আল্লাহ এ চেতনা শক্তি সঞ্চার করেছেন ঠিক তেমনি তার সমাজ গঠনের উপাদানও তিনিই সরবরাহ করেছেন। এজন্য তিনি হেদায়াত ও পথনির্দেশনা দিয়েছেন এবং তারই ভিত্তিতে দুনিয়ার বুকে প্রথম মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কালের আবর্তনে সমাজ গঠন ও সামাজিক শৃংখলা স্থাপনের ক্ষেত্রে মানুষ বিভিন্নভাবে আল্লাহর হেদায়াতকে বাদ দিয়ে শয়তানের প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হয়েছে। ফলে তার সমাজের উপরি কাঠামোর সাথে সাথে অবকাঠামোয়ও পরিবর্তন এসেছে। বিভিন্ন যুগে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে আল্লাহর নবীগণ আবার এ সমাজ কাঠামোকে আল্লাহর হেদায়াত অনুযায়ী সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন।

শেষ নবী মানবিক চেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে মানুষের কাছে আনেনে আল্লাহর হেদায়াত। তিনি ছিলেন শেষ নবী, কামিল ইনসান, পরিপূর্ণ মানব। মানবিক গুণাবলী তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। মানুষের সমাজ চেতনা তাঁর মধ্যে চূড়ান্তভাবে বিকশিত হয়েছিল। তাই তিনি যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা ছিল দুনিয়ার সর্বোত্তম ও সবচাইতে পূর্ণাংগ সমাজ। তাই নিজের সমাজ কাল সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ "সর্বোত্তম যুগ আমার যুগ। তারপর তার নিকটবর্তী যুগ। তারপর তার নিকটবর্তী যুগ।" অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের সমাজ পরিবেশ, তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সমাজ ব্যবস্থা মানবেতিহাসের সর্বোত্তম ও মানুষের তৈরী সবচেয়ে পূর্ণাংগ সমাজ কাঠামো ও সমাজ ব্যবস্থা।

মহানবীর জন্ম এমন এক দেশে হয় যেখানে শত শত বছর থেকে কোনো নবী আসেননি। আসমানী কিতাবের অনুসারী কিছু সংখ্যক ইহুদী ও খৃস্টানদের অবশি্য সেখানে বসবাস ছিল। তাছাড়া ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে আরবের আশেপাশের দেশগুলো ছাড়াও সেকালের দুনিয়ার সমুদ্র তীরবর্তী প্রায় সবগুলো দেশেই আরবদের যাতায়াত ছিল। কাজেই সমকালীন সভ্য জগতের সাথে তাদের পরিচয় ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল থেকে সরাসরি নবীর ছোঁয়াচ থেকে দূরে থাকার কারণে তাদের সমাজে জাহেলিয়াতের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল সবচেয়ে বেশী। এমন কি সত্য ও ন্যায়ের চেহারা সমাজে অস্পষ্টতর হতে চলে

গিয়েছিল। রসূল (স) নিজে এবং আবু বকরের মতো হাতে গোনা কয়েকজন লোক ছাড়া সরাসরি সত্য ও ন্যায়ের পক্ষপাতি কোনো লোকই ছিল না সে সমাজে। তাই নবুওয়াতের দাওয়াত দেবার পর এ সমাজ পুনরনির্মাণের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করলেন যা ছিল সবচেয়ে বেশী বিজ্ঞানসম্মত এবং যে কোনো দেশের মানব গোষ্ঠীর জন্য সবচেয়ে বেশী গ্রহণীয়। তিনি কুফরী ও জাহেলী সমাজটাকে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে তার জায়গায় আর একটি সম্পূর্ণ নতুন সমাজ গড়ে তোলেননি। কারণ নবীদের প্রতিষ্ঠিত সমাজের অনেক না হলেও বেশ কিছু গুণাবলী এ সমাজেও ছিল এবং বেশ কিছু গুণাবলীকে ভিন্ন রঙে রঞ্জিত করা হয়েছিল। তাই তিনি সমাজ পরিবর্তনের জন্য তিনটি মূলনীতি গ্রহণ করলেন। আর দুনিয়ার যে কোনো দেশের জাহেলী ও অনৈসলামী সমাজকে ইসলামী সমাজে রূপান্তরিত করার জন্য এই তিনটি মূলনীতিই গ্রহণীয়।

এক ঃ জাহেলী সামাজের যেসব বিষয় ইসলামী চিন্তা ও ভাবধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল এবং যেগুলোর মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন সাধন করে ইসলামী সমাজ পরিবেশে পুনঃস্থাপন সম্ভব ছিল না সেগুলোকে তিনি সম্পূর্ণ খতম ও বিনষ্ট করে দিলেন।

দুই ঃ যেসব বিষয় ইসলামী ভাবধারার পরিপন্থী হলেও মূলগত পরিবর্তনের মাধ্যমে যেগুলোকে ইসলামী সমাজে পুনঃসংযোজন সম্ভব ছিল সেগুলোকে তিনি ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে সংশোধিত ও পরিবর্তিত করে নিলেন।

তিন ঃ যেসব বিষয়ের সাথে ইসলামী ভাবধারা ও মূলনীতির কোনো বিরোধ ছিল না সেগুলোকে তিনি যথারীতি ইসলামী সমাজে প্রতিষ্ঠিত রাখলেন।

ইসলামী সমাজ কাঠামো বিনির্মাণের জন্য তিনি যে প্রথম ও কেন্দ্রীয় মূলনীতিটি প্রতিষ্ঠিত করলেন সেটি হলো ঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ।' সমাজের সকল বিষয়ের নিয়ন্তা হবেন একমাত্র আল্লাহ। সমাজ কাঠামোয় আল্লাহকে একমাত্র প্রভু ও সর্বময় ক্ষমতা সম্পন্ন একমাত্র শক্তি হিসেবে মেনে নিতে হবে। সমাজ কাঠামোয় এমন কোনো বিষয় স্থান লাভ করতে পারবে না, যেখানে আল্লাহ ছাড়া আর কারোর কাছে মাথানত করতে হয়। উপাসনা-আরাধনা ইবাদাত-বন্দেগীর যতগুলো বিষয় রয়েছে সেগুলোর কোথাও আল্লাহ ছাড়া আর কারোর সামনে হৃদয়ের অর্ঘ নিবেদন করা যাবে না। আর এসব বিষয়ের দৃষ্টান্ত হবেন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম। তিনি এসব বিষয়ে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তার বিপরীত কোনো পথ অবলম্বন করা যাবে না।

ইসলামী সমাজ কাঠামোর দ্বিতীয় যে মূলনীতিটির ওপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছেন সেটি হচ্ছে ঃ আমর বিন মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার। ভালো ও মন্দ কাজ সমাজে পরিচিত। এছাড়াও ইসলাম নিজেই ভালো ও মন্দ কাজের একটি মানদণ্ড দিয়েছে। এই মানদণ্ড অনুযায়ী সমাজে পরিচিত ভালো কাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা, এটি ইসলামী সমাজ কাঠামোর এমন একটি মূলনীতি যার মাধ্যমে ইসলামী সমাজ যাবতীয় খারাপ ও ক্ষতিকর বিষয় থেকে সংরক্ষিত থাকবে এবং তার মধ্যে সত্য, ন্যায় ও অন্যান্য সদগুণাবলী লালিত হতে থাকবে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থায় তৃতীয় যে মূলনীতিটির ওপর জোর দিয়েছেন সেটি হচ্ছে, "আদল" ও ভারসাম্যপূর্ণ নীতিবোধ প্রতিষ্ঠা করা সমাজের সর্বক্ষেত্রে। সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে বড় ছোট, সবল-দুর্বল, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও কম মর্যাদা সম্পন্নের কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপায় উপকরণ এবং সামাজিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবহার সবাই সমানভাবে করতে পারবে। সমাজের সকল পর্যায়ে যথার্থ সাম্য, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত থাকবে। জুলুম ও শোষণের কোনো অবকাশই কোনো ক্ষেত্রে থাকবে না।

রসূলদের দায়িত্ব শুধুমাত্র নীতিকথার প্রচার নয় বরং নিজেকে সমাজের একজন সদস্য হিসেবে পেশ করে সমাজে এ নীতিগুলোর পূর্ণ বাস্তবায়ন। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নীতিগুলোর ভিত্তিতে একটি পূর্ণাংগ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন।

বাংলাদেশে ইসলামী সমাজ গঠন ও আজকের চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশের বৃহত্তম অংশ গংগা-যমুনা-মেঘনার বদ্বীপ হবার কারণে অতি প্রাচীন ভূখণ্ড নয়। তবে উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বের পার্বত্য এলাকায় প্রাক ঐতিহাসিক যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে। বিশেষ করে কুমিল্লার ময়নামতিতে পাঁচ থেকে ছয় হাজার বছর পূর্বে যে সুসভ্য জাতি বাস করতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তাছাড়া মানুষ কোনো দিন অসভ্য ছিল না। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে মানুষ একটি সভ্য জীব। হতে পারে পরবর্তীকালে সভ্যতার ক্রমবিকাশের মাধ্যমে সে আরো সুসভ্য হয়েছে। প্রথম দিন থেকেই সভ্যতার সমস্ত মৌল উপাদান তার কাছে ছিল। তারপর সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। মানুষের সভ্যতা মানুষের আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম রুচি ও বৃত্তির সাথে জড়িত। আর এ রুচি ও বৃত্তির প্রথম দিন থেকেই মানুষের মধ্যে কোনো ঘাটতি দেখা যায়নি। কাজেই বাংলাদেশে পাঁচ ছয় হাজার বছর আগে যে জাতির বাস ছিল তারা যে সভ্য ছিল এতে সন্দেহ নেই। এ সভ্যতার বিচার করা হয় জীবন যাপনের উপকরণগুলোর দৃষ্টিতে। কোন্ যুগে মানুষ কি রকম উপকরণ ব্যবহার করেছে। কোন্ যুগে মানুষ পাথরের তৈরী হাতিয়ার ও জীবন উপকরণ ব্যবহার করতো। কোন্ যুগে সে ব্যবহার করতো ব্রোঞ্জ ও লৌহের তৈরী জীবন উপকরণ। তারপর কোন্ যুগে ধাতব দ্রব্য ব্যবহার করতে শিখলো এবং এরপর প্রাচীন থেকে মধ্য এবং মধ্য থেকে একেবারে আধুনিক যুগে প্রবেশ করলো। কিন্তু এভাবে জীবন উপকরণের উন্নয়নের দৃষ্টিতে যদি সভ্যতার বিচার করা হয় তাহলে সুদূর ভবিষ্যতের বিচারে আজকের এই আধুনিক যুগকে হয়তো তখন প্রাচীন যুগ বলতে হবে। কারণ দশ হাজার বিশ হাজার বছর পরের পৃথিবীর মানুষের কাছে আজকের জীবন উপকরণ সত্যিই অতি প্রাচীন বলে বিবেচিত হবে।

কাজেই জীবন উপকরণ নয়, জীবন উপকরণগুলো ব্যবহার করার পেছনে যে বৃত্তি ও রুচি কাজ করে সেটিই হচ্ছে এ সভ্যতার আসল নিয়ামক শক্তি। এই বৃত্তি ও রুচি সবসময় মানুষের মধ্যে আছে এবং থাকবে। পরিবেশ ও পরিস্থিতি এর মধ্যে সূক্ষ্মতা ও স্থূলতার তারতম্য ঘটায় মাত্র। মানুষ দু হাজার বছর আগে যেভাবে পৃথিবীকে দেখে এসেছে আজো সেইভাবে দেখছে। তখনো যেমন দেখার দশটা চোখ দশ রকম ছিল আজো ঠিক তেমনি দেখার দশ রকম চোখ আছে। আগামীতেও এমনটিই থাকবে। এর মধ্যে পরিবর্তন হওয়া মানে

মানুষের মানবিক বৃত্তিরই বিনাশ ঘটা। তাহলে সে হয় নেমে এসে হবে পশু আর নয়তো উপরে উঠে হবে ফেরেশতা। আর এ দুটির কোনোটিই সে হবে না। মানুষ মানুষই। সে পশুও নয়। ফেরেশতাও নয়। কোনো দিন ছিল না এবং হবেও না। হ্যাঁ, কিছু মানুষ আছে যাদের মধ্যে পাশবিক-সম বৃত্তির প্রকাশ ঘটে। কুরআনে এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ "তারা পশুর মতো (পশু নয়) বরং তার চেয়েও খারাপ।" আবার মানুষ যে কখনো ফেরেশতা হতে পারে না তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কয়েকজন সাহাবাকে বলেছিলেন। তাঁরা তাঁর কাছে এই মর্মে অনুযোগ করেছিলেন যে, তাঁর দরবারে থাকার সময় তাঁর কাছে জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা যখন তাঁরা শোনেন, দুনিয়ার সম্পদরাশি-সুখ-ঐশ্বর্য তাঁদের কাছে তুচ্ছ মনে হতে থাকে কিন্তু গৃহ পরিবেশে ফিরে সংসারের ঝামেলার মধ্যে পড়ে সেগুলোর কথা তাদের মনে থাকে না। তখন দুনিয়ার সুখ-সম্পদ তাদের কাছে সবকিছু মনে হতে থাকে। কাজেই তারা মুনাফিক হয়ে গেছেন। অর্থাৎ কথায় ও কর্মে তাদের আচরণ হয়ে গেছে বিভিন্ন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের একথা শুনে একে মোটেই অস্বাভাবিক বললেন না বরং বললেন এটাই স্বাভাবিক। আরো বললেন ঃ আমার এখানে তোমাদের মানসিক অবস্থা যেমন থাকে গৃহ পরিবেশে গিয়েও যদি তেমনটি থাকতো তাহলে ফেরেশতারা তোমাদের সাথে করমর্দন করতো। অর্থাৎ তোমরা ফেরেশতাদের দলভুক্ত হয়ে যেতে।

কিন্তু মানুষ কোনদিন ফেরেশতা হয়নি। পশুও হয়নি। মানুষ মানুষই রয়ে গেছে। মানুষ কোনদিন অসভ্য ছিল না। তবে হয়তো আপেক্ষিক অর্থে সুসভ্য ছিল না। এই অর্থে বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতা সভ্য মানুষের সভ্যতাই ছিল, অসভ্যদের সভ্যতা ছিল না। কাজেই প্রাচীন বংগ সমতট গৌড় অঞ্চলে মানুষের যে সমাজ গড়ে উঠেছিল সেটা ছিল সভ্য মানুষের সমাজ। ইসলামের আগমনের পূর্বে দুনিয়ার অন্যান্য দেশের মতো এ দেশের এ সমাজেও ছিল পুরোপুরি শিরকের রাজত্ব। এই শিরকের মধ্যে ছিল জৈনবাদ, বৌদ্ধবাদ, আর্য হিন্দুবাদ ও স্থানীয় পৌত্তলিকতার সংমিশ্রণ। তওহীদের প্রভাব যে এ সমাজে ছিল না তা অবশ্যই বলা যাবে না। কারণ এ সমাজে তওহীদের প্রভাব না থাকলে এত দ্রুত ও ব্যাপক হারে ইসলামকে গ্রহণ করার সামর্থ তার হতো না। তাছাড়া বৈদিক মুশরিকী ধর্মের বিরুদ্ধে আহ্বানকারী জৈন ও বৌদ্ধবাদের আহ্বানেও তারা সবচেয়ে বেশী সাড়া দিয়েছে। বৌদ্ধ চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙও সে সাক্ষ পেশ করেছেন। কাজেই তওহীদের প্রভাব এ এলাকায় যথেষ্ট ছিল এতে সন্দেহ নেই।

হিমালয়ান উপমহাদেশের এ এলাকায় ইসলামের আগমন হয় সমুদ্র পথে বঙ্গোপসাগরের উপকূল দিয়ে। এ পথে ইসলাম দেশের বেশী অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেনি। সমুদ্র উপকূল এলাকায় এবং নদী পথে সহজে যতদূর প্রবেশ করা যায় অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বন্দর সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে ইসলামের দাওয়াত ও প্রভাব বিস্তার লাভ করে দু তিনশ বছর ধরে। বিশেষ করে এ সময় সন্দ্বীপ ও চট্টগ্রাম এলাকায় পৃথক মুসলিম উপনিবেশ গঠনের প্রমাণ পাওয়া যায়। ঈসায়ী দ্বাদশ শতক থেকে স্থল পথে ইসলামের আগমন হয়। এ সময় সুফীদের মাধ্যমে বাংলার সমস্ত এলাকায় ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তী পর্যায়ে তেরো শতক থেকে সূচনা হয় মুসলিম শাসনের। সমগ্র উপমহাদেশে ইসলামের ইতিহাসে উত্তর পশ্চিম এলাকার বিশিষ্টতা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু উত্তর ভারতের বিশাল এলাকা অতিক্রম করে বাংলার আদিবাসীদের এত বিপুল সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ কোনো সাধারণ ব্যাপার ছিল না। এ বিপুল সংখ্যক নওমুসলিমদের ইসলামী প্রশিক্ষণ দান করার ব্যাপারটিও ছিল অত্যন্ত জটিল ও দুরূহ। একজন সুফী ইসলাম প্রচারকের হাতে হাজার হাজার গ্রামবাসী ইসলাম গ্রহণ করেছে। কাজেই তাদের প্রত্যেককে হাতে কলমে ইসলামী জীবনধারার প্রশিক্ষণ দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। শিক্ষার দুটি ক্ষেত্রই সেকালে সক্রিয় ছিল। একটি ছিল মাদ্রাসা। আরবী ও ফারসী কিতাব পত্রের মাধ্যমে সেখানে ইসলামের শিক্ষাদান করা হতো। এটা ছিল দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা। সাধারণভাবে কম বয়সের শিক্ষার্থীরা এখানে প্রবেশ করতো। তারা হতো সীমিত সংখ্যক। শত শত হাজার হাজার বয়স্ক নওমুসলিমদের প্রশিক্ষণের কেন্দ্র ছিল সুফীর খানকাহ ও দরবার। এটি ছিল শিক্ষার দ্বিতীয় ক্ষেত্র। এখানে ওয়াজ নসিহত এবং সুফী ও তার শাগরিদ বৃন্দের ব্যক্তিগত ইবাদত বন্দেগী, আচার-আচরণ, ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, লেন-দেন ইত্যাদির মাধ্যমে তারা যতটুকু ইসলামী জীবন ধারার প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারতো তাতেই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হতো। সাধারণ মানুষ কঠিন জীবন সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। প্রতিদিনকার অন্ন সংস্থানের জন্য তাদের প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হতো। ইসলামী জীবন ধারার প্রশিক্ষণ লাভ করার মতো পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগ তাদের ছিল না। কিছু পীর, দরবেশ, আলেম, উলামা, সুফী গ্রামে গঞ্জে মাঝে মধ্যে সফর করে ওয়াজ-নসিতহ করে আসতেন। বাংলাদেশে গ্রামে গঞ্জে এ রেওয়াজটা আজো রয়ে গেছে এবং এজন্য গ্রামে গঞ্জে এখনো আলেম উলামার কদর রয়ে গেছে, যদিও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তা আগের অবস্থায় নেই।

শ্রেণী ভেদ প্রথা

কাজেই সাধারণ নওমুসলিমরা যে মুশরিকী সমাজ থেকে বের হয়ে আসতো, সেখানকার যেসব আচার আচরণে তারা চৌদ্দ পুরুষ থেকে অভ্যস্ত

ছিল তার অনেকগুলোই ইসলাম গ্রহণের পরও নিজেদের অজান্তেই লালন করতে থাকে। শ্রেণী ভেদ ছিল একটি মুশরিকী প্রথা। আর্যরা উপমহাদেশে এসে কয়েক হাজার বছর পূর্বে এ প্রথার প্রচলন করে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করে। একদল মানুষকে করে মর্যাদাশালী এবং অন্যদলকে করে তাদের দাস। একদল অন্যদলের পদধূলি নিতো। তারা তাদেরকে মনে করতো ভগবানের সাক্ষাত প্রতিনিধি। এ দেশে বৌদ্ধদের সমাজ ব্যবস্থা ছিল এ প্রথার বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে বৌদ্ধরা এ শ্রেণীভেদের কাছে নতি স্বীকার করে। ইসলাম এর মূলে কুঠারাঘাত করে। ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের মূল্যবোধে আকৃষ্ট হয়েই এদেশের মানুষ ব্যাপক হারে ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু শ্রেণীভেদের মুশরিকী প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ইসলামের সাম্যের বাণী ও নীতিতে দীক্ষিত হলেও ধীরে ধীরে বাংলার মুসলিম সমাজে এ প্রথার প্রেতাত্মা জেগে উঠতে থাকে। সৈয়দ, মীর, মিঞা ইত্যাদির একটা উচ্চ শ্রেণী মুসলমানদের মধ্যে দানা বেধে ওঠে। তাঁতি জেলে ইত্যাদি একদল কায়িক পরিশ্রমকারী মুসলমানকে তারা নিম্ন শ্রেণীর অন্তরভুক্ত করে। তাদের সাথে বিয়েশাদী ইত্যাদি আত্মীয়তা ও সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করাকে অমর্যাদাকর মনে করতে থাকে। এভাবে যেন শ্রেণীভেদের মুশরিকী প্রথাকেই উৎসাহিত করা হতে থাকে।

গুরুবাদ পীরবাদ

বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী মুশরিকী সমাজে ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু, যাজক ইত্যাদি একটি ধর্মীয় শ্রেণী গড়ে উঠেছে। ধর্মকর্ম তাঁরাই পরিচালনা করেন। তাঁরাই ধর্মগুরু। ইসলামে এই ধরনের কোনো গুরুবাদ বা ধর্মীয় শ্রেণীর অস্তিত্ব নেই। জ্ঞানকে বলা হয় ইলম এবং যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে তাকে বলা হয় আলেম। আর এই জ্ঞান অর্জন করা নারী-পুরুষ সকল মুসলমানের জন্য ফরয করে দেয়া হয়েছে। কাজেই জ্ঞান অর্জনকারী প্রত্যেক মুসলমানই একজন আলেম। হাদীসে اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ 'আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী' বলা হলেও ইসলামে আলেমদের কোনো পৃথক শ্রেণী সৃষ্টি করা হয়নি। বরং সত্যিকার জ্ঞানী, মুখলিস ও বিশেষজ্ঞ আলেমগণকে নবীদের ও নবুওয়াতের দায়িত্ব সম্পাদনের যোগ্যতা সম্পন্ন হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। কুরআনে اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ অর্থাৎ 'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলেমগণই তাঁকে যথার্থ ভয় করেন'—একথার মধ্যে এ বক্তব্য আরো সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ এখানে নিশ্চয়ই একথা বলা হয়নি যে, মুসলমানদের মধ্যে আলেম নামক একটি শ্রেণী আছে, একমাত্র তারাই আল্লাহকে ভয় করে। বরং এখানে মূল বক্তব্য হচ্ছে ঃ আল্লাহকে ভয় করার জন্য প্রকৃত

জ্ঞানের প্রয়োজন এবং যাঁরা এ প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করেন সেই আলেমগণ আল্লাহর শক্তি যথার্থ উপলব্ধি করতে এবং এরি ভিত্তিতে তাঁকে প্রকৃত ভয় করতে পারেন।

সূফী ও আলেমদের যে মর্যাদা আমাদের সমাজে প্রথম দিন থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এসেছে তার ভিত্তি ছিল প্রকৃত জ্ঞান ও তাকওয়া। আর এই তাকওয়া কোনো স্থূল দৃশ্য বিষয় নয়। লেবাস-পোশাক, চলন-বলন ও বাহ্যিক কাটছাঁট বা আচরণের সাথে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। আল্লাহতে উৎসর্গীত ও আল্লাহকে প্রকৃত ভয়, এই ছিল এর ভেতরের চেহারা। সত্যের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ঘটেছিল এর আসল চারিত্রিক বিকাশ। দিনের পর দিন বলিষ্ঠ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একজন আলেম ও মুত্তাকী মুসলিম সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। কোনোদিন অন্যায় ও অসত্যের কাছে তিনি মাথা নত করেননি, তা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক, ছোট ও বড় যে কোনো অন্যায় হোক। তিনি মুসলিম সমাজে কোনো ব্যবসাপত্রও খুলে বসেননি। বরং ইসলাম ও মুসলমানের স্বার্থে এবং আল্লাহর হুকুমের তাবেদারী করার মাধ্যমে তিনি নিজেকে পুরোপুরি উৎসর্গ ও উজাড় করে দিয়েছেন। আমাদের সমাজের আজকের পীরবাদ ও পীর পূজা এবং এক শ্রেণীর স্বার্থশিকারী ও অন্যায়ের কাছে মাথা বিকিয়ে বসা তথাকথিত আলেমদের সাথে তার কোনো সম্পর্কই নেই। বরং আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশে রাষ্ট্র পরিচালকদের জন্য ফরয হয়ে গেছে প্রত্যেকটি মুসলমানকে ইসলামের মৌলিক জ্ঞান দান করা। এখানে পীর পূজার কোনো অবকাশ নেই।

সমাজে নারীর অবস্থান

বাংলার মুসলিম সমাজ প্রথম দিন থেকে সঠিকভাবে নারীর অবস্থান নির্ণয় করেছে। পার্শ্ববর্তী মুশরিক সমাজে নারীর কোনো মানবিক ও সমাজিক মূল্য ছিল না। একদিকে নারী ছিল পুরুষের দাসী। কেবলমাত্র পুরুষের অধীনে থেকে তার সেবা করার জন্যই তার জন্ম। বিয়ের পূর্বে পিতার অধীন, বিয়ের পরে স্বামীর অধীন এবং স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তানের অধীন—এ তার সারা জীবনের চালচিত্র। এ চিত্ররেখাকে আরো সুগভীর করার জন্য উঁচু সমাজের নারীকে করা হয়েছিল অসূর্যম্পশ্যা। অর্থাৎ নারী পুরবন্দিনী। উঁচু সমাজের নারীর গৃহের চার দেয়ালের বাইরে আসার অধিকার ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "আমার ছেলেবেলা" বইয়ে এর একটি চমৎকার চিত্র এঁকেছেন। তিনি লিখেছেন তাঁর মা, ঠাকুরমা, দিদিমারা যখন গংগায় স্নান করতে যেতেন, তাঁদের জন্য ডুলি বেহারারা বাড়ির মধ্যে ডুলি এনে বসিয়ে দিয়ে যেতো।

বেহারারা বাইরে বের হয়ে গেলে দাসীরা এসে ডুলির চারদিকে কাপড় দিয়ে ঘেরা দিতো। গংগা স্নানার্থিনীরা তার মধ্যে প্রবেশ করতেন। ডুলি বেহারাদের ডাকা হতো। তারা তা বহন করে গংগার ঘাটে নিয়ে যেতো এবং ডুলি শুদ্ধ গংগার জলে চোবানি দিতো। মেয়েরা কাপড় ঘেরা ডুলির মধ্যে বসেই গংগা স্নান করতেন। তারপর সেই সিক্ত ঘেরাটোপের মধ্যে বসে ডুলি বেহারাদের কাঁধে চড়ে তারা গৃহে ফিরতেন। আল্লাহর দুনিয়ার চেহারার ছিটেফোঁটা তারা দেখতে পেতেন না।

অন্যদিকে নারীর ছিল না কোনো সামাজিক অধিকার। পিতার বা স্বামীর সম্পত্তিতে তাদের কোনো অংশ ছিল না। অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে তাদের উদরে যে পুত্র সন্তান জন্মাতো সে জন্ম সূত্রেই সম্পত্তির অধিকারী হতো। নারীর প্রতি ছিল এটা চরম বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা। এ নিগ্রহ ও শোষণ মেনে নিয়েছিল সে যুগের মুশরিক সমাজের মেয়েরা। পাশাপাশি মুসলিম সমাজের মেয়েরা ছিল স্বামীর পার্শ্বচরী। তারা সংসার পরিচালনা করতো আবার স্বামীর, পিতার ও সন্তানের বিভিন্ন কাজেও তাদেরকে সাহায্য করতো। তারা স্বামীর ও পিতার সম্পত্তির মালিকানাও লাভ করতো। নিজস্ব ব্যবসা বাণিজ্যও পরিচালনা করতো। পুরুষের মতো তারা খোলামেলা ইচ্ছামতো যেখানে সেখানে ঘোরাফেরা করতো না ঠিকই কিন্তু ইসলামী পরদা ও শালীনতা সহকারে প্রয়োজনে বাইরে বের হবার অধিকার তাদের ছিল।

তবে ধীরে ধীরে মুশরিক সমাজের প্রভাবে মুসলিম মেয়েরাও গৃহ অংগনের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়ে। তারাও পিতা, স্বামী, সন্তানের অধীনস্ত হয়ে শিক্ষা দীক্ষা বর্জিত এবং অনুন্নত জীবনের অধিকারী হয়। গৃহের বাইরে বের হবার অধিকার তারাও হারিয়ে ফেলে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবা-তাবেঈদের যুগে তাদের মসজিদে গিয়ে ইবাদত করার ও জ্ঞানালোচনা শোনার যে সুযোগ ছিল তা হারিয়ে ফেলার পর তাদের দীনী জীবন স্বাভাবিকভাবেই হীনপ্রভ হয়ে পড়ে। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্টই বলেছেন ঃ لاتمنعوا ايماء الله مساجد الله 'আল্লাহর দাসীদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিয়ো না।' এই সংগে তাদের অশিক্ষা ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে মীরাসী আইনও বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে প্রযুক্ত হয়নি। ফলে তারা সমাজের এক নিগৃহীত ও বঞ্চিত শ্রেণীতে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসন ও পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার প্রভাবে হিন্দু সমাজের মেয়েদের মধ্যে বিদ্রোহাত্মক সমাজ সচেতনতা দেখা দেয় এবং তারা সমাজের সমস্ত বাঁধন ছিন্ন করে সম্পূর্ণ বাইরে চলে আসে। পুরুষদের

সাথে মোকাবিলা করে একেবারে পাশ্চাত্য কায়দায় সমাজে স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। প্রাচ্যের নারীত্ব বিসর্জন দিয়ে পাশ্চাত্য রীতিতে নারীত্বের পুচ্ছে পৌরুষের পালক লাগিয়ে পুরুষের সাথে অসম মোকাবিলায় নেমে পড়ে। ঠিক তেমনি বাংলাদেশের মুসলিম মেয়েরাও নিজেদেরকে নির্যাতিত ও বঞ্চিত দেখে মুশরিক নারী সমাজের পুরোপুরি অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়েছে। ইসলাম তাদেরকে কি অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে সেদিকে তারা দৃকপাত করছে না। অন্যদিকে পাশ্চাত্য অধিকারের নামে তাদের কি হরণ করে নিচ্ছে তা একবার ঠাণ্ডামাথায় ভেবে দেখার কথা চিন্তা করছে না। এভাবে তারা বাংলার মুসলিম সমাজে এক চরম বিশৃংখলা ও নৈরাজ্যের জন্ম দিয়ে চলছে।

একটি অন্তহীন সমস্যা

বাংলাদেশের আজকের মুসলিম সমাজের এটা একটা অন্তহীন সমস্যা। গভীর দৃষ্টিতে সমস্যাটি পর্যালোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। নারী নির্যাতন, নারী নিগ্রহ, নারী বঞ্চনা, নারীর অধিকার হরণ, নারীকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখা, আর্থিক দিক দিয়ে নারীকে অসহায় করে রাখা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্ন আজ মেয়েদের পক্ষ থেকে তোলা হচ্ছে। এর কোনটাই অসত্য নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এসব কি ইসলামী সামাজিকতা ও ইসলামী সমাজ বিধানের সৃষ্টি ? এদেশে কি ইসলামী সমাজব্যবস্থা ও ইসলামের সামাজিক বিধান প্রতিষ্ঠিত ছিল ? আমরা যদি বৃটিশ আমলের পূর্বে মোগল-পাঠান আমলের এদেশীয় সমাজ ব্যবস্থার দিকে ফিরে যাই তাহলে সেখানেও এ বঞ্চনা ও নিগ্রহের একটা অস্পষ্ট ছবি হলেও দেখতে পাবো। কিন্তু সেটা প্রবল না হওয়ার কারণ মুসলিম শাসনে আর্থিক সচ্ছলতা ও সার্বিক নিরপত্তা। রসূল (স) সাহাবা ও তাবেঈদের যুগে মুসলিম মেয়েরা ইসলামী সমাজের যে পর্যায়ের মহিমান্বিতা সদস্যা ছিলেন, যে ধরনের পূর্ণ সামাজিক অধিকার ও নিরাপত্তা ভোগ করতেন, হাদীস গ্রন্থগুলো পড়লে তাঁদের যে গৌরবদীপ্ত মহিমা ভেসে ওঠে, আমাদের এদেশের তেরো থেকে আঠারো শতকের সমাজে তার কতটুকু বিরাজিত ছিল ? হয়তো তুচ্ছ এক ভগ্নাংশ হবে। যাহোক শুধু নারী অধিকারের দিক থেকে নয় বহু দিক থেকেই এ সমাজ বঞ্চিত ছিল। সে সময় ছিল ব্যক্তি শাসন। ইসলামের আইনের উপরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তি শাসনের প্রাধান্য ছিল। তার উপর ছিল ইসলামী আইনের গতিশীল ধারা ইজতিহাদ বিমুখতা। রাজ দরবারে এবং অন্যান্য অনেক পর্যায়ে অসৎ আলেমদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সৎ আলেমগণ তাদের অপকর্মের বিরুদ্ধে সর্বক্ষণ জিহাদে লিপ্ত থাকতেন। এ অবস্থার শেষ পর্যায়ে এক বিশৃংখল পরিবেশে হয় বৃটিশ শাসনের সূচনা। তারা রোমান আইন

ও বৃটিশ আইনের প্রবর্তন করে ইসলামী শরীয়তের যতটুকু কল্যাণকারিতা অবশিষ্ট ছিল তারও বিলোপ সাধন করলো।

ইংরেজের দুশো বছরের শাসনকালের একশো বছর বাংলার মুসলমানরা করেছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই। ফকির বিদ্রোহ, তীতুমীরের জিহাদ, হাজী শরীয়তুল্লাহ ও দুদু মিয়ার ফারায়েযী আন্দোলন এবং হিন্দু-ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা, মোমেনশাহী, বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা, যশোর, রাজশাহী, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর তথা সারা বাংলার মুসলমানরা জড়িত হয়ে পড়েছিল। ফলে তখন মুসলিম সমাজে ছিল অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা, অস্থিরতা ও হতাশা। পাশাপাশি হিন্দু সমাজ ইংরেজদের সংস্পর্শে ও তাবেদারিতে নতুন প্রাণাবেগে উচ্ছসিত হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্যের সামাজিক মূল্যবোধের সাথে তাদের তেমন কোনো মৌল বিরোধ ছিল না, "আল কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদাহ"—সমস্ত অবিশ্বাসী ও মুশরিকী সমাজ একই মিল্লাত ও সামাজিকতার অন্তর্ভুক্ত—রসূলের এ বাণীর প্রেক্ষিতে বিচার করলে বরং বলা যায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন এদেশীয় হিন্দু সমাজ পাশ্চাত্যের সংস্কারমুক্ত মুশরিক সমাজের সংস্পর্শে এসে লাভবান হয়। হিন্দু সমাজের মেয়েরা হাজার বছর পরে অধিকার সচেতন হয়ে বন্দীত্বের সমস্ত বাঁধন ছিন্ন করে মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করে। একশো বছরের লড়াইয়ে পরাজিত, ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে মুসলমানরা ইংরেজের শাসন মেনে নেয়। ১৮৫৭ এর পরে মুসলমানদের তেজ ধীরে ধীরে কমে আসতে থাকে। তাদের একদল ইংরেজ তোষণ ও অন্যদল বয়কটের মাধ্যমে শিক্ষার ক্ষেত্রে আলীগড় ও দেওবন্দের দুটি ধারার সৃষ্টি করে। সাধারণ মুসলমানরা ইংরেজ ও হিন্দুর দ্বিপাক্ষিক শোষণ ও নির্যাতনে চরম দারিদ্রের শিকার হয়। কিছু কালের মধ্যেই মুসলমান বলতে বুঝা যেতে থাকে দু-চার বিঘা জমি জিরাতির মালিক বা ভূমিহীন কৃষক।

এহেন আর্থিক অবস্থায় মুসলিম মেয়েরা কোন্ ধরনের সামাজিক সংকটের সম্মুখীন হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। যে আর্থিক সচ্ছলতা ও সামাজিক নিরাপত্তা তাদের বঞ্চনা ও মর্যাদাহীনতাকে আড়াল করে রেখেছিল তা ধীরে ধীরে উদোম হয়ে যেতে থাকে। মুসলিম মেয়েরা নিজেদেরকে মনে করতে থাকে সবচেয়ে অসহায় প্রাণী। ইতিপূর্বে ইসলামী শিক্ষা বর্জিত হবার কারণে ইসলামী মূল্যবোধের সাথে তাদের আত্মিক যোগ ছিল তুলনামূলকভাবে কম। এর ওপর তারা এখন লাভ করতে থাকে পাশ্চাত্য শিক্ষা। ফলে পাশ্চাত্য মতবাদ, সমাজ ব্যবস্থা তাদের কাছে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। এই সংগে পার্শ্ববর্তী হিন্দু সমাজের মেয়েদের অগ্রসরতা তাদেরকে প্রভাবিত করে যথেষ্ট। বিশেষ

করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে লাখো লাখো মুসলিম মেয়ের শরণার্থী শিবিরে অবস্থান, শত শত মেয়ের যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং হাজার হাজার মেয়ের উপর পাশবিক নির্যাতন বাংলার মুসলিম নারী সমাজে এক নতুন বোধের জন্ম দেয়। স্বাধীনতার বাইশ বছর পর আজো দেশ সন্ত্রাস, হত্যা ও নৈরাজ্য মুক্ত হতে পারেনি, এর প্রভাবও মেয়েদের ওপর পড়েছে। বরং বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে মেয়েরাই আজো সবচেয়ে বেশী অসহায়, সবচেয়ে বেশী নিগৃহীত ও সবচেয়ে বেশী শোষিত। এজন্য মুসলিম মেয়েরা আজ পথে নেমে পড়েছে। তিরিশ বছর আগে আধুনিক শিক্ষা লাভের জন্য মুসলিম মেয়েরা ঘরের বাইরে আসা শুরু করেছিল ব্যাপকভাবে। তখন তাদের সংখ্যা ছিল সীমিত। আর আজ অন্ন সংস্থানের জন্য বলতে গেলে প্রতিটি গৃহ থেকে মেয়েরা বাইরে বের হয়ে পড়েছে। এই সংগে বলা যায়, ইতিপূর্বে মসজিদে মেয়েদের প্রবেশাধিকার না থাকার কারণে তারা ধর্মীয় আলোচনা শোনা থেকে বঞ্চিত হয়ে এসেছে। তার ওপর বাইরে এসে ইসলামী শিক্ষা লাভ বা ইসলামী জ্ঞানালোচনায় অংশগ্রহণ করারও তাদের সুযোগ ছিল না, ফলে মুসলিম মেয়েদের ইসলামের সাথে আত্মিক যোগাযোগ আগেই ছিল কম, বর্তমানে আরো কমে যাচ্ছে। ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও সামাজিকতার প্রতি তাদের মোহ বেড়ে যাচ্ছে। এর ফলে আমাদের গৃহ হয়ে যাচ্ছে অরক্ষিত। ইসলাম সেখান থেকে বিতাড়িত হচ্ছে।

এক নিরব বিপ্লব

এই যে এক নিরব বিপ্লব আমাদের সমাজে ঘটে যাচ্ছে এর প্রতি ক'জনের দৃষ্টি আছে? এ অবস্থা যদি আরো বিশ বছর অব্যাহত থাকে তাহলে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজকে একটি যথার্থ ইসলামী সমাজে রূপান্তরিত করা হয়ে পড়বে দস্তুরমতো একটি দুরূহ কর্ম। এজন্য অবশ্য অনেকে প্রথম দৃষ্টিতেই আমাদের দেশে বিদেশী এনজিওগুলোর সাহায্যমূলক কর্মসূচীর আড়ালে ইসলামী সমাজ পরিবেশ ধ্বংসের উদ্দেশ্যমূলক কার্যক্রমকেই দায়ী করে থাকেন। হ্যাঁ, এগুলোও এক পর্যায়ে দায়ী কিন্তু আসল দায়ী নয়। আমাদের নিজেদের দোষ, গলদ ও অবহেলা অনুধাবন করা আমার মনে হয় সর্বাগ্রে প্রয়োজন। অন্যথায় এর সংশোধনের আর কোনো উপায় থাকবে না। এজন্য–

এক : উলামায়ে কেরামকে সর্বাগ্রে সমাজ সচেতন হতে হবে। সমাজের এ সমস্যাটি তাদের উপলব্ধি করতে হবে। আমাদের সমাজের মেয়েরা যে নিগৃহিত, শোষিত ও অধিকার বঞ্চিত এবং এজন্য তারা ইসলামী বিধানের পরোয়া না করে বরং তাকে অকিঞ্চিত মনে করে, নিজেরাই ইসলাম

বিরোধী কায়দায় তাদের সমস্যা সমাধান করার জন্য এগিয়ে আসছে একথা বুঝাতে হবে।

দুই ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈদের খাইরুল কুরূনের হাজার বারশো বছর পরের পৃথিবীতে একটা নতুন ইসলামী সমাজ গড়ার দায়িত্ব উলামায়ে কেরামের উপর বর্তায়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে তাঁর ওয়ারিস—উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে গেছেন। এ দায়িত্ব পালন না করলে তাঁরা দায়িত্ব অবহেলা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন।

তিন ঃ পনের শো হিজরীর শুরুতে যে সমাজে আমরা বাস করছি এটা কোন ইসলামী তো নয়ই বরং মুসলিম সমাজও নয়। হ্যাঁ, ইসলামী ইবাদত বন্দেগী ও মুসলমানদের কিছু রীতি এ সমাজে প্রচলিত আছে মাত্র। বাকি সমাজের পূর্ণ কাঠামোটিই আজ মুশরিকী কায়দায় পরিবর্তিত হতে চলছে। অর্থাৎ সোজা কথায় এটি মুশরিকী কায়দার দিকে ঢলে পড়েছে। একে ইসলামী কায়দায় রূপান্তরিত করতে হবে।

চার ঃ এজন্য তিনটি কাজ অবশ্যই করতে হবে। প্রথমে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। দ্বিতীয়ত, ইসলামী মূল্যবোধ ও আইনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তৃতীয়ত, মুশরিকী ব্যবস্থার গলদ প্রমাণ করতে হবে।

পাঁচ ঃ রসূল, সাহাবা ও তাবেঈদের খাইরুল কুরূনে ইসলামী সমাজে মেয়েদের যে অধিকার ও মর্যাদা ছিল তা আজ আবার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। পাশ্চাত্যবাদ ও উপমহাদেশীয় মুশরিকী প্রান্তিকতার হাত থেকে মুসলিম নারী সমাজকে রক্ষা করতে হবে। নারী ও পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারসাম্য পূর্ণ ইসলামী ইনসাফের ভিত্তিতে আধুনিক জীবন উপযোগী ইসলামী সমাজ গড়ে তুলতে হবে।

ইসলামে চরিত্র গঠনের গুরুত্ব ও পদ্ধতি

আরবীতে চরিত্র শব্দের প্রতিশব্দ হচ্ছে 'খুল্‌ক'। খুল্‌ক বলা হয় মানুষের অভ্যন্তরের এমন সব গুণকে যার মাধ্যমে তার স্বভাব, অভ্যাস ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট ফুটে ওঠে। বাংলায় আমরা একে এক কথায় বলি চরিত্র। এ খুল্‌ক বা চরিত্র গঠন ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এমনিতে চরিত্র বলতে আমরা মানুষের অভ্যন্তরের নৈতিক গুণাবলীকেই বুঝি। এ গুণগুলো শুধু মানুষের থাকে, পশুর বা অন্যান্য মানবেতর জীবের থাকে না। এ নৈতিক গুণাবলীই মানুষ ও পশুর মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। পশুরা খায়, দায়, ঘুমায়, বিশ্রাম করে, সন্তান উৎপাদন করে ও লালন করে। এমনিতে জৈবিক চাহিদার দিক দিয়ে মানুষ ও পশুর মধ্যে বড় একটা ফারাক দেখা যায় না। বরং এ ক্ষেত্রে অনেক দিক দিয়ে এমন গভীর মিল রয়েছে যার ফলে অনেক সময় মানুষ ও পশু এক হয়ে যায়। কিন্তু অভ্যন্তরের নীতিবোধ আবার দুজনকে আলাদা করে দেয়। পশুও খায়, মানুষও খায়। কিন্তু পশু কোনো বাছ বিচার করে খায় না। হালাল-হারাম, ভালো-মন্দ, বৈধ-অবৈধ এ সবের কোনো প্রশ্ন তার ওখানে নেই। যে খাবার সে খায় শুধু সেই খাবার হলেই হয়, কে আনলো কোথায় থেকে আনলো, কিভাবে আনলো এসব দেখার প্রয়োজন তার নেই। নিজের না থাকলে অন্যের থেকে কেড়ে নিয়ে সে খেয়ে ফেলে। খাবার ব্যাপারে কোনো মানুষ যখন এ পর্যায়ে নেমে আসে তখন তাকে পশু বলে গালি দেয়া বা সমালোচনা করা হয়। বরং এ নীতিবোধ যখন মানুষের থেকে আলাদা হয়ে যায় তখন সে শুধু পশুই হয়ে যায় না, তার চেয়েও খারাপ পর্যায় নেমে যায়। কুরআনের ভাষায় এভাবে বলা যায় ঃ (উলাইকা কাল আনআমে বাল্ হুম্ আদল্) অর্থাৎ তারা পশুর মতো বরং পশুরও অধম।

তাই মানুষকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ইসলাম আখলাক গঠনকে গুরুত্ব দিয়েছে। এতো গেলো প্রাথমিক মানবিক চাহিদার কথা। মানুষের মধ্যে শুধুমাত্র প্রাথমিক ও মৌলিক মানবিক গুণ সৃষ্টি নয় বরং তাকে উন্নত মানবিক গুণে গুণান্বিত করার জন্যও ইসলাম আখলাক গঠনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এমনকি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে তাঁর আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ -(موطا امام مالك)

"উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীকে পূর্ণতা দান করার জন্য আমাকে নবুওয়াতের দায়িত্বে সমাসীন করা হয়েছে।"–(মুআত্তা ইমাম মালেক)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণী থেকে প্রমাণ হয়, ইতিপূর্বে যত নবী এসেছেন তাদের সবার নবুওয়াতের বুনিয়াদী মিশনই ছিল মানবতাকে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীতে ভূষিত করা। তাঁরা একের পর এক বিভিন্ন চারিত্রিক গুণাবলীতে মানুষকে সমৃদ্ধ করেছেন। আর সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে এ গুণাবলীকে পরিপূর্ণ করেছেন। মানুষের আখলাক ও নৈতিক চরিত্র পূর্ণতা লাভ করেছে। অর্থাৎ শেষ নবী মানুষের জীবনের সকল দিক সম্পর্কিত নৈতিক গুণাবলী চিহ্নিত করেছেন, সেগুলো সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন এবং তারপর একদিকে নিজের জীবনে সেগুলো বাস্তবায়িত করে উত্তম আদর্শ স্থাপন করেছেন এবং অন্যদিকে তারই ভিত্তিতে একটি সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করে মানবতাকে পূর্ণতা দান করেছেন। মানুষ শুধুমাত্র কথায় নয় কাজেও যথার্থ ও পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত হয়েছে।

এবার আমরা ইসলাম আখলাক গঠনের জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে সে আলোচনায় আসতে পারি।

আখলাক তথা নৈতিক চরিত্রের সম্পর্ক সবটাই মনের সংগে। তাই ইসলাম সর্বপ্রথম ব্যক্তি মানস গঠনে উদ্যোগী হয়েছে। এর মূল ভিত্তি কায়েম করেছে ঈমানের ওপর। ঈমান থাকলে যেমন মানুষ মুমিন হয় এবং ঈমান না থাকলে হয় কাফের, ঠিক তেমনি ঈমানহীন ব্যক্তি অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুমিন নয় সে কখনো উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে পারে না। মানবিক কারণে ঈমানহীন ব্যক্তির মধ্যে কিছু নৈতিক গুণাবলীর আমেজ সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু তার নৈতিক গুণাবলীর মধ্যে কোনোদিন ভারসাম্য সৃষ্টি হবে না এবং তা উন্নত ও পূর্ণ আকৃতি লাভের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে না।

ঈমান আনার পরও মুমিনের আখলাকের প্রথম উপাদান সংগৃহীত হয়েছে তাকওয়া থেকে। তাকওয়া মুমিনের মনের এমন একটি অবস্থার নাম যে অবস্থায় সে শুধুমাত্র প্রতিটি কাজ আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী করেই ক্ষান্ত হয় না বরং মনের পূর্ণ সন্তোষ সহকারেই তা করে এবং কাজ করার পর মানবিক প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ করে। তাকওয়ার কারণে সে শুধু সুস্পষ্ট ক্ষতিকর কাজ থেকেই বিরত থাকে না বরং যে কাজে ক্ষতির আশংকা রয়েছে তা থেকেও পূর্বাহ্নেই বিরত হয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَالَا بَاْسَ بِهٖ حَذَرًا لِّمَا بِهٖ بَاْسٌ۔

"বান্দা মুত্তাকীর মর্যাদা অর্জনে সক্ষম হবে না যে পর্যন্ত না সে এমন সব জিনিস পরিত্যাগ করবে যাতে প্রকাশ্যে কোনো ক্ষতি নেই–এ আশংকায় যে এর ফলে সে এমন সব কাজে লিপ্ত না হয়ে পড়ে যাতে ক্ষতি বা গুনাহ আছে।"–(মিশকাত ও তিরমিযী)

অনেক সময় জায়েয বিষয়ও হারাম কাজের মাধ্যমে পরিণত হয়। এ ক্ষেত্রে মুমিনের সামনে শুধুমাত্র বৈধতার দিকটি থাকলে হবে না বরং এ জায়েয কাজটি যাতে হারাম কাজের মাধ্যমে পরিণত না হয় এদিকটাও তার সামনে থাকতে হবে। তাছাড়া ছোট ছোট ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গুণাহ থেকে বাঁচার জন্যও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাগিদ করেছেন

اِيَّاكَ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَاِنَّ لَهَا مِنَ اللّٰهِ طَالِبًا۔

"নগণ্য ও তুচ্ছ গুণাহ থেকেও বাঁচো। কারণ সেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহি করতে হবে।"–(ইবনে মাজা, মিশকাত)

কুরআনে এ বিষয়টিকে এভাবে বলা হয়েছে ঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ۔ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ

"অণু পরিমাণ ভালো কাজ কেউ করলে তা দেখতে পাবে এবং অণু পরিমাণ খারাপ কাজ কেউ করলে তাও দেখতে পাবে।"

–(সূরা আল যিলযাল)

মুমিনের মধ্যে এ ধরনের সূক্ষ্ম অনুভূতি জাগ্রত থাকাই তাকে তাকওয়ার মর্যাদায় অভিসিক্ত করে।

তাকওয়ার পর মুমিনের আখলাকের দ্বিতীয় উপাদান হচ্ছে ঃ উৎপাদন উপকরণ তথা রুজি-রোজগার হালাল হওয়া। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا ۔ اَلَا فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اِسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ اَنْ تَطْلُبُوْهُ بِمَعَاصِىَ اللّٰهِ ۔ فَاِنَّهٗ يُدْرَكُ مَا عِنْدَهٗ اِلَّا بِطَاعَةٍ۔

"কোনো ব্যক্তি আল্লাহ নির্ধারিত রিযিক হাসিল না করে মৃত্যুর শিকার হবে না। শোনো, আল্লাহকে ভয় করো। আর রিযিক হাসিল করার ক্ষেত্রে বৈধ উপায় উপকরণ ব্যবহার করো। রিযিক হাসিল করার বিলম্ব যেন তোমাদের অবৈধ পথ অবলম্বনে উদ্যোগী না করে। কারণ আল্লাহর কাছে যাকিছু আছে তা শুধুমাত্র তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে।" -(মিশকাত)

উৎপাদন উপকরণ এবং রুজি রোজগার যদিও মানসিক ব্যাপার নয় কিন্তু যেহেতু তার সাথে তাকওয়া তথা আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট এবং বৈধ পথ অবলম্বন করা ও অবৈধ পথ অবলম্বন না করার মাধ্যমে মুমিনের এক বিশেষ ধরনের মানসিক গঠন হয় তাই ইসলামী আখলাক গঠনে এটি একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। বরং বলা যায়, তাকওয়া যেমন মুমিনের সমগ্র চরিত্রের ওপর প্রভাব বিস্তার করে ও তাকে নিয়ন্ত্রণ করে তেমনি এই হালাল রুজি সংগ্রহ করা ও হারাম রুজি থেকে নিজেকে দূরে রাখার নীতিও তার চরিত্রের বিরাট অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে।

মুমিনের আখলাকের তৃতীয় বড় উপাদান হচ্ছে, তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ। এটা এমন একটা উপাদান যা আল্লাহর ওপর পূর্ণাংগ ঈমান আনা ছাড়া কোনো ক্রমেই অর্জিত হতে পারে না। মুমিন ছাড়া মানব প্রজাতির অন্য কোনো দল এভাবে আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করে একটা জীবন গড়ে তুলতে পারে না। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি রসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهٖ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَّتَرُوْحُ بِطَانًا ـ

"যদি তোমরা আল্লাহর ওপর এমনভাবে তাওয়াক্কুল করো, যাতে তাওয়াক্কুল করার হক আদায় হয়ে যায়, তাহলে তিনি তোমাদের ঠিক তেমনিভাবে রুজি দেবেন যেমন পাখিদের রিযিক দেয়া হয়—অতি সকালে বাসা থেকে খালি পেটে বের হয়ে যায় এবং সাঁঝের বেলা ফিরে আসে ভরা পেটে।"-(তিরমিযি ও মিশকাত)

ইমাম তিরমিযি একটি হাদীসে উল্লেখ করেছেন, এক ব্যক্তি এসে বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল, আমি কিভাবে তাওয়াক্কুল করবো—উট বেঁধে রেখে, না ছেড়ে দিয়ে ? জবাব দিলেন ঃ অবশ্যি তাকে আগে বেঁধে রাখো তারপর তাওয়াক্কুল করো।

কাজ করার জন্য জাগতিক বৈষয়িক ও বস্তুগত যাবতীয় উপায় উপকরণ ব্যবহার করার পর তার ফলাফলের ব্যাপারে আল্লাহর ওপর নির্ভর ও তাওয়াক্কুল করাই আসল তাওয়াক্কুল। কিন্তু বস্তুগত উপায় উপকরণ ব্যবহার না করে নিছক আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে বসে থাকা মোটেই তাওয়াক্কুল নয় বরং এক ধরনের নির্বীর্যতা ও অকর্মণ্যতা, যাকে ইসলাম কোনোক্রমেই সমর্থন করেনি। বরং কুরআন পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে ঃ

لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعٰى

"মানুষ যতটুকুন প্রচেষ্টা ও বাস্তব ক্ষেত্রে সংগ্রাম সাধনা করে ততটুকুনই ফল লাভ করে।"

তবে যখন মানুষের প্রচেষ্টা চালাবার আর কিছুই থাকে না, সে অপারগ হয় এবং তার সংগ্রাম সাধনার সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে যায় তখনই সে حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ অর্থাৎ "আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সবচেয়ে ভালো কার্য সম্পাদনকারী।" একথা বলে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে যেতে পারে। যেমন নমরূদের আগুণের কুণ্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অবস্থা হয়েছিল। সেখানে জাগতিক দিক দিয়ে তাঁর কিছুই করার ছিল না।

মুমিনের আখলাক গড়ে তোলার জন্য ইসলাম তার চরিত্রে এ ধরনের তাওয়াক্কুলের সংযোজন ঘটিয়েছে।

ইসলামী আখলাকের চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে, সবর ও শোকর। সবরকে আমরা বাংলায় বলতে পারি ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, সংযম এবং শোকরকে কৃতজ্ঞতা। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

عَجَبًا لاَمْرِ الْمُؤْمِنِ ، اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَالِكَ اِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ وَكَانَ خَيْرًا لَّهُ - وَاِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ

"মুমিনের ব্যাপারটি অবাক করে দেয়। তার সমস্ত কাজই ভালোয় পরিপূর্ণ। মুমিন ছাড়া আর কেউ এ অবস্থার (বা সৌভাগ্যের) অধিকারী হতে পারেনি। সে কষ্ট পেলে সবর করে এবং তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আবার সে আনন্দ লাভ করলে আল্লাহর শোকর আদায় করে এবং তাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।"–(মুসলিম, মিশকাত)

মুমিন কোনো ব্যাপারেও অধৈর্য ও নাশোকরগুজার হয় না। সে কোনো বালা-মুসিবতের সম্মুখীন হলে সবর করে। জুলুম নির্যাতনের শিকার হলে সবর

করে। দুশমনের মোকাবিলায় সবর করে। শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে ন্যায়সংগত প্রতিশোধ নিতে গিয়েও সবর করে। প্রতিপক্ষ ভালো ব্যবহার করলে আমরাও ভালো ব্যবহার করবো এবং প্রতিপক্ষ খারাপ ব্যবহার করলে আমরাও খারাপ ব্যবহার করবো—এ ধরনের দৃষ্টিভংগী মুমিনের জন্য শোভনীয় নয়। বরং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ নিজেদেরকে এমনভাবে গড়ে তোল যাতে লোকেরা ভালো ব্যবহার করলেও তোমরা তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে এবং তারা জুলুম-নির্যাতনের পথ অবলম্বন করলেও তোমরা তাদের অনুবর্তী হবে না।"–(মিশকাত) অর্থাৎ তোমাদের সর্বাবস্থায় ইনসাফ ও ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করতে হবে। লোকেরা যাই করুক বা সমাজনীতি যাই হোক না কেন সেদিকে দৃষ্টি দেয়া ঠিক নয়।

ইসলামী আখলাক গঠনের আর একটা বড় উপাদান হচ্ছে, ভারসাম্যপূর্ণ গতিবিধি। মুমিনের ওঠাবসা, চলাফেরা, আচার-ব্যবহার সবকিছু গঠনমূলক দৃষ্টিভংগী সহযোগে নিয়ন্ত্রিত। সে কখনো কোনো অশালীন ও বাজে কাজে সময় নষ্ট করে না। এমন কি কোনো বাজে ও অশালীন কাজের ধারে কাছেও সে ঘেঁষে না এবং কখনো এ ধরনের কাজের মুখোমুখি হলেও সে শালীনতা বজায় রেখে সেখান থেকে সরে যায় এবং নিজের গঠনমূলক কাজে লিপ্ত হয়। কুরআনে মুমিনের এ চরিত্র বৈশিষ্টকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ـ

"যখন কোনো বাজে ও অশালীন কাজের কাছ দিয়ে তাদের যেতে হয় তখন তারা ভদ্র ও শালীনভাবে সেখান দিয়ে যায়।"

ইসলামী আখলাকের আর একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে, আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার। এটা মুমিনের চরিত্রের একটা মস্তবড় ইতিবাচক দিক। মূলত ঈমান আনার পর মুমিনের ওপর যে দায়িত্ব এসে পড়ে তার পূর্ণ প্রকাশ এ গুণটির মাধ্যমে হয়। মুমিন নিছক কোনো আত্মসমাহিত ও আত্মপরিতুষ্ট ব্যক্তির নাম নয়। নিজের মধ্যে তাকওয়া, তাওয়াক্কুল, সবর ইত্যাদি গুণাবলী সৃষ্টি করে সে সমাজের কোনো বিচ্ছিন্ন একক হয়ে বসবাস করতে পারে না। যে সত্যকে সে সত্য বলে মনে করেছে, যে ন্যায় ও নীতিবোধকে সে গ্রহণ করে নিয়েছে তাকে সমাজে, দেশে ও বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব তার ওপর বর্তেছে। যে অন্যায় ও অসত্যকে সে প্রত্যাখ্যান করেছে সমাজ ও বিশ্বের বুক থেকে তাকে উৎখাত করার দায়িত্বও তার ওপর অর্পিত হয়েছে। তাই মানুষকে সত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং ন্যায় নিষ্ঠার পথ অবলম্বন করার নির্দেশ দেয়া তার দায়িত্বের অন্তরভুক্ত। অন্যায়, জুলুম,

নির্যাতন, শোষণের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং তার পথ রোধ করা মুমিন জীবনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। শুধু তাই নয়, তাকে "আমর" তথা হুকুম প্রদানের পর্যায়ে পৌঁছুতে হবে। অর্থাৎ তাকে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করার মতো শক্তি অর্জন করতে হবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো অন্যায় দেখলে হাত দিয়ে তা প্রতিরোধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ থেকে বুঝা যায় মুমিনকে অন্যায়ের প্রতিরোধ করার মতো শক্তি অর্জন করতে হবে।

এমনিভাবে ইসলাম মুমিনের চরিত্রে যাবতীয় সৎগুণের সমাবেশ করেছে এবং যাবতীয় অসৎগুণ থেকে তার চরিত্রের সমগ্র অংগনকে মুক্ত রেখেছে। ইসলাম শুধু একটি ভারসাম্যপূর্ণ, গঠনমূলক ও ন্যায়নিষ্ঠ চরিত্র গঠনের কর্মসূচী দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং এই সংগে একটি সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনেও উদ্যোগী হয়েছে। যার ফলে এ সমাজ ও রাষ্ট্রের আঙিনায় ইসলাম মুমিনের মধ্যে কাংখিত আখলাক ও চরিত্র গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

সাংস্কৃতিক বিকাশের মৌল চেতনা

সংস্কৃতি মানুষের জীবনের একটি বিকশিত ও পরিশীলিত রূপ। জীবন ধারার কাঠামো, বিস্তৃতি ও রূপবৈচিত্রের বাইরে সংস্কৃতি কোনো ভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার বছর থেকে এ ধারাই অব্যাহত আছে। সংস্কৃতি যদি অপরিবর্তনীয় হয়ে থাকে তাহলে সারা দুনিয়া জুড়ে মানব জাতির সংস্কৃতি হতো এক ও অভিন্ন। কোনোদিন তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসতো না। কারণ প্রথম একজোড়া মানব মানবী থেকেই বিশ্ব জোড়া এ মানব জাতির উদ্ভব ঘটেছে। এ প্রথম জোড়াটি থেকে যে সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটেছে মানুষের বংশধারা দুনিয়ার যেখানেই গেছে সেখানেই এ সংস্কৃতির বিকাশ দেখা যেতো। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন সংস্কৃতির বিকাশ দেখা গেছে। এসবগুলোই মানুষের বিভিন্ন জীবনধারা ও জীবন চর্চার ফল। জীবন চিন্তা ও জীবন দর্শনের ভিত্তিতে সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটেছে এবং তা বিভিন্ন রূপ লাভ করেছে। যেমন মানুষ যেখানে এ দুনিয়ার জীবনকেই সবকিছু মনে করেছে, এরপর আর কোনো জীবন নেই এবং কারো কাছে দুনিয়ার জীবনের কোনো কাজের জন্য কৈফিয়ত দিতে হবে না বলে মনে করেছে সেখানে মানুষের এক ধরনের জীবনধারা গড়ে উঠেছে এবং তার ভিত্তিতে উদ্ভব ঘটেছে এক ধরনের সংস্কৃতির। আবার যেখানে মানুষ তার এ দুনিয়ার জীবনকে একটি পরীক্ষাগৃহ এবং পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত সময়কাল বলে মনে করেছে, সে মনে করেছে যে, এ দুনিয়ার সমস্ত কাজের জন্য তাকে একদিন এক মহা পরাক্রমশালী সত্তার কাছে জবাবদিহি করতে হবে, এ মহা পরাক্রমশালী সত্তা তার সমস্ত কাজ-কারবার দেখে চলছেন এবং কিছুই তার কাছে অজানা থাকছে না, সেখানে মানুষের জীবনধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয় এবং তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে অন্য এক ধরনের সংস্কৃতি।

এক সময় মানুষ গৃহ নির্মাণের কৌশল জানতো না। প্রাকৃতিক নিয়মে গড়ে ওঠা গিরিগুহায় বাস করতো। আগুন জ্বালাবার কায়দা-কানুন জানতো না। শিকার করা পশুর কাঁচা গোশত ও ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ করতো। তখন কি মানুষ বুদ্ধিমান জীব ছিল না ? তখন কি দুনিয়ার অন্যান্য জীবের তুলনায় মানুষের বুদ্ধি একটু বেশী ছিল এবং আজ এ তফাতটা অনেক বেশী হয়ে গেছে ? অর্থাৎ মানুষের বুদ্ধি বেড়ে গেছে কিন্তু অন্যান্য জীবের বুদ্ধি বাড়েনি। এ ধরনের কথা কি কেউ প্রমাণ করতে পারবেন ?

প্রথম মানুষ হযরত আদম আলাইহিস সালাম প্রকৃতিগতভাবে একজন মানুষ হওয়া সত্ত্বেও ছিলেন একজন প্রায় যান্ত্রিক মানুষ। কারণ একাকী হওয়ার কারণে তাঁর জীবনে সমস্যা ছিল অনেক কম এবং জীবন ছিল বৈচিত্রহীন। কিন্তু তাঁর জীবনের চাহিদা পূরণ এবং মানুষ হিসেবে তাঁকে পূর্ণতা দান করার জন্য তাঁরই সত্তা থেকে এক নারী মা হাওয়াকে সৃষ্টি করা হলো। এখন স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা, প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি সমস্ত মানবিক গুণাবলী, যা আদম একা হওয়ার কারণে বিকাশ লাভ করার কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। তাঁদের দুজনের মধ্যে পুরোপুরি বিকশিত হলো। ইতিপূর্বে আদম একা থাকার কারণে কোনো মানবিক সমাজ গড়ে উঠতে পারেনি। ফলে কোনো সংস্কৃতি ও সভ্যতার উদ্ভব সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু এখন হাওয়া এসেই আদমকে পূর্ণ মানবে পরিণত করলেন। আদম দেখলেন, ইতিপূর্বে তিনি যেন কিসের অভাব অনুভব করছিলেন। সে অভাব এখন পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন যেন তিনি জীবনের অর্থ বুঝতে পেরেছেন। নর-নারীর এ সীমাবদ্ধ জীবনে উদিত হলো তৃতীয়জন। তার নাম আযাযিল শয়তান। তৃতীয়জন হলেও সে হচ্ছে দ্বিতীয় পক্ষ। আদম ও হাওয়া একদিকে এবং শয়তানের অবস্থান ঠিক তার বিপরীত দিকে। আদম ও হাওয়াকে বুদ্ধি ও বিবেক দান এবং তাদেরকে জীবন পথে স্বাধীনভাবে চলতে দেবার কারণে তাঁদের মধ্যে ন্যায় ও অন্যায় উভয় প্রবণতাই থাকে। তবে ন্যায়কে প্রাধান্য দেবার ক্ষমতা তাদের প্রকৃতিতেই বিরাজিত থাকে। কারণ তাঁরা ভুল করলে তওবা করতে পারেন এবং ভুলকে নিজেদের মানবিক দুর্বলতা বিবেচনা করে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অন্যদিকে শয়তানের মধ্যে রয়েছে অন্যায়ের আবাস। সে অহংকারী এবং ভুলকে স্বীকৃতি দেয় না।

পৃথিবীতে যেদিন প্রথম মানব জোড়ার পদচারণা শুরু হলো সেদিন থেকেই এখানে আগমন হলো শয়তানেরও। মানুষের মধ্যে ন্যায় ও অন্যায়ের অবস্থান ছিল এবং অন্যদিকে শয়তানের মধ্যে ছিল অন্যায়ের অবস্থান। ন্যায় ও অন্যায়ের সংঘাতে মানুষ ন্যায়কে প্রাধান্য দিতো। কিন্তু শয়তানের মধ্যে ছিল শুধুমাত্র অন্যায়ের পদচারণা। আবার সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে মহাপরাক্রমশালী সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষকে প্ররোচনা দেবার পূর্ণ শক্তি শয়তানকে দান করেন। শুধু এতটুকুই নয় বরং মানুষের রক্ত-মাংসের শরীরের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় ও স্নায়ুতন্ত্রীতে তার প্রবেশাধিকারও দান করেন। কাজেই আল্লাহর নিয়ন্ত্রিত কিছু মানুষ অর্থাৎ নবীগণ ছাড়া প্রত্যেকটি মানুষ শয়তানি ওয়াসওয়াসার সহজ শিকার হতে পারে। বরং বলা যায়, এটা আল্লাহরই একটা ব্যবস্থা। প্রত্যেকটি মানুষ শয়তানী ওয়াসওসার পূর্ণ শিকারে পরিণত হয়ে

অন্যায়ের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয়। এ সংঘর্ষে শয়তানের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে সে তার মানবিক সত্তার বিকাশ সাধন করে। এখানে পরাজয় মানে মানবিক সত্তার অধঃপতন। একজন অন্যায়কারী ও একজন জালেমকে অমানুষই মনে করা হয় এই দিক দিয়ে যে, সে মানবতার অপমান করছে এবং মানুষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে।

মানব শিশুকে বলা হয় নিষ্পাপ। শিশুকে সবাই ভালোবাসে। কারণ তার মধ্যে স্বভাবগতভাবে অন্যায়ের প্রাধান্য থাকে না। তার শিরা উপশিরায়ও শয়তান প্রবেশ করে কিন্তু সেখানে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে না। যখনই তার মধ্যে চেতনা, জ্ঞান ও বিবেকের উন্মেষ ঘটে তখনই তার শয়তানের প্ররোচনার শিকার হবার দরোজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। এ উন্মেষকালের বিস্তার সবার জন্য সমান নয়। কারোর মধ্যে এ চেতনার উন্মেষ ঘটে অনেক ছোট বয়স থেকে এবং কারোর মধ্যে এর সময়কাল আবার তেমন দীর্ঘ হয় না। কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্ক ও বালেগ হওয়ার পরই তার মধ্যে শয়তানের শিকার হওয়ার পূর্ণ যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে যায়। তাই অপ্রাপ্ত বয়স্ক একটি শিশুর কর্মকাণ্ড মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতিতে কোনো অবদান রাখার ক্ষমতা রাখে না। বিশ্বের কোথাও কোনো যুগে অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুরা কোনো সভ্যতা বা সংস্কৃতি গড়ে তোলেনি। এক একটি জাতি এক একটি দেশে বা এলাকায় সজ্ঞানে ও সচেতনভাবে এক একটি সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। তাই মানুষের সভ্যতা সংস্কৃতিতে যা কিছু ভালো তার জন্য মানুষের পুরস্কৃত হবার অধিকার রয়েছে আবার এখানে যা কিছু মন্দ সে জন্য সে-ই পুরোপুরি দায়ী এবং তার খেশারত তাকেই ভোগ করতে হবে এটাও ন্যায়সংগত।

এখানে আমরা মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে প্রথম থেকেই দুটো জিনিস লক্ষ করছি। একটা হচ্ছে, মানুষ সচেতনভাবে এর নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। নিজের বুদ্ধি বিবেক ও জ্ঞান অনুযায়ী এর কাঠামো ভাঙছে গড়ছে। দ্বিতীয়ত আল্লাহর নিয়ন্ত্রিত বান্দা তথা নবীগণ এর একটা কাঠামো ও অবয়ব প্রতি যুগে দিয়ে এসেছেন। কোথাও মানুষ সেগুলো গ্রহণ করেছে, কোথাও উপেক্ষা করেছে। তবে নবীদের কাঠামো যেহেতু মানুষের প্রকৃতির সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল তাই সভ্যতা ও সংস্কৃতি গঠনে তা বুনিয়াদের কাজ করেছে এবং শক্ত ভিতেই এ বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে। তাইতো আমরা দেখি মানুষের সভ্যতার দশ হাজার বছর পরও আজো দুনিয়ার সর্বত্র ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় এবং হক ও বাতিলের একই মানদণ্ড সক্রিয় ও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আমাদের চোখের সামনে বিগত সত্তর বছর থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার মতো দুনিয়ার একটি বিশাল এলাকায় পঁচিশ তিরিশ কোটি জনসমষ্টির মধ্যে একটি ভিন্নতর মানবিক

মূল্যবোধ এবং ন্যায়-অন্যায় ও সত্যাসত্যের একটি অন্য ধরনের মানদণ্ড তৈরী করার কসরত কিভাবে শতকরা একশো ভাগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো, তা অবশ্যই ইতিহাসে একটি দৃষ্টান্ত হয়েই থাকবে। বিশ শতকের সবচেয়ে বড় ঘটনা হচ্ছে, বিশ্বের বিরাট অংশে মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠা এবং মাত্র সত্তর বছরের মধ্যে তার পতন এবং এমন ভয়াবহ ও সার্বিক পতন যা ছিল অনেকটাই অস্বাভাবিক। কিন্তু মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতিকে অস্বীকার ও উপেক্ষা করলে এ ধরনের পরিণতিই অনিবার্য ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি স্বাভাবিক পথেই এগিয়ে চলতে পারে। অস্বাভাবিক পথের শেষ হয় তার পতনের মধ্য দিয়েই। আর একটি কথা, কুরআন মানুষের সভ্যতার যে ইতিহাস ও ধারাক্রম বর্ণনা করেছে তা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, দুনিয়ার প্রথম মানুষটি যে সত্যের ওপর নিজের জীবন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন প্রতি যুগে প্রত্যেকটি দেশে মানুষের পর্বত প্রমাণ বুদ্ধি চর্চার পরও সেই একই জীবন সত্যে তাকে ফিরে আসতে হয়েছে। এক একজন নবী এসেছেন। তাঁরা একই সত্য উদঘাটন করেছেন। শত শত বছর হাজার বছর পরও মানুষকে তাঁরা আবার সেই একই পথে ফিরিয়ে এনেছেন। আর আজকের জগতে একদল লোক বছরের পর বছর তিন চার পুরুষ ধরে উলটো জীবন চর্চা করার কসরত চালিয়ে ব্যর্থ পুরোপুরি ব্যর্থ ও হতাশাগ্রস্ত এবং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আবার সেই মানুষের স্বাভাবিক পথেই ফিরে এসেছে। সত্যের বিজয়ের এটা হচ্ছে একটা সূচনা বিন্দু এবং এ বিজয়টা পূর্ণ হয় তার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। সেটাও মানবিক সভ্যতার একটা অনিবার্য পরিণতি। এ যুগে আর নবীর আগমন হবে না ঠিকই কিন্তু "খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত" তথা নবীর জীবন চর্চা এটাও মানুষের প্রকৃতি এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির একটা স্বাভাবিক ও চূড়ান্ত দাবী।

এ থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, বিশ্ব সংস্কৃতির একটা স্বাভাবিক গতিধারা ও পরিণতি আছে, তা থেকে কখনো পুরোপুরি তাকে বিচ্যুত করা যাবে না। সাময়িকভাবে তাকে বিভ্রান্ত করা যাবে, শয়তানের ক্ষমতা শুধু এতটুকুই। কিন্তু আবার তাকে তার স্বাভাবিক পথেই ফিরে আসতে হবে। আর যে দিন সে আর ফিরে আসতে পারবে না, সেদিনই কিয়ামতের সূচনা। একথাটিই হাদিসে এভাবে বলা হয়েছে ঃ لاتقوم الساعة حتى يقول الله الله। যতদিন পর্যন্ত দুনিয়ায় আল্লাহর হুকুম মেনে চলার মতো একজন লোকও থাকবে ততদিন কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে না।

সংস্কৃতির গতি প্রকৃতি

মানুষের আছে একটি সুন্দর সূচনা

এ দুনিয়ার বাইরে ছিল আর একটি দুনিয়া। সেখানে ছিলেন দুজন মানুষ। আদম ও হাওয়া। তারা সেখানে যাপন করছিলেন একটি গতানুগতিক জীবন। আদমের জীবনে কোনো বৈচিত্র ছিল না। হাওয়া আনেন প্রথম বৈচিত্র। মানুষের জীবনে এতটুকু বৈচিত্রও যথেষ্ট ছিল না। কারণ আদম ও হাওয়া ছিলেন একমুখী। তাঁরা ছিলেন পূর্ণ অনুগত শ্রেষ্ঠ আল্লাহর। তাদের মধ্যে বিদ্রোহ ছিল না। ফলে বিপরীতমুখী স্রোতের অভাবে ভাটা পড়েছিল নতুন সৃষ্টিমুখরতায়। বিপরীত স্রোতের আঘাতে ভাংগে এবং ভাংলে গড়ে ওঠে। আসলে বিপরীতের সাহায্যে জীবনকে তখন জানার ও চেনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

মহান আল্লাহ সে প্রয়োজন পূর্ণ করলেন

এজন্য আদম ও হাওয়ার জগতে এলো তৃতীয়জন। তাকে সারা দুনিয়ার সব দেশের মানুষ 'শয়তান' বলেই জানে। এ শয়তান কিন্তু মানুষের প্রজাতি নয়। এমন কি এ দুনিয়ার কোনো প্রজাতির সাথে তার মিল নেই। পশু, পাখি, উদ্ভিদ বা জলজ কোনো প্রাণীও সে নয়। সে এমন এক প্রাণী ও প্রজাতির অন্তরভুক্ত যাকে চোখে দেখা যায় না। অথচ সে সবাইকে দেখে। সে খেচর সে ভূচর সে জলচর। সর্বত্র তার অবাধ গতি। এমনকি মানুষের শরীরের শিরায়-উপশিরায় প্রবাহিত হবার শক্তিও তাকে আল্লাহ দিয়েছেন।

মানুষের সাথে তার প্রথম দেখা

সে দেখা এক মোকাবিলার ময়দানে। সেও এক বিচিত্র কথা। কালের প্রতিযোগিতায় আদমের সাথে এঁটে উঠতে না পেরে সে করলো নিজের সত্তার অহংকার। আল্লাহ হলেন নারাজ তার প্রতি। তাকে ঘোষণা করলেন বিপথগামী বলে। শয়তান মাথা পেতে নিল আল্লাহর নারাজী, অভিশাপ ও বিপথগামিতার ঘোষণা। তবুও নিজের ভুল স্বীকার করলো না। সে চ্যালেঞ্জ করলো আদমকে এবং আদমের সমস্ত অনাগত বংশধরদের। তাদের সে বিপথগামী করবে। এজন্য আল্লাহর কাছ থেকে সে ক্ষমতা চেয়ে নিল মানুষকে সকল প্রকার প্ররোচনা দেবার এবং সত্য-সরল পথ থেকে বিপথগামী করার। আল্লাহ তাকে সে ক্ষমতা দান করলেন শর্ত সাপেক্ষে। অর্থাৎ প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক দেশে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের কাছে সত্য-সরল পথের নির্দেশনা এসে যাবে। যারা সে নির্দেশনা মেনে নেবে এবং সে অনুযায়ী দুনিয়ায় জীবন যাপন করবে শয়তান তাদের বিপথগামী করতে পারবে না।

সেদিন থেকে শুরু হলো মানুষের আর এক জীবন

আদম ও হাওয়া চলে এলেন এ মাটির পৃথিবীতে। স্বাভাবিকভাবে তাদের সাথে সাথে এসে গেলো শয়তান। কারণ সে নিজে বিপথগামী এবং মানুষকেও বিপথগামী করার চ্যালেঞ্জ দিয়েছে সে।

এখানে আরেক জগত। ভাঙা এবং গড়া। গড়া এবং ভাঙা। সংঘাত সত্য ও মিথ্যার, হক ও বাতিলের, ন্যায় ও অন্যায়ের। এখানে একদিকে হেদায়াত অন্যদিকে গোমরাহী। প্রতিযোগিতা সমান তালে। যেখানে ফেরাউন সেখানে মূসা। যেখানে নমরূদ সেখানে ইবরাহীম। নমরূদ ভীষণ শক্তিধর। কিন্তু ইবরাহীম অসম সাহসী। যদিও মানব জাতি মূর্তির উপাসক তবু ইবরাহীম একাকী ঘোষণা করলেন, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।

মানুষের সভ্যতার, মানুষের সংস্কৃতির এই যে প্রারম্ভ এটাই তার মূল পরিচয়। সংঘাতের মধ্য দিয়েই সংস্কৃতির অগ্রযাত্রা। বিপরীত স্রোতের মুখেই সে নিজেকে ভাসিয়ে রেখেছে অব্যাহতভাবে। এর মধ্য দিয়েই সে নিজেকে চিনেছে ও চিনিয়েছে। সংস্কৃতির সূচনাবিন্দুতে কোনো বুদ্ধিভ্রষ্টতা কোনো জড়তা নেই, আছে প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত সত্যনিষ্ঠা। মানুষ একদিন অমানুষ বা অপমানুষ ছিল না। বুদ্ধির শূন্যতা থেকে পদচারনা শুরু করে উদ্ভিদ বুদ্ধি, পশু বুদ্ধি থেকে মানব বুদ্ধিতে পৌছেনি। সে প্রথমেও মানুষ, মাঝেও মানুষ, শেষেও মানুষ। স্থান ও কাল তার বুদ্ধির সাথে যুক্ত হয়ে বিচিত্র ও নিত্য নতুন রূপ নিয়েছে। জ্ঞানই মানুষকে বিশিষ্ট করেছে। জ্ঞান থেকেই তার যাত্রা শুরু। তার জ্ঞানই শয়তানকে তার শত্রুর সারিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। শয়তানের আছে বুদ্ধির অহংকার, মানুষের আছে বুদ্ধি ও জ্ঞানের সম্পদ। জ্ঞানের অভাবেই শয়তান পথভ্রষ্ট। আসলে জ্ঞান ছাড়া বুদ্ধি একটা পাগলা হাতি বৈ আর কিছুই নয়। তাইতো শয়তানের কোনো সৃষ্টি নেই শুধু ধ্বংস ধ্বংস ধ্বংস। আর আদম বিদ্রোহে শামিল হয়েও নতুন পৃথিবীর সম্রাট। পৃথিবী মানেই সৃষ্টি মুখরতা। জ্ঞান ও বুদ্ধির সমাহারে মানুষের গড়া একটি জগত। মানুষের পৃথিবীতে যেদিন প্রথম সূর্যোদয় সেদিন মানুষ বুদ্ধিদীপ্ত, জ্ঞানদীপ্ত, সজাগ, সচেতন। মানুষ জানে তার সূচনা, তার শেষ। মানুষ জানে তার করণীয়, তার কর্তব্য। মানুষ পৃথিবীতে একা নয়, আছে তার সাথে পথের দিশা। প্রথম দিন থেকেই সে ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে এসেছে। সে ভুলকে ভুল বলেই জানে। সঠিককে সঠিক বলেই মানে। আজ যা ভুল সেদিনও তাই ছিল ভুল। আজ যা সত্য সেদিনও তাই ছিল সত্য। কোথাও একটুও হেরফের হয়নি।

একুশ শতকের ঘণ্টা বাজছে

এতো মাত্র দু হাজার বছরের একটা হিসাব। মানুষের সভ্যতা আজ বিজ্ঞানের সংগায় মোড়া। কিন্তু দু হাজার বছর আগে এ সভ্যতার রূপটি কেমন ছিল? আজকের সাথে তার কি বহু বিষয়ের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে? পিছনের দিকে আমরা কতদূর পর্যন্ত যাবো। পাঁচ হাজার বছর পর্যন্ত সহজে যাওয়া যায়। দশ হাজার বছর পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করার সুযোগ ইতিহাস দেয়। আমাদের এ উপমহাদেশে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার সভ্যতা, মিসরের সভ্যতা, মেসোপটোমিয়া ও ইরাকের সভ্যতা, চীনের সভ্যতা এ সবই দশ হাজারের বাইরের কেউ নয়। এ সভ্যতাগুলোই মানুষের উন্নত সাংস্কৃতিক জীবনাচরণের প্রমাণ। তাহলে এর আগে মানুষ অসভ্য ছিল? কবে ছিল? তার চেহারাটা কি? সভ্যতার প্রাচীনতম চেহারাটাও ফুটে উঠেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোই তার প্রতীক। কিন্তু অসভ্যতার কোনো প্রাচীনতম চেহারা নেই। আছে তার কাল্পনিক চিত্র। এগুলো অনেক ক্ষেত্রে অবৈজ্ঞানিক কল্পনা বিলাসিতার রূপ নিয়েছে। কারণ অসভ্যতার যে প্রাচীনতম রূপ দেখানো হয় তা আজকের যুগেও অনেক দেশে দেখা যায়। এগুলোকেই কল্পনায় পিছনের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কল্পনার কোনো আনুমানিক রূপ নেই। বাস্তবের বিকৃত রূপই কল্পনা। তাই অসভ্যতার একটা কল্পনা এক দল মানুষের মনে আঁকা হয়ে গেছে। যেটাকে অসভ্যতা ও সভ্যতা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আসলে সভ্যতার বিবর্তন এবং সভ্যতার বিকাশ। মানুষ কোনো দিন অসভ্য, জ্ঞানহীন ও বুদ্ধিহীন ছিল না। ভালোমন্দ ও ন্যায়-অন্যায় বুঝার ক্ষমতা তার প্রথম দিনে যেমন ছিল আজো ঠিক তেমনটিই আছে। সমাজ গঠন, সামাজিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক উন্নয়নের খাতিরে তাকে অনেক বিধান ও নিয়ম প্রবর্তন করতে হয়েছে। এগুলো সভ্যতা ও অসভ্যতার পার্থক্যসূচক নয়। বরং সভ্যতার বিবর্তন ও উন্নয়ন মাত্র। যেমন মোগল আমলের ষাট হাজার জনসংখ্যার ঢাকা শহর এবং আজকের ষাট লাখের ঢাকা মহানগরীর সামাজিক নিয়ম ও বিধান কি একই রকম থাকা সম্ভব? তাই বলে মোগল আমলের ঢাকাকে অসভ্য বা কম সভ্য বলতে যাবো কোন দুঃখে।

দশ হাজার বছর আগের আদম ও হাওয়ার জীবনবোধ ও জীবনাচরণ এবং আজকের বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশের মানুষের জীবনবোধ ও জীবনাচরণের মধ্যে পার্থক্য করা হবে কিসের ভিত্তিতে? তাঁরা ছিলেন স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা। স্বামী-স্ত্রীর যে দাম্পত্য জীবন তাঁরা যাপন করেছেন আজকের যুগের সর্বোন্নত দেশের স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের তুলনায় তাকে অসভ্য জীবন বলবো কেমন করে? তারা কি পাশবিক দাম্পত্য জীবন যাপন করেছিলেন?

এর কোনো প্রমাণ আছে ? বরং বাইবেল ও কুরআনের ভাষ্য মতে আজকের উন্নত দেশগুলোর অনেক প্রকার দাম্পত্য জীবনের তুলনায় তা ছিল অনেক বেশী উন্নত, শালীন ও মর্যাদাপূর্ণ।

তাঁরা সন্তান-লালন পালন করেছেন। সন্তানকে দুধ পান করিয়েছেন। কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন। তাদেরকে মানবিক ঐতিহ্য শিখিয়েছেন। নফসের বান্দা না করে আল্লাহর বান্দা করেছেন। আজকের সন্তান পরিচর্যার সাথে এসবগুলোই জড়িত। এছাড়া আজকের বাড়তি বিষয়গুলোর সে সময়ে কোনো পরিবেশ ও প্রয়োজন ছিল না।

তাঁরা আহার-বিহার, শয়ন ও বিশ্রাম করেছেন। আজকের মানুষের জীবনও এ প্রয়োজনমুক্ত নয়। খাদ্য তালিকায় হেরফের ঘটেছে উন্নত কৃষি ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুতের কারণে। নয়তো খাবারের মধ্যে ভালো-মন্দ ও হালাল-হারামের পার্থক্যবোধ সেদিনও ছিল আজো আছে। খাবার ধরনের মধ্যে পার্থক্য খাদ্য বস্তুর পার্থক্যের কারণে।

পোশাক-আশাকের ব্যাপারেও একই কথা বলা যায়। তারা পোশাক ব্যবহার করেছেন। আজো ব্যবহার করা হচ্ছে। ক্রমপরিবর্তন ও বিবর্তনের মাধ্যমে পোশাক উন্নত হয়েছে মাত্র। এক সময় মানুষ গরু ছাগলের মতো উলঙ্গ থাকতো আজ পোশাক পরছে এমন কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করা যেতে পারবে না।

এভাবে সভ্যতার বিবর্তন প্রমাণ করা যেতে পারে কিন্তু অসভ্যতার প্রমাণ নেই। মানুষের গুহায় ও বনে জঙ্গলে বাস করা এবং ফলমূল ও পশু শিকার করে খাওয়া অসভ্যতা নয়। সুসভ্য বিশ্বে আজো এর প্রচলন আছে এবং অনেক জায়গায় এর প্রয়োজনও আছে।

মানুষের দশ হাজার বছরের ইতিহাস তার সংস্কৃতিরই ইতিহাস। কারণ প্রথম থেকেই সে সভ্য ছিল। কাজেই সে ছিল একটি সুন্দর রুচিশীল সাংস্কৃতিক জীবনের অধিকারী। একটি অভিন্ন সাংস্কৃতিক জীবন ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে এর যাত্রা শুরু। আল্লাহ্ তাকে এ জ্ঞান দিয়েছেন এবং তার বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে এর পরিচালনা উন্নয়ন ও বিকাশের ক্ষমতা রেখে দিয়েছেন। যুগে যুগে দেশে দেশে সে এর প্রয়োগ করেছে। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে এর ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধান করলে সবার মর্মমূলে একটি অভিন্ন মৌল সাংস্কৃতিক কাঠামো লক্ষ্য করা যাবে। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা তিনটি মহাদেশ এখনো এক সাথে জুড়ে আছে। অষ্ট্রেলিয়া কাছেই আছে। দুটো

আমেরিকা অনেক দূরে থাকলেও হাজার হাজার বছর আগে প্রাচীন যুগেও আদম ও হাওয়ার সন্তানরা সেখানে পৌঁছে গেছে। ফলে সারা দুনিয়ায় মানবিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে।

মানুষের সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে একটি উল্টো ধারা। গোড়াতেই আমরা এর কথা বলে এসেছি। শয়তানের প্ররোচনা, শয়তানের বিদ্রোহ, শয়তানের অবিশ্বাস এ ধারার উৎস। সাংস্কৃতিক বিভ্রান্তি, সাংস্কৃতিক বিকার ও অপসংস্কৃতি এসবই এ উৎস থেকে উৎসারিত। মানুষের সংস্কৃতির পাশাপাশি এ শয়তানের সংস্কৃতির চর্চাও আবহমানকালের। মানুষ সৃষ্টি করে, শয়তান দেয় প্ররোচনা। মানুষের সৃষ্টিতে ভাঙার কাজে তার ভূমিকা সক্রিয়। সংস্কৃতির এ শয়তানী প্ররোচনা উপলব্ধি করা আজকের বিশ্বে মোটেই কঠিন নয়। কারণ এক অর্থে বলা যায় আমরা তার মধ্যে ডুব-সাঁতার দিচ্ছি। আমরা একে বলছি ঃ সাংস্কৃতিক বিভ্রান্তি, সাংস্কৃতিক বিকার ও অপসংস্কৃতি।

এ সংস্কৃতির ধারকরা আল্লাহর বান্দার পরিবর্তে পূর্ণ বা আংশিকভাবে শয়তানের বান্দা। তারা আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানের ধ্যানে মগ্ন। এ সাংস্কৃতিক জীবন মানুষের যে সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় দেয় সেখানে আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানের উপাসনা করা হয়, শয়তানের গুণ গাওয়া হয়। মানুষ যখন মানুষের অধিকার হরণ করে তখন সে শয়তানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। মানুষ যখন মানুষকে গোলামে পরিণত করে তখন সে শয়তানের গোলামে পরিণত হয়। যুগে যুগে এ শয়তানি সংস্কৃতি ও এ গোলামীর সংস্কৃতির সাথে রহমানী সংস্কৃতি ও যথার্থ মানবিক সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব চলে আসছে। এই দ্বন্দ্ব আজ পাঁচ শ কোটি মানুষের বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্ব এগিয়ে যাবে। এ দ্বন্দ্ব চলতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। আমাদের কাজ সত্যকে মিথ্যা থেকে ন্যায়কে অন্যায় থেকে ইনসাফকে জুলুম থেকে ছেঁটে বের করে নিয়ে আসা।

এজন্য আমাদের কাছে আছে জ্ঞানের প্রদীপ কুরআন ও হাদীস, যা বিশ্বের অন্য কোনো জাতির কাছে নেই। কাজেই আমাদের পক্ষে সত্যিকার রহমানী ও মানবিক সাংস্কৃতিক জীবন যাপন করা মোটেই কঠিন নয়।

সংস্কৃতির অব্যাহত ধারা

জীবন চর্চাই সংস্কৃতি। জীবনের শুরু যেখান থেকে সংস্কৃতির সূচনা বিন্দুও সেখানেই। পৃথিবীতে মানুষের প্রথম জীবন চর্চা যেহেতু আল্লাহর হেদায়াত ও আনুগত্য দিয়েই শুরু। তাই এ প্রথম জীবন চর্চাই ছিল ইসলামী সংস্কৃতির সূতিকাগার। আল্লাহর আনুগত্যেই ইসলামী সংস্কৃতির সূচনা বিন্দু এবং আল্লাহর আনুগত্যেই তার চরম বিকাশ।

মানুষের বিগত দশ হাজার বছরের ইতিহাস আল্লাহর প্রতি আনুগত্যেরই ইতিহাস। দশ হাজার বছরে পৃথিবীর কোনো এক সময়ও অন্তত একটি দেশ আল্লাহর আনুগত্য মুক্ত ছিল না। তাই ইসলামী সংস্কৃতির ধারা প্রথম থেকেই অব্যাহত রয়েছে। শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বু'ইসতু লিউতাম্মিমা মাকারিমাল আখলাক।

'উন্নত সাংস্কৃতিক জীবন ধারাকে পূর্ণতা দান করার জন্য আমি প্রেরিত।'

অর্থাৎ উন্নত জীবন চর্চার সমস্ত মৌল উপাদান মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংগ্রহ ও সমবেত করে দিয়ে গেছেন। একদিকে সমাজের সমস্ত মানুষ একটি অনড় বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দুতে একত্রিত। তাদের বিশ্বাসে সংশয়ের লেশমাত্র নেই। একেবারে দুই আর দুইয়ে চারের মতো। তারা এ বিশ্বাসের যে কোনো দাবীকে নিশ্চিন্তে মেনে নিচ্ছে, তাকে বাস্তবে কার্যকর করে চলছে। কোথাও ভুল হয়ে গেলে অকপটে তা প্রকাশ করছে এবং সংশোধন করার জন্য যে কোনো খেশারত কবুল করে নিচ্ছে। মানুষের মর্যাদা সেখানে এত উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, তদানীন্তন এশিয়া ও আফ্রিকার বিশালতম ভূখণ্ডের শাসক খলীফা যাচ্ছেন সিরিয়া সফরে। উট তার বাহন। সামনে চাকর উটের রশি ধরে পথ দেখিয়ে চলছে। ভর দুপুর বেলায় মাথার ওপর আগুনের পিণ্ড আর পায়ের নিচে তপ্ত বালুর সমুদ্র। চাকর ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। এবার খলীফা নামলেন উটের পিঠ থেকে, চাকর উঠলেন উটের পিঠে। খলীফা উটের রশি হাতে তপ্ত বালুর বুকে হেঁটে চলছেন। আজকের আধুনিক বিশ্বের সভ্যতাগর্বী দেশগুলোয় কি এ দৃশ্য কল্পনা করা যায়? একবার কল্পনা করা যাক সুপ্রাচীন সভ্যতার দেশ ভারতের কথা। এ দেশটার দক্ষিণ এলাকার তামিলনাড়ুর কোথাও কোথাও আজো পথে কোনো শূদ্র তথা হরিজন যদি কোনো ব্রাহ্মণের ছায়া মাড়ায় তাহলে ব্রাহ্মণ গাত্র ধৌত করে নিজেকে শুচিশুদ্ধ তো করবেনই উপরন্তু শূদ্রকেও দণ্ড মাথা পেতে নিতে হবে।

এ দুই সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্যে তুলনা করা যায়। আজকের বিশ শতকের মুসলিম সমাজ তার অনেক সুকৃতি হারিয়ে ফেললেও মানুষে মানুষে ভেদাভেদের দেয়াল এখানে ওঠেনি। মানুষের মর্যাদা এ সমাজে আজো অম্লান। মানুষ এখানে মানুষের প্রভু নয়। মানুষ মানুষের দাস নয়। কিন্তু বিশ্বের উন্নত দুটি মহাদেশ ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় আজো সাদা কালোয় পার্থক্য করা হচ্ছে। জার্মানীতে আবার নাৎসীবাদ তথা 'জার্মান আর্যরাই শ্রেষ্ঠ' আন্দোলন মাথাচাড়া দিচ্ছে।

আমাদের এ উপমহাদেশে একদিন ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির রাজত্ব। ব্রাহ্মণ ছিল সমাজের মধ্যমণি। ব্রাহ্মণ ভগবানের পূজা করতো। আর শূদ্র করতো ব্রাহ্মণের পূজা। ব্রাহ্মণই ছিল সাক্ষাত ভগবান। গৌতম বুদ্ধ এলেন ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে অভিশাপ হয়ে। জাতিভেদ তিনি নির্মূল করতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর পরে তাঁর অনুসারীরা সে পথে অটল থাকতে পারলো না। তাঁর অনুসারীদের মধ্য দিয়েই আবার ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। তের শতকে ইসলাম এর ভিত নাড়িয়ে দিল। মুসলমানরা দেবল থেকে সাদকাঁউ পর্যন্ত মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রীর বন্ধন গড়ে তুললো। সেই থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির সাথে ইসলামী সংস্কৃতির চলছে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ।

আর এ বাংলায় মুসলিম ও ইসলামী সংস্কৃতির অগ্রগতির হাজার বছরেরও বেশী সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। এখানে তুর্কী, ইরানী, আরবী, আফগানী, মোগল ও হিন্দুস্তানী মুসলমানদের বিপুল সংখ্যায় আগমন ঘটলেও স্থানীয় দীক্ষিত মুসলমানদের সংখ্যা তাদের তুলনায় অনেক বেশী। এ স্থানীয় মুসলমানরাই এলাকার আদি বাসিন্দা এবং তারা পুরোপুরি ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল। ইতিপূর্বে এদের বিপুল অংশ ছিল বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত। তাদের অধিকাংশই সেন আমলের ব্রাহ্মণ্যবাদের চাপের মুখে নিজেদের সদ্ধর্মী খোলসে ঢেকে রেখেছিল। প্রথম সুযোগেই এরা তওহীদের ডাকে সাড়া দিল। সময় এবং পরিবেশের কারণে এদের মধ্যে ভীরুতা এসে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু সত্য প্রীতিকে এরা পরিত্যাগ করেনি। আর দ্বিতীয়ত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের গুণাবলীর তুলনায় কুসংস্কারই এদের মধ্যে অধিবাস গ্রহণ করেছিল বেশী করে। এ সংগে ইসলাম গ্রহণ করার পর এদের মধ্যে যথাযথভাবে ইসলামী শিক্ষার প্রসার ঘটানো সম্ভবপর হয়নি। কারণ সীমিত সংখ্যক ইসলাম প্রচারক ও প্রশিক্ষকদের পক্ষে এ বিপুল সংখ্যক মুসলমানদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভবপর ছিল না। ফলে পরবর্তীকালে প্রবল ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতি এ স্থানীয় মুসলমানদেরকে সবসময় বিব্রত করেছে। ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতি চরম

রক্ষণশীলতার মাধ্যমে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল। এই সংগে আবার তার আগ্রাসী ও প্রতিহিংসাপরায়ণ একটি রূপ ছিল। তবে প্রবল পরাক্রান্ত মুসলিম শাসনের কারণে তার আগ্রাসন ইসলামী সংস্কৃতিকে বিব্রত ও কখনো বিপর্যস্তও করেছিল ঠিকই, কিন্তু দমিত বা খাটো করতে কখনো সক্ষম হয়নি।

কিন্তু আঠারো শতকে ইউরোপীয় খৃষ্টান পুর্তুগীজ, দিনেমার, ফরাসী ও ইংরেজদের তল্পী বহন করে এবং তাদের ফড়িয়া হয়ে তারা এদেশে বৃটিশ শাসনের সূত্রপাত ঘটাতে সাহায্য করে। এবার তাদের আগ্রাসী রূপ আরো বৃহদাকার ধারণ করে। দুই মুশরিক ও দুই কুফরের মধ্যে একটি মেল বন্ধন ঘটে। যদিও বাণী নিঃসৃত হয়, "দিবে আর নিবে মিলিবে মিলাবে।" কিন্তু আসলে ইংরেজের ও ইউরোপীয় মুশরিকদের থেকে তারা নিয়েছে কেবলই, দিয়েছে বা আর কি ! এতে তারা লাভবান হয়েছে। তাদের কুসংস্কার অনেক দূরীভূত হয়েছে। তাদের আগ্রাসী ক্ষমতা আরো বেড়েছে। ফলে এ সময়ে তারা আগের তুলনায় ইসলামী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অনেক বেশী আক্রমণাত্মক ও মারমুখো ভূমিকা নিয়েছে।

এতদিন স্থানীয় ইসলামী সংস্কৃতি শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির আগ্রাসনের শিকার হচ্ছিল। এবার আর এক শিকারী তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এ ছিল ইউরোপের নব্য মুশরিকী সংস্কৃতি। এর কাছে ছিল বিজ্ঞান ও অত্যাধুনিক টেকনোলজি। এই সংগে ছিল নাস্তিক্যবাদ, ফ্যাসীবাদ, ক্রমবিবর্তনবাদ, ফ্রয়েডবাদ, মার্ক্সবাদ ইত্যাদির আরো অনেক ছোট বড় সাংগপাংগ। উনবিংশ শতক শেষ হবার আগেই এ দেশীয় ইসলামী সংস্কৃতিতে চিড় ধরলো। পাশ্চাত্যবাদের সাথে সাথে এখন এদেশের কিছু মুসলমানের কাছে স্থানীয় শিরকীয় মতবাদ ও কার্যকলাপ তথা মুশরিকী সংস্কৃতি খারাপ মনে হচ্ছিল না। ইকবালের ভাষায় ঃ

"অপ্রিয় ছিল যা ধীরে ধীরে তাই হলো প্রিয়।
হায় ! ক্ষমতাহীন কেমন হরমের জ্ঞানবানরা।"

বিগত পঁয়তাল্লিশ বছর থেকে আমরা ইংরেজের শাসনমুক্ত হয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদী নিগড়ের বাইরে অবস্থান করছি। কিন্তু আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের বিপর্যয় ও অবক্ষয় বেড়েই চলেছে। দেশের মুক্ত ও স্বাধীন পরিবেশে নিজেদের সাংস্কৃতিক জীবনকে পুরোপুরি ইসলামী ধারায় পুনরগঠিত করতে আমরা আর সক্ষম হইনি। বরং সামনের দিকে এগিয়ে যাবার তুলনায় পিছনের দিকে অনেকটা সরে এসেছি।

আমাদের এই সাংস্কৃতিক অধোগতির মূল কারণ হচ্ছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। দেড়শ' বছর থেকে ইংরেজের তৈরী করা মুশরিকী ও সংশয়বাদী শিক্ষা ব্যবস্থাকেই আমরা আঁকড়ে ধরে আছি। স্বাধীন দেশের স্বাধীন জাতির মর্যাদাসম্পন্ন কোনো শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টাই আমরা চালাইনি। ফলে আমাদের শিক্ষা যন্ত্র ও শিক্ষা কারখানাগুলো থেকে বিপুল সংখ্যক অস্ত্র ও সৈনিক বের হয়ে এখন আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক চেতনা ও কর্মকাণ্ডকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

চতুরদিকে বহু পরিবর্তন

বিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়েছে। মূল্যবোধ পাল্টে যাচ্ছে। কর্মকাণ্ড ভিন্নপথ ধরেছে। বুদ্ধির ছিদ্রপথে নাস্তিক্যবাদের কথা প্রচারিত হবার সুযোগ পাচ্ছে। মুসলমান কাজেকর্মে অমুসলমানদের মতো, নিজেকে মুসলমান হিসেবে জাহির করতেও লজ্জা পাচ্ছে। এ হচ্ছে আমাদের সমাজের এক দিকের চিত্র।

অন্যদিকে আবার নতুন জাগরণ। যেন দীর্ঘ ঘুম থেকে জেগে ওঠা। সাত সাগরের মাঝির প্রাণঢালা আকুতি 'তবু জাগলে না' 'তবু তুমি জাগলে না' যেন দুয়ারে দুয়ারে আঘাত হেনে 'নিঃসীম শর্বরী'কে সীমান্তে পৌঁছে দিয়েছে। জাগরণ শুধু এদেশে নয়, সারা পৃথিবীতে। একদিকে ইসলামী মূল্যবোধ যেমন এ জাগরণে প্রেরণা যুগিয়েছে, তেমনি অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী মুশরিকী সভ্যতার সবচেয়ে বড় প্রাচীর পাশ্চাত্য জীবনবোধে বিপুল ধ্বসও এর পথ প্রশস্ত করেছে।

এ অবস্থায় আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে সূচিত হচ্ছে নতুন দিগন্ত। বিগত দু তিন শ বছর আমাদের জীবনকে অনেক ওলট পালট করে দিয়ে গেছে। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে অনেক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। আমাদের ঘরের মধ্যে অনেক বাইরের জিনিস পৌঁছে গেছে। আমাদের ঘরের অনেক জিনিস আমাদের কাছে অপরিচিত হয়ে গেছে। সময়ের পরিবর্তন ও পরিবেশের ভিন্ন রূপ ধারণ সমস্যাকে আমাদের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে নতুন আকারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরোধানের হাজার বারো শ বছরের মধ্যে এ ধরনের বড় রকমের পরিবর্তন আর আসেনি।

আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এখন অনেকগুলো সমস্যা আসছে। ভিন্ন জাতির যে আচরণগুলো আমরা কোনোদিন গ্রহণ করিনি আজ সেগুলো আমাদের আপন গৃহে ঠাঁই নিয়েছে। যেগুলোকে আমরা এড়িয়ে চলতাম সেগুলো নিয়ে আমরা মেতে উঠেছি। সবদিক বিবেচনা করলে এক কথায় বলা যায় আমাদের যেন ভিন্ন জন্ম। যা আগামী দিনের সূর্যোদয়ের মতো সত্য তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। আবার তাকে কেটে বাদ দেয়ার মতো বোকামিও

আর নেই। তাই এ ব্যাপারে আমাদের যথার্থ বাস্তববাদী হতে হবে। ইসলামের মূলনীতির ভিত্তিতে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের পুনরগঠনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কোনোটা বাইর থেকে এসেছে বলেই তাকে দূর করে দেয়া ইসলামের নীতি নয়। বাইরেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। কাজেই বাইরের জিনিসটা হাজার বছর আগে যেমনটা ছিল আজ আর তেমনটা নেই। কবিতা শুধু তোশামুদী প্রশংসা ও মিথ্যা নিন্দাবাদ নয় বরং উন্নত মানবিক জীবন দর্শন। নাটক নিছক বড় লোকের চিত্ত বিনোদন নয়, আদর্শ প্রচার ও সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ারও। গান খোদা বিমুখতা ও যৌন কামনার উচ্ছ্বসিত আবেগ নয়, তওহীদের মর্মমূলে পৌছার একটি রুচিশীল আবেদনও। এগুলো থেকে যদি চোখ বন্ধ করে নেয়া হয়, তাহলে আসলে সমস্যার কোন সমাধান হবে না। আর সমস্যার সমাধান না করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াও সম্ভব হবে না।

তবে সবসময় মনে রাখতে হবে, আমাদের একটা নিজস্ব সত্তা, নিজস্ব ধারা ও নিজস্ব মানদণ্ড আছে। এ মানদণ্ডে বিচার করে এ ধারার সাথে সাম স্যশীল করে কোনো কিছুকে আমাদের সত্তায় মিলাতে হবে। এটা খুব সহজ কাজ নয়। এ জন্য গভীর জ্ঞান এবং ইসলাম ও জাগতিক বিষয়াবলী সম্পর্কে প্রচুর পড়াশুনার প্রয়োজন। আগামীর নয়, বর্তমান প্রজন্মকেই এ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

ইসলামী সংস্কৃতি কি ?

ইসলামী জীবন চর্চাই ইসলামী সংস্কৃতি। মুসলমানরা যেভাবে তাদের জীবন গড়ে তোলে ইসলামী সংস্কৃতি ঠিক তেমনি রূপলাভ করে। মুসলমানরা যখন পুরোপুরি ইসলাম তথা ইসলামী বিধান মেনে চলে তখন তারা পূর্ণ ইসলামী জীবন যাপন করে। তখন তাদের সংস্কৃতি পূর্ণ ইসলামী সংস্কৃতি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। মুসলমানরা হাজার অনৈসলামী জীবন যাপন করলেও তারা কখনো পুরোপুরি কাফেরানা বা পুরোপুরি মুশরিকানা জীবন যাপন করতে পারে না। কারণ ঈমান আনার পর যদি তার কর্মের ওপর তা শতকরা এক ভাগও প্রভাব বিস্তার না করে তাহলে বুঝা যায় সে ঈমান আনেনি বরং ঈমান আনার ভান করছে মাত্র। কাজেই মুসলমানদের কর্মের মধ্যে অনেক সময় অনৈসলামী চেহারা দেখা গেলেও তার মধ্যে ইসলামের অংশ থাকে এবং এ অংশ সেখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তাই তাকে মুসলিম বা ইসলামী সংস্কৃতি বলতে বাধা নেই। কিন্তু পুরোপুরি ইসলামী জীবন যাপন বা ইসলামী বিধানের প্রাধান্য অর্থে যে ইসলামী সংস্কৃতি তার সাথে এর তুলনা হয় না। তাই মুসলমানের ঈমান যেমন বাড়ে-কমে এবং ইসলামী জীবন যাপনের ক্ষেত্রে যেমন মাত্রার কমবেশী হয় ঠিক তেমনি ইসলামী সংস্কৃতির মধ্যেও মাত্রার হেরফের থাকা স্বাভাবিক।

ইসলামী সংস্কৃতির সবচেয়ে অনুকূল দিকটি হচ্ছে তার একটি সুস্পষ্ট ও বিশ্বব্যাপী একক চেহারা আছে। এর কারণ তার সুস্পষ্ট ও অপরিবর্তনীয় বিধান। এ বিধানের মধ্যে মতবিরোধের হাজারো সুযোগ ও ক্ষেত্র থাকলেও তা মূলগতভাবে এক কেন্দ্রে একীভূত। কাফেরানা বা মুশরিকানা বিধানের এ সুযোগ নেই। সে বিধান হাজার ভাগে বিভক্ত এবং তার হাজারটি কেন্দ্র। সে সবসময় এককেন্দ্র বিমুখ। পৃথিবীর যে কোনো দেশে, যে কোনো বর্ণের, যে কোনো গোত্রের, যে কোনো ভাষাভাষী একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানকে দেখলে আসসালামু আলাইকুম বলে এগিয়ে আসে। মুহূর্তের আলাপে নিজেদের মধ্যে একাত্মতা ও একান্ত নৈকট্য অনুভব করে। ভাষা, বর্ণ ও গোত্রের পার্থক্য তাদের মধ্যে কোনো ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারে না। অন্য দিকে ভিন্ন বা কাফেরানা-মুশরিকানা সংস্কৃতির দুজন লোকের মধ্যে দেখা হলে তারা নিজেদের মধ্যে কোনো প্রকার একাত্মতা অনুভব তো করেই না বরং দুজন দুজনকে দু মেরুর বাসিন্দা ভাবতে থাকে। এক দেশ ও এক বর্ণ তাদের মধ্যে একাত্মতা সৃষ্টি করতে পারে না। এক ভাষা তাদের মধ্যে একটা সাময়িক

আবেগ সৃষ্টিতে সক্ষম হলেও তার আবেদন একান্ত অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না।

প্রথমে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা যে ইসলামী সমাজের ভিত গড়ে তোলেন তাতে যোগ দেন হযরত যায়েদ ও হযরত আলী। তাঁরা চারজনে একটা নতুন সংস্কৃতির জন্ম দেন। আরবের মুশরিক সমাজের অভ্যন্তরে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান করেও নিজেদেরকে তাঁরা একেবারে আলাদা মনে করতে থাকেন। মুশরিকরা কাবা ঘরে যেতো প্রতিমা পূজা করার জন্য। কিন্তু মুহাম্মদের (স) অনুসারীরা কাবা ঘরে গেলেও প্রতিমা পূজা করতেন না। প্রতিমাগুলোর প্রতি কোনো প্রকার শ্রদ্ধাবোধ তাদের মনে জাগতো না। বরং উলটা মূর্তিগুলোকে তাঁরা সামান্য মাটির পুতুল এবং ক্ষমতাহীন জড় পদার্থ মনে করতেন। মুশরিকদের সমাজে তাঁরা চলাফেরা করতেন কিন্তু মানুষের প্রতি একটা মমত্ববোধ তাঁদের মধ্যে জেগে উঠতো। মুশরিকরা যেমন একে অন্যের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করতো তেমনটি তাঁদের মধ্যে ছিল না। তাঁরা সকল মানুষকে সমান চোখে দেখতেন। কাউকে ছোট বড় মনে করতেন না। আভিজাত্য বোধের ধারণা তাঁদের মধ্য থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অথচ কাফের সমাজের ভিতটিই আভিজাত্যবোধ ও ছোট বড়র মর্যাদার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এজন্য মর্যাদাশালীরা অহংকার করতো। কিন্তু শ্রেষ্ঠ হাশেমী পরিবারের নবী মুহাম্মদ (স) ও আলী (রা) এবং আর এক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আরব পরিবারের মেয়ে খাদীজা (রা) নিজেদের ও তাঁদের গোলাম যায়েদের (রা) মধ্যে কেনো পার্থক্য অনুভব করতেন না। তাঁরা মনে করতেন মানুষের মর্যাদা মানুষের কাছে নয়, আল্লাহর কাছে। আর আল্লাহর কাছে মর্যাদা লাভ করতে হলে আল্লাহর হুকুম পুরোপুরি মেনে চলতে হবে।

মুশরিকরা ঘরে-বাইরে, পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, অন্যায়-অত্যাচার করতো। দুর্বলের ওপর জুলুম করতো। সুযোগ পেলে মানুষকে ঠকাতো। মিথ্যা বলা ও প্রতারণা করাকে বুদ্ধিমানের পরিচয় মনে করতো। বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীকে বোকামী মনে করতো। কিন্তু এই নতুন মুসলিম সমাজের সদস্যবৃন্দ সব ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি অবলম্বন করতেন। মানুষকে ঠকানো ও এতিমদের সম্পদ গ্রাস করাকে তাঁরা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জুলুম মনে করতেন। আমানতদারী ছিল তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট।

মুশরিকদের সংস্কৃতি থেকে মক্কায় এভাবে মুসলিমদের পৃথক সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে ওঠে। এমনি তাঁরা সব ব্যাপারে নিজেদের সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা

লুকিয়ে রাখতে পারতেন। কারণ এসবগুলোই মানবিক শ্রেষ্ঠ ও উন্নত গুণাবলী হিসেবে চিহ্নিত। মানুষ হিসেবে মানুষ এগুলোর কদর করতে অভ্যস্ত। যতদিন তাঁরা প্রকাশ্যে আল্লাহর ইবাদত করেননি ততদিন তাঁদের অন্যান্য চারিত্রিক গুণাবলী জনসমক্ষে নন্দিত হয়েছে। কিন্তু যখনই তাঁরা কাবাঘরে এসে মূর্তি পূজার পরিবর্তে আল্লাহর ইবাদত করেছেন এবং নামায পড়েছেন তখনই চোখে সুস্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে। মুশরিকরা বুঝতে পেরেছে এটা তাদের সংস্কৃতির উন্নত অবস্থা নয় বরং এটা ভিন্ন একটা সংস্কৃতির রূপ, যার ভিত্তি হচ্ছে তওহীদবাদ। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলাম ও কুফরীর মধ্যে সুস্পষ্ট ও স্থূল পার্থক্য উল্লেখ করে বলেন—ইসলাম ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায। নামায এসেই মুসলিম ও মুশরিকী সংস্কৃতির মধ্যে একটা স্থূল পার্থক্য রেখা চিহ্নিত করে দিয়েছে।

মক্কা থেকে মদীনার মুক্ত পরিবেশে এসে ইসলামী সংস্কৃতি দ্রুত বিকাশ লাভ করে। এখানে নামায পড়ার জন্য মসজিদ নির্মাণ করা হয়। নামাযের জামাত কায়েম করা হয়। জামাতে শামিল হবার জন্য লোকদেরকে আহ্বান করা হতে থাকে। এ জন্য আযানের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়। আযান দেবার পরে চতুরদিক থেকে লোকেরা মসজিদের দিকে আসতে থাকে। নামায শেষ করে সবাই যার যার কাজে চলে যেতে থাকে। আবার নামাযের সময় মসজিদে মিলিত হতে থাকে। এভাবে দিনেরাতে পাঁচবার মসজিদের সাথে তাদের সম্পর্ক কায়েম হয়। দিনরাতের সমস্ত কাজের প্রেরণা নামায থেকে লাভ করতে থাকে এবং মসজিদ হয়ে ওঠে তাদের এ প্রেরণার কেন্দ্রস্থল।

নামাযকে ভিত্তি করে তাদের মধ্যে আরও একটা জিনিস গড়ে ওঠে। সেটা হচ্ছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতাবোধ। নামায পড়ার জন্য অযু করতে হয়, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়, শরীর পাক-পবিত্র রাখতে হয় এবং যেখানে নামায পড়া হয় সে জায়গা পরিষ্কার ও পাক-পবিত্র রাখতে হয়, তাই একজন মুসলমানের মধ্যে সার্বিক পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতাবোধ জাগে। দিনরাত পাঁচবার নামায পড়ার জন্য তাকে প্রায় সর্বক্ষণ পরিচ্ছন্ন ও পাক-পবিত্র থাকতে হয়। পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাবোধের সাথে সাথে নামাযকে ঘিরে তাদের মধ্যে আরও একটা বোধও গড়ে ওঠে। সেটা হচ্ছে রুচিশীলতা ও সৌন্দর্যবোধ। কুরআনই এ ব্যাপারে তাদেরকে তাগিদ দিচ্ছে : يَابَنِىٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ "হে আদম সন্তানগণ! তোমরা প্রত্যেক নামাযে সুন্দর পোশাক পরিধান করে এসো।" এ নির্দেশ প্রত্যেক মুসলমানকে সৌন্দর্য চর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছে। অবশ্য এর মোকাবিলায় সুফীবাদী দর্শনের একটি ধারায়

অপরিচ্ছন্ন পোশাক ধারণ করার মধ্যে অহংকার নির্মূল ও আল্লাহর কাছে নিজেকে দীন-হীন হিসেবে প্রকাশ করার ধারণা পেশ করা হয়েছে। মুষ্টিমেয় একদল সুফী ও তাঁদের অনুসারীরা এ দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু সাধারণ মুসলমান ও বৃহত্তর মুসলিম গোষ্ঠী, কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্যের মোকাবিলায় এ সুফী দর্শনকে মোটেই গুরুত্ব দেয়নি। কাজেই স্বাভাবিকভাবে মুসলিম সমাজে সৌন্দর্য চর্চা বিকাশ লাভ করেছে।

মদীনার মুশরিক সমাজ থেকে মুসলমানদের মধ্যে খাদ্য ও রুজি-রোজগারের মধ্যে একটা পার্থক্য বোধ জেগে ওঠে। কুরআন কিছু খাদ্যবস্তুকে হারাম গণ্য করে। কাফেরদের মধ্যেও তার অনেকগুলো খারাপ বিবেচিত হতো। কিন্তু এরপরও তারা সেগুলো ব্যবহার করতো। ইসলাম এ হারাম বস্তুগুলোর ব্যবসা এবং কেনাবেচা করাও হারাম গণ্য করে। এছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল হারামের সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্ধারণ করে। এভাবে মুসলমানদের একটা পৃথক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। মুসলমানদের অর্থনৈতিক আচরণবিধি তাদের সাংস্কৃতিক বিনির্মাণে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে।

কাফের ও মুশরিকরা ইচ্ছামতো পশু হত্যা করে তাকে আহার্য সামগ্রীতে পরিণত করে এবং তা রান্না করার পর ইচ্ছামতো খেয়ে উদর পূর্তি করে। কিন্তু একজন মুসলিম বিসমিল্লাহ বলে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে পশু যবেহ করে। আহার করার সময়ও আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে এবং আহার শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলে আল্লাহর প্রশংসা করে। এভাবে আহারের ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে একটা পৃথক সাংস্কৃতিক ধারার জন্ম হয়।

মদীনায় মুসলমানরা নারী-পুরুষের যে সমাজ গঠন করলো পার্শ্ববর্তী মুশরিকদের সমাজ থেকে তার পার্থক্য পরিষ্কারভাবে দেখা গেলো। মুশরিকদের সমাজে পুরুষরা ছিল সমাজের সর্বময় কর্তা। নারীরা ছিল তাদের দাসী। নারীদের কোনো সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার ছিল না। তারা ঘর-সংসারে গতর খাটাতো। স্বামীর মনোরঞ্জন করতো। পান থেকে চুন খসলেই বেদম মার খেতো। যেন কেনা বাঁদী। বরং তার চেয়ে বেশী। কারণ বাঁদীর তবুও তো একটা স্বত্ব আছে। কিন্তু মুশরিকদের গৃহে স্ত্রী-কন্যার কোনো স্বত্বই ছিল না। পুরুষদের মজলিসে মেয়েরা শরাব বিতরণ করতো এবং নৃত্য করে তাদের মনোরঞ্জন করতো। আর কন্যা সন্তানদের জীবন্ত পুঁতে ফেলার একটা রেওয়াজই তো সমাজে গড়ে উঠেছিল।

এর পাশাপাশি মুসলিম সমাজের মেয়েরা পুরুষের সমান অধিকার লাভ করলো। اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ 'পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশালী' –কুরআনের এ বিধানের ভিত্তিতে পুরুষদেরকে নারীদের ওপর কর্তৃত্ব দান করা হলেও পুরুষদের এ কর্তৃত্ব নারীদের অধিকার ক্ষুণ্ন করেনি। বরং নারী অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তার সহায়ক হয়েছে। মেয়েরা পুরুষদের মতো ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য মসজিদে যাবার অধিকার লাভ করে। রসূলের দরবারে গিয়ে তারা পুরুষদের মতোই জ্ঞানান্বেষণ ও জ্ঞানালোচনা করতে থাকে। প্রয়োজনে তারা বাইরে বের হয়ে অর্থনৈতিক কাজকারবারও করতে থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মেয়েদের পোশাকে একটা বিশিষ্টতা সৃষ্টি করা হয়। বাইরে বের হবার সময় তাদের শরীরের যে অংশটুকু অনাবৃত রাখার একান্ত প্রয়োজন (ইল্লা মা যাহারা মিনহা) অর্থাৎ হাতের কব্জি থেকে সামনের অংশটুকু, পায়ের গাঁট থেকে নিচের অংশটুকু এবং দু চোখ, নাক, মুখসহ চেহারা—এটুকু ছাড়া বাকি সারা শরীর আবৃত করতে হবে। অন্যদিকে কাফের ও মুশরিকদের মেয়েরা পুরুষদের চাইতেও শরীরের বেশী অংশ খোলা রাখতো। শারীরিক আকর্ষণেই তারা পুরুষদের কাছে বেশী লোভনীয় হয়ে উঠতো। অধিকার প্রতিষ্ঠা ও অধিকার আদায়ের পরিবর্তে তারা বেচাকেনার সামগ্রীতে পরিণত হতো।

এছাড়া মদীনার ইসলামী সমাজ মেয়েদের অবস্থান আরো সুস্পষ্ট করে তুললো মেয়েদের ও পুরুষদের অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয়ের মাধ্যমে। ইসলাম মানুষের কর্ম জগতকে দু ভাগে ভাগ করলো। গৃহ ও বাইরের কর্মক্ষেত্র। মেয়েদেরকে গৃহে ঠাঁই দিল। অর্থোপার্জনের জন্য পুরুষদেরকে ঠেলে দিল বাইরের জগতে। প্রয়োজনে পুরুষরা গৃহের কাজও করবে এবং মেয়েরা করতে পারবে বাইরের কাজও। কিন্তু মেয়েদের মূল কর্মস্থল হলো গৃহ। নারীত্বের আসল পরিচর্যা ও বিকাশ হয় গৃহে। বাইরে পুরুষের কর্মস্থলে নারীত্বের বিকাশ হয় না। বরং নারীত্ব হয় বিধ্বস্ত। এভাবে নারীদের কর্মস্থল চিহ্নিত হয়ে যাওয়ায় মদীনার ইসলামী সমাজে একটি পবিত্র ও প্রশান্ত জীবন ধারার উন্মেষ ঘটে। এ জীবন ধারায় নারী পুরুষের দাসী না হয়ে হয় তার যথার্থ জীবন সাথি। নিজের পূর্ণ অধিকার লাভ করে নিজের সত্তার পূর্ণ বিকাশ সাধনেও সে সক্ষম হয়। এভাবে সামাজিক ক্ষেত্রে ইসলাম একটি শান্ত-স্নিগ্ধ-পবিত্র সংস্কৃতির জন্ম দেয়, যা মুশরিক সমাজে ছিল অকল্পনীয়।

ইসলামী সংস্কৃতির এ পৃথক ধারাটি মদীনাতুর রসূল থেকে উৎসারিত হয়ে রসূলের ইন্তিকালের পর সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমানরা যেখানেই যায় সেখানেই ইসলামী সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত হয়। মুসলমানরা বিভিন্ন দেশে

গিয়ে ইসলাম প্রচার করে এবং পারিবারিক জীবনধারা গড়ে তোলে। বিভিন্ন দেশের স্থানীয় সংস্কৃতিতে প্রভাব বিস্তার করে। তাদের সাংস্কৃতিক জীবন থেকেও অনেক কিছু গ্রহণ করে। কিন্তু চৌদ্দশ বছর পরেও একটা বিষয় সুস্পষ্ট যে, দুনিয়ার কোনো দেশে মুসলমানরা স্থানীয় সংস্কৃতি থেকে শিরকীয় আকীদা ও হারাম ভিত্তিক কোনো কিছু গ্রহণ করে তার ওপর সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। নিজেদের সাংস্কৃতিক জীবনে শিরকীয় ও হারাম জাতীয় কোনো আচরণ ও কর্মকাণ্ডের অনুপ্রবেশের পর মুসলমানরা সবসময় অস্থির ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছে। একদল মুসলমান সবসময় তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে।

আজকের বিশ্বে আমরা দেখি ইসলাম গ্রহণের পর একজন নওমুসলিম সবচেয়ে বেশী তৎপর হয় ইসলামী সাংস্কৃতিক জীবন যাপনের জন্য। অর্থাৎ ইসলাম এমন একটি জীবন বিধান যা একটি পৃথক সাংস্কৃতিক জীবনধারার জন্ম দেয়। বিগত চৌদ্দশ বছর ধরে ইসলাম সারা বিশ্বে তার এ সংস্কৃতির প্রসার ঘটিয়েছে। আজো এ ধারা অব্যাহত আছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও অগ্রগতির সাথে সাথে জীবন উপকরণের মধ্যে অনেক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। অনেক নতুন নতুন উপকরণ সেখানে সংযোজিত হচ্ছে। পুরানো অনেক কিছু বাদ যাচ্ছে। ইসলাম সেখানে পিছিয়ে থাকছে না। তার তওহীদ বিশ্বাস ও হালাল-হারামের মানদণ্ডের ভিত্তিতে যাচাই করে সে গ্রহণীয়গুলোকে গ্রহণ করছে এবং বর্জনীয়গুলোকে বর্জন করে চলছে। এরপরও অনেকগুলো বিতর্কের উদ্ভব হচ্ছে। হয়তো এ বিতর্কের পেছনে রয়েছে আরো ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করার দাবী। অথবা এখনো নতুন বিষয়গুলোকে সঠিকভাবে উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ করা হয়নি। এ কারণে এ বিতর্ক। তবে একথা সুস্পষ্ট যে, মুসলিম মিল্লাত কখনো একযোগে প্রকাশ্য শিরকে লিপ্ত হবে না। কাজেই ইসলামী সংস্কৃতি তার শিরক বিরোধী যথার্থ রূপ থেকে কখনো দূরে অবস্থান করবে না।

ইসলামী সংস্কৃতির সংকট

দুনিয়ায় মানুষের পুনরজন্ম হয় না, পুনরাবির্ভাব হয়। একজন লোক বহু দূর দেশে চলে গিয়েছিল। অনেক দিন অনেক বছর তার কোনো খোঁজ-খবর ছিল না। সবাই ধরে নিয়েছিল সে মারা গেছে। এত দীর্ঘকাল একজন লোক নিখোঁজ থাকতে পারে না। সে যখন বিদেশ গিয়েছিল তখন তার ছেলেটি ছিল ৩ বছরের শিশু। এখন সেদিনকার সেই ছেলেটিই ষাট বছরের বৃদ্ধ। চুল-দাড়ি সাদা হয়ে গিয়ে তার চেহারাই ভিন্নরূপ নিয়েছে। এমন সময় যুদ্ধে হারানো সৈনিকের মতো তার বাপ যদি ফিরে আসে তাহলে কেমন হয়?

বিশ্বের উন্মুক্ত দৃশ্যপটে বর্তমানে ইসলামের ফিরে আসাটা ঠিক এমনি ধরনের একটি ঘটনা হলেও আমরা ইসলামকে আশি বছরের একটি বৃদ্ধের সাথে তুলনা করতে পারছি না। বরং সত্য আদর্শ ও মতবাদ সবসময় জীবন্ত, সবল, প্রাণশক্তিতে ভরপুর একটি যৌবনদীপ্ত পুরুষের মতো। ইসলাম এমন একটি মতবাদ, দীন ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা যা মানুষের পৃথিবীতে পদার্পণের প্রথম দিন থেকে মানুষের সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে আসছে। কখনো পিছিয়ে গেলেও আবার এগিয়ে আসে। নিজের নির্দিষ্ট আসনে বসে। বিরোধী পক্ষ আসে এবং যায়। তাদের হাজারটি চেহারা। কিন্তু ইসলাম যখনই আসে তখনই তাদের সবাইকে সরে যেতে হয়। তারা সবাই মিলেও শেষ রক্ষা করতে পারে না। একথা কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে: قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا –'ওদেরকে বলে দাও, হক এসে গেছে এবং বাতিল বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অবশ্য বাতিল বিলুপ্ত হয়েই থাকে।'

ইসলামের ভিতরে আসা। মানে ছবির পরদায় ধীরে ধীরে ইসলামের চেহারা ভেসে উঠছে। ষাট বছর আগে যে লোকটি হারিয়ে গিয়েছিল সে যেমন পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, শুধুমাত্র পরিচিত জনদের দৃষ্টির আগোচরে চলে গিয়েছিল, ঠিক তেমনি আজকে যে ইসলামের পুনরাবির্ভাব ঘটছে সেও কোনো নতুন ইসলাম নয়। বরং সেই চিরন্তন ন্যায়নিষ্ঠ, সুন্দর, সূচি-স্নিগ্ধ জীবনধারা আজ আবার নতুন আংগিকে ফিরে আসছে। ইসলাম এ দুনিয়ার বুকে বিরাজিত ছিল। মুসলিম সমাজ চৌদ্দশ বছর ধরে জীবন চর্চা করে আসছে। কিন্তু মুসলিম সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত ছিল না। এখনো আমাদের সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই। আমাদের জীবনে ইসলামের প্রচলন

আংশিক। এই অবস্থার মধ্যে আমরা যে সাংস্কৃতিক জীবন যাপন করছি তার সমস্যাবলী আমাদের আজকের আলোচ্য।

আমাদের আজকের সাংস্কৃতিক মূল সমস্যাকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি। এর একটি হচ্ছে বিদআত এবং অপরটি অপসংস্কৃতি। একটি আভ্যন্তরীণ এবং অন্যটি বাইরের।

ইসলামের মৌল উপাদান থেকে আমরা যখনই বিচ্যুত হয়েছি তখনই আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বিদআত। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, কুরআন ও সুন্নাহর পরিসরের বাইরে গিয়ে কুরআন ও সুন্নাহর নামে শরীয়ত ও ইবাদত হিসাবে যাকিছু তৈরী করা হয় এবং ইবাদত ও শরীয়তের মর্যাদা দিয়ে যাকে মেনে চলা হয় তা-ই বিদআত। কারণ ইবাদত আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স) নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তার বাইরে আর কিছুই ইবাদত নয়। আল্লাহ ও রসূলের (স) নির্দিষ্ট করা ছাড়া যে কোনো কৃচ্ছ্র সাধনা, যাগ-যজ্ঞ, চিল্লাকাশি ইত্যাদি বিদআত ছাড়া আর কিছুই নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "লা রাহবানীয়্যাতা ফিল ইসলাম"–ইসলামে কোনো যোগবাদ নেই। রাহিব বলা হয় খৃষ্টবাদী যোগীকে—কৃচ্ছ্র সাধনা, তপস্যা, ধ্যান-মগ্নতা ইত্যাদি সহ শারীরিক কষ্ট ও ক্লেশের মাধ্যমে যিনি ইবাদতের কঠিন পথ অবলম্বন করেন। ইবাদতের জন্য এহেন কঠিন পথ অবলম্বনের কোনো সুযোগ ইসলামে নেই। রসূল, সাহাবা ও তাবেঈদের যুগ থেকে যতই দূরত্ব বাড়তে থাকে ততই একদল লোকের ইবাদতের জন্য কঠিনতর পথ অবলম্বনের স্পৃহা বাড়তে থাকে। কঠিনতর পথ অবলম্বন যেমন এক প্রান্তিকতা তেমনি সহজতর তথা লোক দেখানো আনুষ্ঠানিকতা অবলম্বনের আর এক প্রান্তিকতার প্রবণতাও দেখা দেয়। এভাবে ভিন্ন ধর্মের নানান আনুষ্ঠানিকতা ও রসম রেওয়াজও মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। অথচ ইসলাম একটি আনুষ্ঠানিকতা বিহীন এবং মধ্যপন্থী সাদামাটা ইবাদতের প্রচলন করেছে।

আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝ قُمِ الَّيْلَ اِلاَّ قَلِيْلاً ۝ نِّصْفَهُ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلاً ۝ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً ۝ (المزمل : ١-٤)

'হে বস্ত্র আচ্ছাদিত ব্যক্তি ! রাত্রি জাগরণ করো তার কিছু অংশ ছাড়া, অর্ধেক রাত বা তার কম অথবা তার চেয়ে বেশী। আর কুরআন আবৃত্তি করো ধীরে ধীরে, থেমে থেমে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে।'

–(সূরা আল মুযযামমিল ঃ ১-৪)

সারা রাত জেগে জেগে ইবাদত করাকে সমর্থন করা হয়নি। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ط ـ

'তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাতকে তোমাদের বিশ্রামের জন্য এবং দিবসকে দেখার জন্য ......।' [সূরা ইউনুস : ৬৭]

অন্যত্র বলা হয়েছে :

وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝ وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۝ وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝

'আমি তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম, রাত্রিকে করেছি আবরণ এবং দিবসকে করেছি জীবিকা আহরণের সময়।'–(সূরা আন নাবা : ৯-১১)

এ আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়, রাতে বিশ্রাম করতে হবে। ঘুমাতে হবে। তার কিছু অংশে ইবাদত বন্দেগী করা যায়। সারা রাত জেগে জেগে ইবাদত বন্দেগী করার মতো কৃচ্ছ্র সাধনাকে ইসলাম সমর্থন করেনি। এই সংগে কুরআন পাঠ করতে বলা হয়েছে থেমে থেমে, স্পষ্ট করে। কিন্তু রেলগাড়ির মতো হড়হড় করে চালিয়ে দিয়ে এক রাতে "শাবীনা' খতমের মাধ্যমে কুরআন খতম করা ইসলামী সংস্কৃতি নয়।

এছাড়া ইসলাম বড়দেরকে সম্মান করতে বলেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের বড়দের সম্মান করে না এবং আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।' এর ভিত্তিতে মুখে আসসালামু আলাইকুম না বলে যদি ছোটরা বড়দের সামনে নত হয়ে তাদের পদধূলি নেবার বা কদমবুসি তথা পদচুম্বন করার প্রচেষ্টা চালায় তাহলে একে ইসলামী সংস্কৃতি বলা যাবে না। বরং মানুষের সামনে নত হওয়ার ভিত্তিতে একে ইসলামী ভাবধারা বিরোধী আখ্যায়িত করা হবে। বিশেষ করে আমাদের দেশে যেখানে ব্রাহ্মণদের পদধূলি নেবার রেওয়াজ প্রচলিত রয়েছে সেখানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা শিরকের পর্যায়ে পৌঁছতে পারে।

অন্যদিকে শরীয়ত কুরআন-সুন্নাহ বিধৃত ও তার সাথে সম্পর্কিত এবং তার মৌল চেতনা বিরোধী নয়, এমন বিধানের নাম। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশের সাথে সাথে ইজতিহাদকে শরীয়তের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে এই অর্থে যে, তা কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী হবে, তার বিরোধী নয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তীকালের মুজতাহিদগণ এ ধারায় ইজতিহাদ করে এসেছেন। কিন্তু দঈফ

(দুর্বল) ও মওদু (বানোয়াট) হাদীসের ভিত্তিতে অনেক ক্ষেত্রে শরীয়তের মধ্যে বিদআতের স্থান সংকুলান করা হয়েছে। এভাবে শরীয়ত ও ইবাদতের নামে অনেক বিদআতের অনুপ্রবেশ ইসলামে ঘটেছে। শরীয়ত একটি সচল প্রতিষ্ঠান। কুরআন ও সুন্নাহ এবং তার আলোকে ইজতিহাদের ভিত্তিতে এ প্রতিষ্ঠান সর্বক্ষণ গতিশীল থাকে। কিন্তু এর বাইরে গেলেই এর কর্মকাণ্ড বিদআতে পরিণত হয়। মুসলমানরা কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিধান বিরোধী বা এর ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত ইজতিহাদ বিরোধী কোনো কিছু গ্রহণ করলে তাকে ইসলামী সংস্কৃতির অন্তরভুক্ত করা যাবে না।

তাছাড়া ইজতিহাদ ব্যাহত হবার ফলে শরীয়তের গতিশীলতা যখন ব্যাহত হয়ে যায় তখন প্রবহমান স্রোতধারা থেমে গেলে স্থির পানিরাশির তলায় যেমন ময়লা জমে ওঠে ঠিক তেমনি তাকলীদ বা অন্ধ অনুসৃতির পথ ধরে শরীয়তও অনেক বিদআত বক্ষে ধারণ করে। পরবর্তীকালে এই বিদআতগুলোকে ভিত্তি করে নানান ফিরকাবন্দির উদ্ভব হয়। অথচ এ ফিরকাবন্দির মধ্যে যথার্থ ইসলামী সংস্কৃতির হয়তো সামান্য অংশই পাওয়া যাবে। নিসন্দেহে সেখানে কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং তার মৌল ভাবধারার বিরোধী নয় এমন বিষয়গুলোই কেবল ইসলামী সংস্কৃতির অংশ হতে পারে। এভাবে গত চৌদ্দশ বছর ধরে সারা বিশ্বে মুসলমানরা যে শরীয়তী জীবন যাপন করছে তার মধ্যে বিদআত আভ্যন্তরীণ সংকট সৃষ্টি করেছে।

বাইর থেকে ইসলামী সংস্কৃতি যে সংকটের সম্মুখীন হয়েছে তাকে আমরা এক কথায় অপসংস্কৃতি বলে চিহ্নিত করতে পারি। এই অপসংস্কৃতি হচ্ছে মুশরিকানা ও কুফরী সংস্কৃতি। বিদআতী সংস্কৃতি ও এই মুশরিকানা সংস্কৃতির মধ্যে ফারাকটা হচ্ছে এই যে, বিদআতী সংস্কৃতি যুক্তি উপস্থাপন করে ইসলাম থেকে কিন্তু তা ব্যবহৃত হয় ইসলামের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে মুশরিকানা সংস্কৃতি যুক্তি পেশ করে ইসলাম বিরোধী ক্ষেত্র থেকে এবং তার ব্যবহার হয় ইসলামের ও মুসলমানের বিরুদ্ধে। ইসলামী সংস্কৃতির মধ্যে বিদআতী সংস্কৃতির উদ্ভব না হলে অপসংস্কৃতির কোনো প্রভাবই তার ওপর পড়তো না। বিদআতী সংস্কৃতি যখন ইসলামী সংস্কৃতির মূল্যবোধে ফাটল ধরিয়েছে, তখন সেই ফাটলের মধ্য দিয়ে অপসংস্কৃতি অনুপ্রবেশের সুযোগ লাভ করেছে। ইসলামী সংস্কৃতির মূলে রয়েছে মুমিনের আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। মুসলমানের এ বিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়লে সেখানে শিরক ছায়াপাত করে।

বিদআতী সংস্কৃতি যেখানে ইসলামী মূল্যবোধকে ভিত্তি করে এগিয়ে চলে সেখানে অপসংস্কৃতি ভিন্ন এক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। অপসংস্কৃতির এ মূল্যবোধকে

আমরা গ্রহণ না করলে তার মধ্যে এমন শক্তি নেই যে, সে ইসলামী ও মুসলিম সমাজে এক কদম এগিয়ে যেতে পারে।

আমাদের দেশে যে মুশরিকী সংস্কৃতির সাথে আমরা পাশাপাশি অবস্থান করে আসছি তার একটা বিশেষ শক্তি হচ্ছে রক্ষণশীলতা। শামুকের মতো নিজের খোলের মধ্যে সে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে হাজার হাজার বছর থেকে। অন্যদিকে ইসলামী জীবনধারা হচ্ছে গতিশীল। এ গতিশীলতা যখনই কমে গেছে বা স্তব্ধ হয়ে গেছে তখনই দেশীয় মুশরিকী সংস্কৃতির রক্ষণশীলতা তাকে প্রভাবিত করেছে। এভাবে স্থানীয় অপসংস্কৃতি আমাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ লাভ করেছে। অন্যদিকে বিদেশাগত মুশরিকী সংস্কৃতি দ্বারা আমরা প্রভাবিত হয়েছি রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রের কলাকৌশলে। বিদেশী ও বিজাতির শাসন তাদের সংস্কৃতিকেও আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। অন্য কথায় বলা যায়, আমরা না চাইলেও তাদের সংস্কৃতির অক্টোপাস বন্ধনে আমাদের জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। প্রথমত আমরা দুশ বছর তাদের গোলামী করেছি। তাদের হুকুম মতো কাজ করেছি। দ্বিতীয়ত তারা একটা শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করে সেটা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। সেই শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করে আমরা নিজেরা ধন্য হয়েছি এবং শিক্ষিত হতে পেরেছি বলে গর্ব করছি। তৃতীয়ত তারা নিজেদের সাহিত্য ধারাকে আমাদের দেশে পরিচিত করিয়ে দিয়েছে। এ সাহিত্য ধারার শ্রেষ্ঠত্ব সমগ্র বিশ্বে স্বীকৃতিলাভ করেছে। আমাদের সাহিত্য এ সাহিত্য ধারার কাছে শিক্ষানবিশী করেছে। চতুর্থত তাদের প্রাধান্যের আওতায় তাদের সাথে আমাদের সুদীর্ঘ সহাবস্থান এবং বিয়ে-শাদীর মাধ্যমে প্রভু কন্যা ও প্রভু ললনানাদের ভৃত্যের অন্তঃপুরে প্রবেশ ভৃত্যের জীবনকে ধন্য করে দিয়েছে। বিশেষ করে প্রভুর বিদায়ের পর ভৃত্য যখন তার উত্তরাধিকার লাভ করেছে তখন প্রভুর রেখে যাওয়া প্রত্যেকটি চিহ্নকে আঁকড়ে ধরে সে নিজেকে প্রভু হিসাবে টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়েছে। কারণ তার আজকের প্রভুত্ব লাভের পেছনে তার নিজের যোগ্যতার তুলনায় তার প্রভুর নেক নজরই বেশী অবদান রেখেছে। তার জাতীয় আদর্শ, ঐতিহ্য, ভাবধারা ও চেতনার তুলনায় প্রভুর প্রতি আনুগত্যই তার নতুন প্রভু হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। এজন্য আমরা ইংরেজ শাসনামলের তুলনায় ইংরেজদের বিদায়ের পর স্বাধীন মুসলিম শাসকদের আমলে পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতির প্রাধান্য বেশী করে দেখতে পাচ্ছি। এ কারণে আজ আমরা পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতির জোয়ারে ভেসে যাচ্ছি।

সবদিক থেকে আজ শোনা যাচ্ছে অপসংস্কৃতির কথা। অনেক সময় আমার সেই মাতালটার কথা মনে পড়ে যে বলছিল ঃ হ্যাঁ, মদ খাওয়া খুব খারাপ, খবরদার ! কখনো মদ খাবে না। সবাই খবরদার হয়ে আছে। কিন্তু আবার

সবাই অপসংস্কৃতির ঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে চলছে। রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, সিনেমা, প্রচার মাধ্যমগুলোর কথায় এলে দেখা যাবে এখানে অপসংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোনো রাখঢাক নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তো এর লালনক্ষেত্র। শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এর চর্চা করে। এভাবে অপসংস্কৃতির প্রসার সর্বত্র।

তবে আমাদের দেশে অপসংস্কৃতির দুটো দিক। এক দিকে তার প্রতি মোহ আবার অন্যদিকে তার থেকে ক্ষতির আশংকা। বর্তমানে এ দুটো দিককে সঙ্গে নিয়ে আমরা চলছি। এটাই সত্য।

অবশ্য আমি আগেই যে কথা বলতে চেয়েছি তাই আবার স্পষ্ট করে বলবো যে, অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে যদি আমরা সাংস্কৃতিক বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করি তাহলে এ অপসংস্কৃতির বিপদ কাটিয়ে ওঠা আমাদের পক্ষে কঠিন হবে না। ইসলামের প্রতি আমাদের বিশ্বাস যদি শক্তিশালী ও অবিচল হয় তাহলে বাইরের কোনো অপসংস্কৃতি আমাদের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। কুরআনে এ ধরনের ঈমানদার মুমিনের চরিত্র অংকন করে বলা হয়েছে ঃ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا 'আর যখন তারা সম্মুখীন হয় অসার ও অর্থহীন কর্মকাণ্ডের তখন নিজেদের মর্যাদা সহকারে তা পরিহার করে চলে।'−(সূরা আল ফুরকান ঃ ৭২)

এখানে একটি কথা সুস্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন বোধ করছি যে, বিদআতী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য শুনে ইসলামী সংস্কৃতিকে একটি রক্ষণশীল সংস্কৃতি মনে করা ঠিক হবে না। ইসলাম নিজেই যখন একটা রক্ষণশীল জীবন ব্যবস্থা নয় এবং ইজতিহাদ তার মধ্যে গতিশীলতা সৃষ্টি করেছে তখন ইসলামী সংস্কৃতি গতিশীল হবে না কেন ?

বিশ্ব জগতের চিরন্তন সত্য তওহীদ। তওহীদ বিশ্বাস কোনো রক্ষণশীলতা নয়। কারণ এর আগেও কিছু নেই, পরেও কিছু নেই। "হুয়াল আউয়ালু ওয়াল আ-খিরু"−'তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ।' প্রথম ও শেষ শব্দ দুটি শুধুমাত্র আমাদের সীমিত বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে আমাদের বুঝার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। নয়তো মূলত বলতে হয়, তাঁর প্রথমও নেই শেষও নেই। তিনিই তিনি। এহেন বিশ্বাসের ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা ও প্রগতিশীলতার প্রশ্ন ওঠে না। কাজেই ইসলামী সংস্কৃতি যে বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে তা চির প্রগতিশীল ও গতিমান। তার আবর্তন সত্যের চারদিকে। সেখানে অসত্য ও মিথ্যাই বরং প্রগতিশীলতার নামে চিররক্ষণশীল ও চিররুগ্ন। তাই ইসলামী সংস্কৃতিকে এ রক্ষণশীলতা ও রুগ্নতা মুক্ত করতে হবে।

এদেশে ইসলামী সংস্কৃতির শেকড় মজবুত করতে হবে

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি একটা জাতির মৌল প্রাণশক্তি। আপন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে কোনো জাতি বিচ্যুত হয়ে গেলে তার দুর্দশার সীমা থাকে না। ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তার নিজস্ব ধারায় এগিয়ে চলতে হয়। তার চলার একটা স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ গতিও আছে। এ গতি যখন ক্ষুণ্ন এবং এই ধারা যখন ব্যাহত হয় তখন নেমে আসে জাতির জীবনে সাংস্কৃতিক বিপর্যয়।

ঐতিহ্য একটা জাতির পরিচয় বহন করে আর সংস্কৃতি তার পরিচিতিকে বিস্তৃত করে। দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক অতি নিবিড়। তাই দেখা যায় শত শত হাজার হাজার বছর ধরে একটা জাতির মধ্যে একটা ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। এবং জাতি তার সমগ্র প্রাণশক্তি দিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরে থাকে। তার মধ্যে কোন সহজ পরিবর্তন সাধনে সে রাজি হয় না। অন্যদিকে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে জাতির আদর্শ, ঐতিহ্য ও ভাবধারার ভিত্তিতে এবং এরি ভিত্তিতে সে তার মধ্যে যুগোপযোগী পরিবর্তন সাধন করে। এ জাতীয় আদর্শ ঐতিহ্য ভাবধারা বিরোধী কোনো সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ যখন তার মধ্যে স্থান লাভ করে তখন সে সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এভাবে এক সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতির মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এবং এক পর্যায়ে তাকে পরাজিত করতেও সক্ষম হয়। বিশ্বে হাজার হাজার বছর ধরে এভাবেই চলে আসছে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। রাজনৈতিক আগ্রাসান যেমন স্বল্প সময়ের মধ্যে সংঘটিত হয়ে যেতে পারে, সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের পক্ষে তেমনটি সম্ভব নয়। কখনো কখনো শত শত বছর ধরে চলে একটি সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। একটা জাতি সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার হবার পর তার পক্ষে রাজনৈতিক আগ্রাসনের শিকার হওয়া অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে যায়। আবার সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে যে জাতি পংগু হয়ে পড়ে অর্থাৎ যার নিজস্ব সাংস্কৃতিক আদর্শ ও ভাবধারার শেকড় দুর্বল হয় বা বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে সে রাজনৈতিক প্রাধান্য ও বিজয় লাভ করলেও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার হওয়া তার পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক নয়। রাজনৈতিক বিজয় তার সাংস্কৃতিক ধারাকে অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয় না। বরং সাংস্কৃতিক পরাজয় তার রাজনৈতিক পরাজয়ের পথ সুগম করে। অন্যদিকে সাংস্কৃতিক বিজয় একটা জাতির রাজনৈতিক বিজয়ের পথও উন্মুক্ত করে দিতে পারে।

উপমহাদেশের এই পূর্ব এলাকায় মুসলিম জাতিসত্তা হাজার বছর থেকে যে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার হয়ে আসছে এবং বর্তমানে তার মধ্যে যে

সাংস্কৃতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে এ দৃষ্টিতে তা বিচার করা যায়। এ এলাকার বৌদ্ধ, জৈন ও বর্ণাশ্রমবাদী প্রবল মুশরিকী সংস্কৃতির সাথে প্রথম দিন থেকেই তাকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। মুসলমানরা এখানে রাজনৈতিক বিজয় লাভ করেছিল। তাই রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ছিল তাদেরই প্রাধান্য। কিন্তু ইসলাম বিজয় লাভ করেনি। পাঠান-তুর্কীআফগানী মুসলমানদের এ বিজয়কে ইসলামের আংশিক বিজয় বলা যেতে পারে। সে বিজয়টাও রাজনৈতিকভাবে আসেনি। বরং এসেছে ইসলাম প্রচারক সুফী-দরবেশদের মাধ্যমে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবা ও তাবেঈ-তাবে তাবেঈগণ যেসব দেশে রাজনৈতিক বিজয় লাভ করেন সেখানে তাঁরা জনগণকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানান। এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইসলামী নিযাম প্রতিষ্ঠিত করেন। সবক্ষেত্রে ইসলামের বিধান ও আইন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। কাজেই তাঁরা যে দেশে পদার্পণ করেন সে দেশের জনগণের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চরিত্র বদলে যায়। এজন্য তাঁদের কোনো প্রকার বলপ্রয়োগ করতে হয়নি। বরং তাঁরা নিজেরাই ছিলেন এর ধারক বাহক। তাঁদের সমগ্র জীবন ও কর্মকাণ্ড ছিল ইসলামী আদর্শের মূর্ত প্রতীক। বিশুদ্ধ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা ছিল তাঁদের চরিত্রনীতি। দুনিয়ার জীবনের সুখ-সম্পদ-ঐশ্বর্য তাঁদের কাছে মাছির একটি ডানার চাইতে বেশী মূল্যবান ছিল না। ক্ষমতা ও বিত্তকে তাঁরা মনে করতেন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের কাছে সোপর্দ করা আমানত। মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সবার ওপরে সমানভাবে তা বর্ষণ করতেন।

এভাবে তাঁদের জীবন, চরিত্র ও কর্মকাণ্ডই জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে। প্রকৃত সত্যকে জনগণ নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে নেয়। আসলে সত্য সত্যই। স্বমহিমায় সে আত্মপ্রকাশিত। তবুও ব্যক্তির ওপরই তাকে নির্ভরশীল হতে হয়। ব্যক্তির শারীরিক ও নৈতিক কাঠামোতেই সে আত্মপ্রকাশ করে। এজন্যই নবী-রসূলের প্রয়োজন হয়। আদর্শ ব্যক্তিত্বই আদর্শে প্রাণ সঞ্চার করে। একটি বক্তৃতা, একটি ভাষণ ও একটি প্রশিক্ষণ যতদূর কার্যকর না হয় ঐ বক্তৃতা, ভাষণ ও প্রশিক্ষণের মৌল প্রাণসত্তা-সঞ্জাত একটি নীরব ব্যক্তিত্ব তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী কার্যকর ভূমিকা পালন করে। রসূলের সাহাবা, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈগণ এ ভূমিকাই পালন করেন। তাঁদের কর্মকাণ্ডে জাতি ও গোত্র স্বার্থের ভূমিকা ছিল শূন্যের পর্যায়ে। ফলে তাঁরা নতুন নতুন এলাকায় পরিবেশেও জাতিদের মধ্যে যথার্থ ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত সমাজে ইসলামী সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। ফলে সে সমাজে গড়ে উঠেছিল যথার্থ ইসলামী ঐতিহ্য ও নীতিবোধ। ইসলামী

ঐতিহ্যের ভিত্ সে সমাজে ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ় ও মজবুত। পরবর্তীকালে অন্য কোনো প্রবলতর সংস্কৃতির সাথে সংঘাতের ফলে এই ভিত নড়ে যাবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। এর ভেতর অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে, অনুপ্রবেশের ধারা বহুদূর এগিয়ে যেতে পারে, কিন্তু তা তার কাঠামোয় কোনো মৌল পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হবে না। যেমন ধরা যাক সিরিয়া, ইরাক, ইরান বা মিসরের মুসলমানদের সাংস্কৃতিক জীবনধারায় পার্সী, খৃষ্টীয় বা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। মুসলমানদের মধ্যে এই ধারা প্রাধান্য বিস্তার করছে। কিন্তু এরপরও যদি ইসলামী আদর্শ ও ভাবধারার প্রতি তাদের আস্থা অটুট থাকে তাহলে এই প্রাধান্য হবে সাময়িক। তারা সাংস্কৃতিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে। কারণ ইসলামী আদর্শের ভিত তাদের মধ্যে মজবুতভাবে শেকড় গেড়ে বসে আছে। তওহীদকে যারা বিশ্বাসের অংগ হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে তাদের বিশ্বাসের মধ্যে শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটানো কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। বিশেষ করে যারা সজাগ বিশ্বাসী। অর্থাৎ যারা তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান রাখে তাদেরকে বিভ্রান্ত করা এবং তাদের সামনে শিরককে তওহীদ হিসাবে চালিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে যাকিছু আক্রমণ আসবে তা সংস্কৃতির বহিরংগেই প্রতিহত হবে। ভেতরে প্রবেশ করলেও মূলকে আন্দোলিত করতে পারবে না। জড়বাদ, নাস্তিক্যবাদ, মার্কসবাদ এবং অন্যান্য দর্শন ও ভাবধারার প্রভাব যাকিছু পড়ছে বিগত কয়েকশো বছর ধরে সারা বিশ্বে ইসলামের রাজনৈতিক শক্তির পরাজয় এবং ইউরোপ-আমেরিকার জড়বাদী-নাস্তিক্যবাদী শক্তির বিশ্বব্যাপী বিজয় আর এই সংগে তাদের ভোগবাদী সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রসারের ফলে ইসলামী ভাবধারার সাময়িক সংকোচনেই তা সম্ভব হয়েছে। সাংস্কৃতিক জীবনের যেসব ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা যেখানে পশ্চাৎপদ হয়েছে সেখানে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ইসলামী ভাবধারাকে সেখানে পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা চালানো হয়নি। অর্থাৎ ইসলামী ভাবধারাকে প্রাচীন গেলাফে আবদ্ধ করে অনড় রাখা হয়েছে। ইজতিহাদের মাধ্যমে তাকে গতিশীল করার প্রচেষ্টা চলেনি। ফলে ইসলাম বিরোধী ভাবধারা তার সুযোগ গ্রহণ করেছে। যাবতীয় দোষ, ত্রুটি, বিভ্রান্তি ও অস্বাভাবিকতাসহ শুধুমাত্র আধুনিক হবার কারণে তা গৃহীত হয়ে গেছে এবং মুসলিম জীবনধারাকে বিপর্যস্ত করেছে।

আমাদের দেশের অবস্থা এর তুলনায় অনেক বেশী ভয়াবহ। এখানে এ ত্রুটি তো আছেই। এর চেয়ে বড় ত্রুটি হচ্ছে এ এলাকায় ইসলামী সমাজ গঠনের গোড়াতেই যে দুর্বলতা ছিল পরবর্তীকালের কোনো সময়েই তা পুরোপুরি দূর করার প্রচেষ্টা চলেনি। উনিশ শতকে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম

ভারতের সাইয়েদ আহমদ শহীদের তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া ও পরবর্তীকালের ইসলামী জিহাদ আন্দোলনের প্রভাব এ এলাকায় পড়ে এবং এই সংগে স্থানীয়ভাবে মওলানা নিসার আলী ওরফে তীতুমীরের সমধর্মী আন্দোলন ও একই সময়ের হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলন বিশেষ এলাকায় সাময়িক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

মূলগতভাবে এ এলাকায় তুর্কী, আফগান, পাঠান ইত্যাদি যাদের সমন্বয়ে প্রথম মুসলিম সমাজ গড়ে ওঠে তাদের সাথে মিলিত হয় স্থানীয় নওমুসলিম সমাজ। স্বাভাবিকভাবে গোষ্ঠী ও স্থানীয়তার প্রভাব এদের সবার মধ্যেই ছিল। সাহাবা ও তাবেঈগণের মতো একমুখী হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আবার এ এলাকার বিজয়ী ও শাসক মুসলিম সমাজের মূল লক্ষই ছিল রাজ্য বিস্তার ও রাজ্য শাসন। ইসলাম প্রচার, ইসলামী সমাজ গঠন, যথার্থ ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা এবং অমুসলিম জনগণের সামনে নিজেদেরকে ইসলামী আদর্শের একনিষ্ঠ ধারক হিসাবে তুলে ধরা তাদের লক্ষ ছিল না। এই সংগে স্থানীয় নওমুসলিমদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যেতে থাকে। তাদেরকে সঠিক ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। উলামায়ে কেরাম ও সুফীগণ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে এ দায়িত্ব আংশিকভাবে পালন করেন। ফলে স্থানীয় ও প্রতিবেশী অমুসলিম সমাজের বিভ্রান্ত মতবাদ ও রসম রেওয়াজসমূহ প্রথম থেকেই তাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করার সুযোগ পায়। তাছাড়া তারা নিজেদের বহুতর শিরকী আকিদা-বিশ্বাস ও মুশরিকানা রসম ও কুসংস্কারসহ ইসলামে প্রবেশ করে। এভাবে গোড়াতেই এখানে ইসলাম বিরোধী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের পথ খুলে যায়। ফলে ছশো বছর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার পরও সেই আমলে অনৈসলামী সংস্কৃতি যেমন ইসলামী জীবন ধারায় অনুপ্রবেশ করেছে তেমনি ইংরেজ আমলে এবং এর পরবর্তীকালেও এ ধারা অব্যাহত থেকেছে।

আধুনিক সমাজে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ

মুসলিম সমাজের কথাই আমরা ভাবছি। কারণ ইসলামী সংস্কৃতি লালিত হয় মুসলিম সমাজে। কোনো অমুসলিম সমাজে ইসলামী সংস্কৃতি লালিত ও বিকশিত হতে পারে না। এমনও হতে পারে দীর্ঘ দিনের সংযোগ, মেলামেশা ও একত্রে বিভিন্ন কাজ করার কারণে অনৈসলামী সমাজের বহিরংগে ইসলামী সংস্কৃতির কিছুটা ছাপ পড়তে পারে। কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ লাভ করার কোনো সুযোগ সেখানে নেই। কথাটাকে আমরা কুরআনের পদ্ধতিতে এভাবে বলতে পারি ঃ

مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ

'মুশরিকরা নিজেদের কাজকর্মের মাধ্যমে কুফরীর প্রমাণ দিয়ে চলছে, এ অবস্থায় তারা কখনো আল্লাহর মসজিদ আবাদ করতে পারে না।'

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ ـ

'আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে মুসলমান, যে আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান এনেছে, নামায কায়েম করেছে ও যাকাত দিয়েছে। আর যে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ডরায় না।'

মসজিদ আবাদ করার দায়িত্ব যেমন মুমিনদের, মুশরিকদের নয়, এমনকি দুনিয়ার প্রথম মসজিদ কাবাঘরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যেমন একদিন কালের আবর্তনে মুশরিকদের হাতে গিয়ে পড়েছিল কিন্তু প্রথম সুযোগেই আল্লাহ তা ছিনিয়ে নিয়ে মুমিনদের হাতে সোপর্দ করে দিয়েছেন, ঠিক তেমনি ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশের দায়িত্বও মুসলমানদের। মসজিদ ছাড়া যেমন মুসলমানদের দীনি জীবন বিকশিত ও পরিপুষ্ট হয়ে পূর্ণতা লাভ করতে পারে না ঠিক তেমনি ইসলামী সংস্কৃতি ছাড়া মুসলিম সমাজ সুস্থভাবে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে ও বেঁচে থাকতে পারে না। একটি জীবন সেখানে থাকতে পারে। তবে সে জীবনে ইসলাম স্তিমিত ও মুসলিম নির্জীব। ইকবাল যথার্থই বলেছেন ঃ

اسلام ترا دیس ہے تو مصطفوی ہے

'ইসলাম তোমার দেশ এবং তুমি মুহাম্মদ মুস্তফার সাথে সম্পর্কিত।'

ইকবাল ইসলামকে মুসলমানের দেশের মর্যাদা দিয়েছেন। আর মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পর্কিত হবার কারণে মুসলমানরা একটি জাতীয়তা ও মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দেশের মাটি যেমন মানুষকে ঠাঁই দিয়ে তাকে জীবন গঠনের সুযোগ দেয়, ইসলামও ঠিক তেমনি মুসলমানকে তার বুকে ঠাঁই দিয়েছে, তাকে জীবন ধারণ ও জীবন গঠন করার সুযোগ দিয়েছে। কাজেই ইসলামকে বাদ দিয়ে মুসলিম সমাজ গঠনের কথা কখনো কল্পনাই করা যায় না।

আজকের মুসলিম সমাজ

আমরা এখন আমাদের চারদিকের সারা দুনিয়ার ওপর একবার নজর বুলাতে পারি। দুনিয়ায় এখন একশো বিশ কোটি মুসলমানের বাস। সাতান্নটির মতো স্বাধীন মুসলিম দেশ। এ স্বাধীন মুসলিম দেশগুলোয় মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকার বিস্তীর্ণ এলাকায় এ মুসলমানরা ছড়িয়ে আছে। অস্ট্রেলিয়া, উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায়ও আছে কিছু মুসলমানের বাস। কিন্তু সেখানে এখানো মুসলমানদের কোনো শক্তিশালী সমাজ সংগঠন গড়ে ওঠেনি। তাই সেখানকার মুসলমানদের আলোচনা আপাতত স্থগিত রাখলাম। প্রধানত আফ্রো-ইউরেশিয়া এলাকার মুসলমানদের মধ্যেই আমরা আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো।

সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে থাকা এই মুসলিম সমাজকে আমরা মূলত তিনভাগে ভাগ করতে পারি ঃ

এক. এমন মুসলিম সমাজ যেখানে ইসলামী সংস্কৃতি লালিত ও বিকশিত হচ্ছে। ইসলামী সংস্কৃতি তার জীবন্ত থাকার ও পরিপুষ্টি সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপাদান লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। ইসলাম বিরোধী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের সমস্ত পথই সেখানে বন্ধ।

দুই. এমন মুসলিম সমাজ যেখানে মুশরিকী সংস্কৃতি প্রাধান্য বিস্তার করেছে। সমাজের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুশরিকী সংস্কৃতি তার বৈশিষ্টগুলোর শিকড় মাটিতে প্রোথিত করতে সক্ষম হয়েছে। দীর্ঘদিনের মুশরিকী সংস্কৃতি চর্চায় অভ্যস্ত মুসলিম সমাজের সামনে ইসলামী সংস্কৃতির চেহারাও অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কোথাও কোথাও পার্শ্ববর্তী অমুসলিম সমাজের সাথে মুসলিম সমাজের পার্থক্য চোখে পড়ার মতো নয়।

তিন. মুসলিম সমাজে এক ধরনের মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। ইসলামী সংস্কৃতির আপাত প্রাধান্য সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা গেলেও ইসলামী সাংস্কৃতিক মননের মধ্যে মুশরিকী ভাবধারা জেঁকে বসে আছে। মুশরিকী

সংস্কৃতির সাথে সহাবস্থান, মুসলিম রাষ্ট্র ব্যবস্থার দীর্ঘ দিনের গাফলতি, ঔপনিবেশিক শক্তির পরিকল্পিত প্রচেষ্টা এবং সর্বোপরি সাধারণ মুসলিম সমাজের ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি মূলত মুসলিম সমাজে এই মিশ্র সংস্কৃতির বিকাশে সাহায্য করেছে।

আফগানিস্তান, সউদি আরব এবং এ ধরনের আরো কোনো দেশকেও হয়তো আমরা কিছুটা প্রথম শ্রেণীতে ফেলতে পারবো, যেখানে বিগত কয়েক শতকে ঔপনিবেশিক শাসন বিস্তৃত হয়নি এবং সাথে সাথে সেসব দেশে কোথাও অমুসলিম সমাজের অস্তিত্ব থাকলেও তা নামমাত্র। তবে এসব দেশে ইসলামী চিন্তায় জড়তা এবং রাজনৈতিক ও কারিগরী ইত্যাদি বিভিন্ন দিকে পশ্চাতপদতার কারণে আধুনিক জাহেলী ও মুশরিকী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের পথ সেখানে রুদ্ধ বলা যায় না। বরং ইতিমধ্যেই অনুপ্রবেশ করতে শুরু করেছে। মুসলমানদের সাথে ইউরোপের ক্রুশেড যুদ্ধ চলে কয়েকশো বছর ধরে। এ যুদ্ধের ফলে ইউরোপের খৃষ্টীয় মুশরিকী সংস্কৃতির সাথে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর পরিচয় ঘটে। এসব যুদ্ধে কোনো কোনো সময় খৃষ্টান পক্ষও জয়লাভ করে এবং তারা মুসলিম এলাকায় ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করে। খৃষ্টীয় আচার অনুষ্ঠান এসব এলাকায় বিস্তার লাভ করতে থাকে। যে দেশে ইতিপূর্বে মদ পান হারাম ছিল, মদ উৎপাদন করা, মদের দোকান দেয়া ও মদের ব্যবসা করার কোনো সুযোগই ছিল না, সেখানে প্রকাশ্য বাজারে শুধু মদের দোকানই বসলো না, মাতালদের মাতলামি নগর জীবনের চেহারা পাল্টে দিল। এরপরও মুসলিম সমাজের ওপর এর প্রভাব তেমন বিশেষ কিছু না পড়ার কারণ হচ্ছে এই যে, মুসলিম সমাজের আভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ শক্তি তখনো ভেঙে পড়েনি। বিশাল ইসলামী বিশ্ব তখনো স্বাধীন সত্তা নিয়ে টিকে ছিল। মুসলিম সমাজে চিন্তার ক্ষেত্রে স্থবিরতা এলেও তখনো ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দৃষ্টিভংগী সমগ্র ইসলামী বিশ্বের কোথাও মুসলমানদের কাছে গ্রহণীয় হয়ে ওঠেনি।

ফলে এ সময় মুসলিম সমাজের কোথাও মুশরিকী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটলেও তা স্বীকৃতি লাভ করতে ও তার স্বকীয় বৈশিষ্টে টিকে থাকতে পারেনি। কিন্তু উনিশ ও বিশ শতকের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। সারা বিশ্বে এখন মুশরিকী সংস্কৃতির জয়জয়কার। ছয়টি মহাদেশে মানুষের বাস। মুশরিকী সংস্কৃতির ধারক ইউরোপ ও আমেরিকার কয়েকটি দেশ গত দু তিনশো বছরে এ ছয়টি মহাদেশে ঔপনেবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করে মুশরিকী সংস্কৃতির বিস্তৃতি ঘটিয়েছে বিশ্বব্যাপী। ইকবালের ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে, শয়তান এখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলছে ঃ

اب مری ضرورت باقی نہیں تہِ افلاق

"আকাশতলে পৃথিবী পৃষ্ঠে
আমার আর প্রয়োজন নেই।"

কারণ পশ্চিমের রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়করা শয়তানের দায়িত্ব পালন করছে। কাজেই শয়তান রিটায়ার না করলেও অন্তত কিছুক্ষণ নিশ্চিন্তে আরাম করতে পারে।

পূর্ব ইউরোপের যেসব দেশে মুসলমানদের বাস, যেমন আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম এলাকার সাবেক সোভিয়েতভুক্ত মুসলিম দেশগুলো এবং সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র থেকে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, জর্জিয়া, রাশিয়ার মুসলিম অধ্যুসিত এলাকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভিয়েতনাম, কম্পুচিয়া, লাওস ইত্যাদি এবং দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের কোনো কোনো রাজ্যের মুসলিম সমাজকে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তরভুক্ত করা যায়। পূর্ব ইউরোপে দু ধরনের মুসলমানের বাস। তুর্কী বংশোদ্ভূত ও স্থানীয় অধিবাসী। তুলনামূলকভাবে তুর্কী বংশোদ্ভূতদের মধ্যে প্রতিরোধ ক্ষমতা কিছুটা বেশী। একদিকে ছিল মূলত তুর্কীদের সহায়তায় প্রাথমিক ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় দুর্বলতা। দ্বিতীয়ত এশিয়ার বৃহত্তম মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ইউরোপীয় প্রবল মুশরিকী সমাজ-সংস্কৃতির অবিরত চাপ। আর তৃতীয়ত চলতি শতকের নাস্তিক্যবাদী সমাজতান্ত্রিক জীবন দর্শন ও রাষ্ট্রব্যবস্থার জবর শাসন। এ ত্রয়ী সম্মিলনে ইউরোপীয় মুসলিমদের সাংস্কৃতিক জীবন পর্যুদস্ত। অন্যদিকে সোভিয়েট রাশিয়া থেকে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত মুসলিম দেশগুলোর মুসলমানরা প্রাথমিক যুগের ইসলামী সংস্কৃতির ধারক হলেও বিগত সত্তর বছরের কমিউনিষ্ট শাসন তার প্রত্যেকটি বৈশিষ্টকে পরিকল্পিতভাবে খতম করার প্রয়াস চালিয়েছে। সেখানকার ইসলামী সংস্কৃতির মুমূর্ষু অবস্থা আজ সারা দুনিয়ার মানুষের সামনে সুস্পষ্ট। আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধ রাষ্ট্রগুলোর সংখ্যালঘু মুসলমানরা একদিকে বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন এবং অন্যদিকে বৌদ্ধ সমাজের মারমুখী ও আগ্রাসী প্রবণতার শিকার হয়েছে। আবার সবশেষে এ এলাকায় এক সময়কার কমিউনিষ্ট শাসন একদিকে মুসলমানদেরকে দেশছাড়া করছে আর অন্যদিকে যেসব মুসলমান কমিউনিষ্ট শাসন উত্তরকালে সেখানে টিকে থাকছে তাদেরকে ইসলামী সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। মোটকথা হিজরী ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের তাতারী আক্রমণের ন্যায় এ এলাকায় এ শতকের পঞ্চাশ থেকে সত্তর বছরের কমিউনিষ্ট শাসন ইসলামী সংস্কৃতির ওপর সবচেয়ে বড় আঘাত হেনেছে।

এবার আমরা তৃতীয় শ্রেণীটির আলোচনায় আসতে পারি। সমগ্র ইসলামী দুনিয়ায় এখন এ শ্রেণীটিরই প্রাধান্য। বিগত হাজার বছরে মুসলমানদের অনেক উত্থান পতন হয়েছে। বিভিন্ন দেশে মুসলিম সমাজের চেহারা উত্তরোত্তর স্ফীত হয়েছে। পার্শ্ববর্তী অমুসলিম সমাজের অসংখ্য লোক ইসলামী সমাজের অন্তরভুক্ত হয়েছে। কিন্তু একদিকে মুসলিম সমাজের নিজস্ব দুর্বলতা তো ছিলই তার ওপর বিপুল সংখ্যক নওমুসলিমকে যথাযথ ইসলামী সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে দীক্ষিত ও সুশিক্ষিত করে তোলা সম্ভবপর হয়নি। ফলে তারা নিজেদের মুশরিকানা সংস্কৃতির বিরাট অংশ ওদিক থেকে এদিকে নিয়ে আসে। মুশরিকানা আকীদা-বিশ্বাস থেকে শুরু করে কর্ম ও আচরণ পর্যন্ত সবকিছুই এদিকে চলে আসে। এরপর মুসলিম সমাজের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা যেটি দেখা দিয়েছে সেটি হচ্ছে, ইসলামের দুটি মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহ থেকে তারা দূরে সরে গিয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সরাসরি যোগাযোগের পরিবর্তে ব্যক্তির সাথে যোগাযোগকে তারা গুরুত্ব দিয়েছে বেশী। ফলে ধীরে ধীরে তাদের চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তি সৃষ্টিশীলতার পরিবর্তে ব্যক্তি ও গ্রুপভিত্তিক রক্ষণশীলতায় আক্রান্ত হয়েছে। এ সুযোগে মুশরিকী সংস্কৃতি ইসলামী শিবিরে অনুপ্রবেশ লাভের ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহর মানদণ্ডে তাকে যাচাই করার প্রয়োজন কোথাও ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়নি।

এভাবে শত শত বছরের প্রচেষ্টা ও অনুশীলনে মুসলিম সমাজে এমন একটি মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে, যা আজ একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতির রূপ নিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছে। এর সবচেয়ে চমৎকার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আমাদের এ উপমহাদেশের 'মোগলাই সংস্কৃতি।' মোগলরা এদেশে 'নওরোজ' উৎসবের উদ্ভব ঘটায়। এটা আসলে ছিল পারশিক সংস্কৃতির একটি অংশ। নওরোজ বছরের প্রথম দিন। এরি পথ ধরে আমাদের দেশে ধীরে ধীরে পথ করে নিয়েছে 'পহেলা বৈশাখ।' অথচ বছরের প্রথম দিনটি যদি তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকতো, তাহলে খোলাফায়ে রাশেদীন ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাগণ হিজরী বর্ষের প্রথম তারিখ অর্থাৎ পহেলা মহররম উদযাপন করতেন। কিন্তু তা তাঁরা করেননি।

উপমহাদেশের মুসলমানদের আকীদা বিশ্বাসের ওপরও মোগলরাই সবচেয়ে বড় হামলা চালায়। দুজন মোগল প্রধান আকবর ও দারাশিকোহ প্রকাশ্যে ইসলামী আকীদাকে মুশরিকী আকীদার আওতাধীন করার প্রচেষ্টা চালান। আকবরের অশিক্ষিত হাতের পর দারাশিকোর শিক্ষিত হাতে উত্তোলিত হয় সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের ঝাণ্ডা। উপমহাদেশে মোগল শাসনের অবসান হয়েছে আজ আড়াই- তিনশো বছর হয়ে গেলো কিন্তু সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের অবসান

ঘটেনি। শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে নবরূপে সজ্জিত করে বাংলার অশিক্ষিত, কম শিক্ষিত ও অনৈসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম সমাজকে বিরাট ফিতনায় নিক্ষেপ করেছেন।

বাইজীগানকে মোগলরা একটি সাংস্কৃতিক ধারায় রূপান্তরিত করে। আজকের মুসলিম সমাজে অশ্লীল সংগীত চর্চা এ মোগলাই সংস্কৃতিরই অবদান। সেদিন মোগলাই সংস্কৃতির আওতায় বাইজী নাচ ও বাইজী গানের আসর ছিল ধনীদের বিলাস চর্চা। আর আজ আমাদের সমাজে সেই একই ধরনের নাচ ও গানের চর্চা 'আর্ট' হিসেবে পরিগণিত হয়ে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের অংগে পরিণত হয়েছে। আমাদের জাতীয় প্রচার মাধ্যম রেডিও ও টিভি এ দুটি ছাড়া কানা ও খোঁড়া।

বাংলার সংস্কৃতি

উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দ্রাবিড়রা যেমন মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, কোর্ট ডি, জি, খান ইত্যাদি নগরে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে তোলে ঠিক তেমনি বাংলায়ও সমসময়ে ও পরবর্তীকালে প্রথম নগর সভ্যতা গড়ে তোলে দ্রাবিড়রাই। তারা যেমন কৃষি কাজ করতো তেমনি নগরায়ণও ছিল তাদের সভ্যতার অংগ। বাংলার দ্রাবিড়িয় জীবনে তওহীদের অংশ কি পরিমাণ ছিল তার কোনো সুস্পষ্ট পরিসংখ্যান আমাদের জানা নেই। কিন্তু আমরা দেখি পরবর্তীকালে আর্য বর্ণাশ্রম বিরোধী দুটি ধর্মীয় আন্দোলনে এদেশীয় মানুষের সর্বাধিক অংশগ্রহণ। জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম বাংলায় সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এরপরে তওহীদবাদী ইসলামের আগমনে উপমহাদেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় ঘনবসতিপূর্ণ গাঙ্গেয় বদ্বীপে আমরা দেখি এর বিপুল বিস্ময়কর সাফল্য।

এ থেকে একটি কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বাংলার মানুষের হৃদয় জগত তওহীদের দাওয়াত গ্রহণ করার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে ছিল। বাংলার অধিবাসীরা যে সময় ইসলাম গ্রহণ করে তখন এদেশে যেসব ধর্মের প্রচলন ছিল সেগুলো ছিল জৈন, বৌদ্ধ ও আর্য ধর্মের বিভিন্ন শাখা। এগুলো সবই ছিল তখন পুরোপুরি পৌত্তলিক ধর্ম। হাজার হাজার বছর থেকে গড়ে ওঠা পৌত্তলিক সংস্কৃতির তারা ছিল উত্তরাধিকারী। তাদের সমাজ, সভ্যতা, চিন্তা ও কর্ম সবকিছুই পৌত্তলিকতার রঙে আকণ্ঠ ডুবে ছিল। আর্য ধর্ম বিরোধী যে বৌদ্ধরা সারা ভারত থেকে মার খেয়ে সবচেয়ে বড় আর্য বিরোধী ঘাঁটি বাংলায় এসে জমায়েত হয় তারাও এখানে নিজেদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র রক্ষা করতে পারেনি। পৌত্তলিক আর্যদের অধীনে সহজিয়া, নাথ, তান্ত্রিক ইত্যাদি নামের আড়ালে

তাদের এখানে গাঢাকা দিয়ে থাকতে হয়। ধীরে ধীরে বৌদ্ধ ও আর্য ধর্মের পৌত্তলিকতার দিক দিয়ে সমস্ত পার্থক্য ঘুচে যায়। বৌদ্ধ ধর্মের বর্তমান ভাষ্য অনুযায়ী তার প্রবর্তক যে গৌতম বুদ্ধ ভগবানের অস্তিত্বই অস্বীকার করতেন পৌত্তলিক আর্য ধর্মের প্রভাবে সেই গৌতমই ভগবানের অবতার রূপে পূজিত হতে থাকেন।

এভাবে দেখা যায়, এ দেশীয় জনতার যে বিপুল অংশ ইসলাম গ্রহণ করে তারা পুরোপুরি পৌত্তলিক ধর্ম ও সমাজ সভ্যতার সন্তান। আবার আমরা দেখি এ বিপুল সংখ্যক নওমুসলিমের দীক্ষাদাতাগণ একদল সূফী ও মুজাহিদ। একদিকে দীক্ষা গ্রহণকারীদের সংখ্যা প্রাচুর্যের কারণে তাদের জীবনকে পুরোপুরি ইসলামী সংস্কৃতির রঙে রঞ্জিত করা কোনোক্রমেই সম্ভবপর ছিল না আবার অন্যদিকে দীক্ষাদাতাদের ইসলামের মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহর পরিবর্তে নিজেদের উস্তাদ ও বুযর্গ পীরের সাথে সংযোগ গভীর থাকার কারণে ইসলামী সংস্কৃতির স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারার সাথে দীক্ষা গ্রহণকারীদের সংযোগ ক্ষীণতর হয়। এ পথে জাহেলী ও মুশরিকী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ চলতে থাকে ব্যাপকভাবে। এ অনুপ্রবেশ গত আটশো বছর থেকে চলছে এবং এখানো শেষ হয়নি।

এরপর মরার ওপর খাঁড়ার ঘা-এর মতো এলো আঠার শতক থেকে ইংরেজ শাসনের সাথে সাথে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আক্রমণ। এ সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে আমরা আধুনিক জাহেলিয়াত নাম দিতে পারি। এ সভ্যতা যেমন একদিকে আমাদের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত করিয়েছে এবং তার নব নব আবিষ্কার ও সভ্যতার উপকরণে আমাদের জীবন অংগন ভরে তুলেছে তেমনি অন্যদিকে জ্ঞানের নামে অনেক ক্ষেত্রে প্রাচীন জাহিলিয়াতকেই নতুন সাজে সজ্জিত করে এনে আমাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তার ক্ষেত্রে এ সভ্যতা ও সংস্কৃতি আমাদের সবচেয়ে বড় জাহেলিয়াত ও গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেছে। আর এ আকীদা বিশ্বাস ও চিন্তা থেকে উৎসারিত হয়েছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। ফলে জন্ম হয়েছে আধুনিক জাহেলী সংস্কৃতির।

ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ

সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ইসলাম নফ্‌স ও হৃদয়কে কেন্দ্রীয় গুরুত্বের আসনে বসিয়েছে। কুরআনে সূরা আশ শামসে বলা হয়েছে ঃ

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ۝ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۝

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۝

'আর মানুষের নফ্‌স ও হৃদয়ের কসম এবং সেই সত্তার কসম, যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন। তারপর তাকে খারাপ কাজ ও ভালো কাজের জ্ঞান দিয়েছেন। যে ব্যক্তি তার হৃদয় ও নফসকে পরিচ্ছন্ন করেছে সেই সফলকাম হয়েছে। আর ব্যর্থ হয়েছে সেই ব্যক্তি যে তাকে করেছে কলুষিত।'

কাজেই হৃদয় ও মন-মানসিকতার পরিচ্ছন্নতাই ইসলামে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন করার একমাত্র উপায় হচ্ছে, হৃদয়ে ঈমানকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। হৃদয়ে ঈমানের পরিবর্তে শির্‌ক প্রতিষ্ঠিত হলেই হৃদয় হয়ে পড়ে কলুষিত। ঈমানের মূল বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্‌, রসূল ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস। এ বিশ্বাস জীবন সম্পর্কে মানুষকে একটি বিশেষ ধারণা দেয়। আল্লাহ্‌র প্রতি অন্য ধরনের বিশ্বাস বা আল্লাহ্‌র প্রতি অবিশ্বাস জীবন সম্পর্কে যে ধারণা গড়ে তোলে তা থেকে এটি সম্পূর্ণ আলাদা। আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস ইসলামী সংস্কৃতির যে কাঠামো নির্মাণ করে তার কয়েকটি বৈশিষ্ট আমরা এখানে উল্লেখ করছি ঃ

এক. এ সংস্কৃতিতে আল্লাহ্‌ কেবলমাত্র একজন মাবুদ ও উপাস্যই নন বরং তিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন শাসকও। রসূল তাঁর প্রতিনিধি। কুরআন তাঁর সংবিধান। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়ে তাঁর প্রতিনিধি তথা রসূলের আনুগত্য করবে এবং তাঁর পাঠানো সংবিধান অনুসারে জীবন গড়ে তুলবে সে-ই এ বিশ্ব রাজ্যের ন্যায়সংগত প্রজা।

দুই. এ সংস্কৃতির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো হচ্ছে, মানুষকে চূড়ান্ত সাফল্য লাভের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আর এ চূড়ান্ত সাফল্য হচ্ছে দুনিয়ার জীবনে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে পরকালে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন। কোন্‌ কাজে আল্লাহ্‌ সন্তুষ্ট হবেন এবং কোন্‌ কাজে অসন্তুষ্ট হবেন, তা জানা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই নিজের কর্ম স্বাধীনতা পরিহার করে আল্লাহ্‌র পাঠানো শরীয়ত অনুযায়ী জীবনযাপন করাই এ সংস্কৃতির লক্ষ। এভাবে ইসলামী জীবনব্যবস্থা মানুষের চিন্তা-ভাবনা, আচার-ব্যবহার তথা সমগ্র কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত করে যে সুষ্ঠু জীবনধারা গড়ে তোলে তারি নাম ইসলামী সংস্কৃতি।

তিন. এ সংস্কৃতির তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো হচ্ছে, জাতীয়, দেশীয় বা কোনো ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে এ সংস্কৃতি আবদ্ধ নয়। এক আল্লাহে বিশ্বাস করে রসূলকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁর আনুগত্য করে এবং কুরআনকে পথ চলার বিধান হিসেবে মেনে নিয়ে যে কোনো ব্যক্তি এ

সংস্কৃতির আওতাভুক্ত হতে পারে। এ অর্থে এটি একটি বিশ্ব সংস্কৃতি ও মানবীয় সংস্কৃতি। সারা বিশ্বের মানুষ এখানে এসে ভাই ভাইয়ে পরিণত হয়।

চার. এ সংস্কৃতির চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো হচ্ছে, শৃংখলা বোধ ও শক্তিশালী বাঁধন। এ শৃংখলা বোধ এ সংস্কৃতির অনুসারীদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। সেখানে এমন একজন অতন্দ্র প্রহরী নিযুক্ত করে দেয়া হয়েছে যে, বাইরের কোনো তাগিদ ছাড়াই সবসময় তাকে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করে।

পাঁচ. এ সংস্কৃতি একটি উন্নত ও ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থা এবং একটি সৎকর্মশীল মানব গোষ্ঠী গড়ে তোলে। এ মানবগোষ্ঠী একদিকে যেমন সততা, বিশ্বস্ততা ও ন্যায় নিষ্ঠার প্রতীক হয়, তেমনি অন্যদিকে আত্মত্যাগ, আত্মসংযম, উদারতা ইত্যাদি মানবীয় সদগুণাবলীর মাধ্যমে মানব সমাজে শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বের ধারা প্রবাহিত করে।

ছয়. এ সংস্কৃতি একদিকে মানুষকে সদগুণাবলীতে ভূষিত করে, আবার অন্যদিকে পার্থিব উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য তাকে সর্বক্ষণ উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহর দেয়া সম্পদকে নিয়ামত হিসেবে ঘোষণা করে তার ব্যবহারের যাবতীয় উপায় উপকরণ মানুষকে শিখিয়ে দেয়। সে ঘোষণা করে ঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ -

'বলো, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব সৌন্দর্য সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন তাকে কে হারাম করলো ? আর যে পবিত্র জীবিকা তিনি সৃষ্টি করেছেন তাকেইবা কে হারাম করলো ?'

সে আরো ঘোষণা করে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ○ وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ص وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ○ (المائدة : ٨٧-٨٨)

"হে ঈমানদারগণ ! যেসব পবিত্র জিনিস আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, সেগুলো নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়ো না। আর সীমালংঘন করো না। কারণ আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালোবাসেন না। আর

আল্লাহ তোমাদের যেসব হালাল ও পবিত্র জিনিস দান করেছেন তা থেকে খাও এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো, তাঁর গযবকে ভয় করো।"

–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৮৭-৮৮)

আমাদের আজকের মুসলিম সমাজে আল্লাহর প্রতি ঈমান যতবেশী করে ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে ততই সেখানে ইসলামী সংস্কৃতির এ কাঠামোগত বৈশিষ্টগুলো সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

ভাষা হবে জাতীয় ঐতিহ্যের বাহন

বিশ্বজাহান এবং এর মধ্যে যাকিছু আছে, আকাশ পৃথিবী মানুষ সবকিছু আল্লাহরই সৃষ্টি। এখানে এমন কোনো কিছুর সম্ভাবনা নেই, যা আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বাইরে। আল্লাহ মানুষকে যত সম্পদ ও ক্ষমতা দিয়েছেন তার মধ্যে ভাষা অতুলনীয় ও অসাধারণ। ভাষা কেবল একটি সম্পদই নয়, মানুষের জন্য একটি অপরিহার্য প্রয়োজনও। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে ভাষা একটি বড় রকমের পার্থক্য সৃষ্টি করে দেয়। তাই কুরআনে মানুষ সৃষ্টির সাথে সাথে তাকে ভাষার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা দেবার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ অর্থাৎ তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তাকে মনের ভাব প্রকাশ করার ভাষাও শিখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এখানে 'খালাকা' ও 'আল্লামা' তথা সৃষ্টি করা ও ভাষা শেখানোর মাঝখানে কোনো 'ও' বা 'এবং' শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। অর্থাৎ যেন ভাষার তথা মনের ভাব ব্যক্ত করার ক্ষমতা সহকারেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। কাজেই ভাষা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে একটি বৃহৎ পার্থক্য সূচক শক্তি।

তাহলে বুঝা যায়, ভাষা মানুষের একটি বিরাট শক্তি। তার শিক্ষা, সাহিত্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি নির্মাণ ও তার সমগ্র জীবন ধারা পরিচালনার ক্ষেত্রে ভাষা প্রধান ভূমিকা পালন করে। ভাষাকে বলা হয় ভাব প্রকাশের বাহন। আর এ ভাব প্রকাশ করতে পারে বলেই মানুষ বিশাল সাহিত্য-সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

মানুষ প্রথমে এক আদম ও হাওয়া থেকে শুরু হয়েছিল। তারপর সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে বহু গোত্রে ও জাতিতে বিভক্ত হয়ে গেছে। ঠিক তেমনি মানুষের ভাষাও প্রথমে আদম ও হাওয়া থেকে শুরু হয় এবং তারপর দুনিয়ার বিভিন্ন গোত্রের ও জাতির ভাষার মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়। এ পার্থক্যটা সৃষ্টি হয় তাদের নিজেদের প্রয়োজনের খাতিরে। কারণ তাদের পরিবেশ ভিন্ন হয়ে যায়। আবহাওয়া ভিন্ন হয়ে যায়, পরিস্থিতি ভিন্ন হয়ে যায়। স্থান-কাল-পাত্রের বিভিন্নতা তাদের ভাষাকে বিভিন্ন করে দেয়। মোটকথা ভাষা মানুষের চাহিদা পূরণ করে। যে ভাষা কোনো জাতির চাহিদা পূরণ করতে পারে না তার নাম ধীরে ধীরে মৃতের খাতায় লেখা হয়ে যায়। আমাদের এ উপমহাদেশে এ ধরনের দু'টি বড় বড় মৃত ভাষা হচ্ছে পালি ও সংস্কৃত। পালি ছিল উপমহাদেশের হাজার হাজার বছর আগের প্রাচীন জনগোষ্ঠীর ভাষা। বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারক

গৌতম বুদ্ধের বাণী ত্রিপিটক এ ভাষাতেই লেখা হয়। এ পালি ভাষার শব্দগুলো এখনো উপমহাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষার মধ্যে পাওয়া যায়। আর সংস্কৃত ছিল এ দেশে বহিরাগত আর্য মুনি, ঋষি ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের ভাষা। মুনি-ঋষিদের আশ্রমে ও পণ্ডিতদের টোলে এ ভাষা গড়ে ওঠে। সেখানেই এর চর্চা হতো সীমিত পর্যায়ে। জনতার ভাষা হিসাবে কোনো দিন এটি স্থান লাভ করতে পারেনি। আর্যদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাব এবং বর্ণাশ্রম ভিত্তিক রক্ষণশীল ও উন্নাসিক সমাজ ব্যবস্থার কর্তৃত্ব এ ভাষাকে এক সময় প্রভাব বিস্তারের বিপুল ক্ষমতা দান করে। বিশেষ করে প্রাচীনকালে আর্যবাদী ধর্মের কাছে উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ সংস্কারবাদী ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের পরাজয়ের ফলে পণ্ডিতী সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বিশেষ করে আর্যাবর্তে তথা হিমালয়ান উপমহাদেশের উত্তরাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এ ভাষায় সাহিত্য চর্চা হতো, রাষ্ট্র পরিচালিত হতো। কিন্তু সেকালে সাহিত্যে মানুষের স্থান ছিল না বা থাকলেও তারা সাধারণ মানুষ হতো না। তারা হতো দেবতা ও রাজ-রাজড়া। ফলে সাধারণ মানুষের অংগনে সেদিন সংস্কৃত প্রবেশ করতে পারেনি এবং ধীরে ধীরে এ উন্নাসিক ভাষাটির স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে।

এ হিসাবে বিচার করলে বাংলা একটি হাজার হাজার বছরের প্রাচীন ভাষা। উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও কামরূপ অঞ্চলে এ ভাষাটি ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। এক সময় এ এলাকাটি আর্যাবর্তের মুনি-ঋষিদের জড়বাদী ও প্রকৃতিবাদী ধর্ম বিরোধী বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের ঘাঁটিতে পরিণত হয়। এ কারণে হাজার বছর আগেও আর্যরা এ এলাকায় ব্যাপকভাবে প্রবেশের সাহস পায়নি। পরবর্তীকালে আর্যরা এ এলাকায়ও বিজয় লাভ করে। বাংলা ভাষার ওপর তাদের প্রবল নিপীড়ন চলে। ফলে বাঙালী কবিরা তাদের কবিতা ও সাহিত্য কর্ম নিয়ে বিদেশে পাড়ি দেয়। তখনই চাপিয়ে দেয়া হয় বাংলা ভাষার ওপর সংস্কৃতের জবর শাসন। তেরো শতকের পর মুসলিম শাসনামলে এ জবর শাসন খতম হয়। কিন্তু মুসলমানরা ফারসী বা আরবীয় জবর শাসন বাংলার ওপর চাপিয়ে দেয়নি। বরং তারা বাংলা ভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। কারণ এ দেশের লোকেরাই ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তাদের ভাষা ছিল বাংলা। ফলে ফারসী রাষ্ট্রভাষা থাকলেও শাসক সমাজ বাংলা ভাষা চর্চায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। বরং তারা হয়েছেন সহায়ক। এটা এ দেশে ইতিপূর্বেকার আর্য শাসনের বিপরীতে সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন চিত্র পেশ করে। যেমন, ইংরেজ দুশো বছর এ দেশ শাসন করে। তারা ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা করলেও বাংলাকে তাড়িয়ে দেয়নি, যেটা করেছিলেন ব্রাহ্মণ শাসিত আর্য শাসকগণ।

এভাবে মুসলমানরা ছশো বছর ধরে বাংলাকে তার নিজস্ব অঙ্গনে গড়ে তোলে। তখন ফারসী ও আরবীর ব্যাপক প্রচলন এবং রাষ্ট্রীয় বিশেষ করে ধর্মীয় পর্যায়ে আরবীর বিশেষ মর্যাদার কারণে বিপুল পরিমাণ ফারসী ও আরবী শব্দ দৈনন্দিন ব্যবহারিক ভাষায় স্থান নেয়। এছাড়াও প্রাচীন ভারতীয় দ্রাবিড় সংস্কৃতির কারণে অতি প্রাচীনকালে উপমহাদেশের জনগণের ভাষার মাধ্যমে বহু সেমেটিক শব্দের পূর্ব থেকে বাংলা ভাষায় প্রচলন ছিল। তৎকালীন প্রচলিত ও লেখ্য বাংলায় এই সেমেটিক ও ফারসী শব্দের সংখ্যা শতকরা নব্বই বলেও কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করেছেন। বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রবর্তনকালে যেহেতু হিন্দু দালাল ও ফড়িয়া গোষ্ঠী এ দেশে ইংরেজকে ব্যবসা উপলক্ষে এনে রাজ্য শাসনের খাব দেখায়, তাই ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী হিন্দু সমাজের প্রতি বিপুল উদারতা প্রদর্শন করতে থাকে। সর্বক্ষেত্রে হিন্দুরা ইংরেজের গোলামী করার জন্য হুড়মুড় করে এগিয়ে যেতে থাকে। তারা দুয়ে মিলে করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানান ষড়যন্ত্র। এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ষড়যন্ত্র হচ্ছে, ১৮৫৭ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বসে বাংলা ভাষার খোল নলচে পালটে দেবার জন্য হিন্দু-ফিরিংগী সমঝোতা। ফিরিংগীরা চাচ্ছিল বাংলা ভাষার মাধ্যমে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার, এর ফলে তাদের রাষ্ট্রের ভিত শক্তিশালী হবে। অন্যদিকে হিন্দু পণ্ডিতরা চাচ্ছিল বাংলা ভাষায় ব্যাপক হিন্দুয়ানী পাচার, এর ফলে তাদের ধর্মীয় রক্ষণশীলতা স্থিতিশীল হবে। এভাবে বাংলা ভাষা থেকে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও মুসলমানী ঐতিহ্য বিলোপের এক হীন প্রচেষ্টা চলে। মুসলমানরা তখন নিজেদের ভাষা নিয়ে ইংরেজ দ্রোহী অবস্থায় আলাদা বসবাস করছিল। ইংরেজদের হাতে সর্বশেষ পরাজয়ের পর সর্বস্ব খুইয়ে এখন তারা অন্য কোনো পথ না দেখে বাধ্য হয়ে হিন্দু পণ্ডিতদের তৈরী করা মৃত সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ কৌমুদির আদলে গড়ে তোলা বাংলা ভাষার কিম্ভূতকিমাকার ব্যাকরণের শাসন মেনে নেয়। ফলে বাংলা ভাষা তার আদি প্রাণ চাঞ্চল্য ও স্বাভাবিক গতিময়তা হারিয়ে বসে। ঝুড়ি ঝুড়ি অপ্রচলিত ও পরিত্যক্ত সংস্কৃত শব্দে বাংলা ভাষা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে সাহিত্যে সাধু চলিত ভাষারও সংঘাত হয়। একশো বছর যেতে না যেতেই ঐ তথাকথিত হিন্দু গোষ্ঠীর পক্ষ থেকেই প্রশ্ন ওঠে বাংলা সাহিত্যের ভাষাকে গণ ভাষায় রূপান্তরিত করার।

অন্যদিকে আমরা দেখছি মুসলমান হিসেবে আমাদের ধর্ম, ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ধারণ করার মতো করে এ ভাষাকে আবার গড়ে নিতে হবে। আমাদের পূর্বপুরুষরা ছশো বছর ধরে এ ভাষায় যে ঐতিহ্যের লালন করে এসেছিলেন তা পুনরুদ্ধার করতে হবে। সোজা কথায় আমাদের মায়ের ভাষা

অর্থাৎ আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে ধারণ করার ক্ষমতা যে ভাষার আছে সে ভাষাই হবে আমাদের সাহিত্যের ভাষা। আমরা মুসলমানরা এদেশে বাস করছি এক হাজার বছর থেকে এবং ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষরা হাজার হাজার বছর থেকে এদেশে বাস করে এসেছেন অথচ বাংলা ভাষায় (জনগণের বোলচালের ভাষায় নয়, হিন্দু-ইংরেজ আঁতাতে তৈরি করা সাহিত্যের ভাষায়) আমাদের ঐতিহ্য অনুসারী শব্দের প্রসার ঘটেছে সে তুলনায় অনেক কম। এর মূলে রয়েছে ফোর্ট উইলিয়ামী ষড়যন্ত্র। যেমন আমি এখানে শুধুমাত্র একটি শব্দের প্রসংগ উত্থাপন করছি। বাংলা ভাষায় 'প্রসূতি' শব্দের প্রচলন আছে। কিন্তু প্রসূতির রক্তস্রাবের একটি সময় আছে। ইসলামী পরিভাষায় একে বলা হয় 'নিফাস'। বাংলা অভিধানে-এর ব্যবহার নেই। কারণ আমাদের পার্শ্ববর্তী হিন্দু গোষ্ঠী বাংলা ভাষার অভিধান নিয়ন্ত্রক এবং ফোর্ট উইলিয়ামী ষড়যন্ত্রের সুবাদে বাংলা ভাষাকে মৃত সংস্কৃতের বাঁদী বানিয়ে রাখায় বদ্ধপরিকর। অথচ দেশের বিপুল বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুসলমান সমাজে-এর ব্যাপক প্রচলন রয়েছে এবং এটা তাদের ধর্ম ও ঐতিহ্যের অংগ। এভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বহু অপরিহার্য শব্দকে ভাষায় ও সাহিত্যে গ্রহণ না করলে এ ভাষা ও সাহিত্য কি যথার্থই আমাদের ভাষা ও সাহিত্যে পরিণত হয়েছে বলে আমরা দাবী করতে পারি ?

মুসলমানরা এদেশের জনসংখ্যার শতকরা নব্বই ভাগ। আর এটি একটি গণতান্ত্রিক দেশ। কাজেই এ দেশের ভাষা অর্থাৎ বাংলা ভাষায় মুসলমানদের ভাবধারা ও ঐহিত্য প্রতিফলিত হবে, এর বিরুদ্ধে তো কারোর বক্তব্য থাকতে পারে না এবং সে বক্তব্য গণতান্ত্রিক হবে না। কিন্তু এ ভাষায় ও সাহিত্যে মুসলিম ঐহিত্যের প্রতিফলনের প্রশ্ন যখনই ওঠে তখনই দশ ভাগ হিন্দুদের কথা ওঠে। কেন তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য কি এ ভাষায় ও সাহিত্যে স্থান পায়নি বরং তারাই সিংহভাগ দখল করে আছে এবং মুসলমানিত্বের সেখানে জায়গা নেই। আমাদের একদল বুদ্ধিজীবী এক্ষেত্রে মুসলমান ও হিন্দুর জাতিগত সমন্বয়ের প্রশ্ন ওঠান। কেন জাতিগত সমন্বয় ছাড়াই কি মুসলমান ও হিন্দুর ঐতিহ্য বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যে পাশাপাশি বসবাস করতে পারে না ? এক্ষেত্রে পাশাপাশি বসবাস করাটাই বাস্তব এবং অধিকতর ইনসাফ। শিরক ও তওহীদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা একটি সুদূরপ্রসারী নিষ্ফল প্রচেষ্টাই প্রমাণিত হবে। আমাদের প্রতিবেশী জাতি তাদের বিশ্বাসগত চিন্তাদর্শনের এক কানাকড়িও ছাড়তে রাজি নয়। কাজেই মুসলমানদের তাদের মুসলমানিত্ব ছেড়ে দিয়ে শিরক ও নাস্তিক্যবাদের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। একথাই কি আমাদের বুদ্ধিজীবীগণ বলতে চান ? এ ব্যাপারে কুরআন যথার্থই বলেছে ঃ ওয়া লান

তারদা আনকাল ইয়াহুদু ওয়া লান নাসারা হাত্তা তাত্তাবিআ মিল্লাতাহুম। অর্থাৎ 'তোমরা যতই ছাড় দাও না কেন চূড়ান্ত পর্যায়ে ইহুদি ও খৃষ্টানদের ধর্ম পুরোপুরি গ্রহণ না করা পর্যন্ত তারা সন্তুষ্ট হবে না।' এ হচ্ছে ইসলাম ও মুসলমানদের মোকাবিলায় মুশরিক, কাফের ও জড়বাদী দর্শনের অনুসারী জাতিদের দৃষ্টিভংগী।

কেন ইউরোপের সাবেক যুগোশ্লাভিয়া বসনিয়া হার্জেগোভিনায় মুসলমানদের ওপর সার্বীয়দের অমানুষিক নির্যাতন ও মুসলিম নারী ধর্ষণের বীভৎস চিত্র দেখার পরও কি আমাদের এই বুদ্ধিজীবীদের বোধোদয় হচ্ছে না? বসনিয়ায় মুসলমান ও সার্বরা একই জাতির অন্তরভুক্ত এবং তারা একই সভ্যতার আওতায় লালিত। লেবাস-পোশাক, আচার-আচরণ, ভাষা সবই তাদের এক। শুধুমাত্র এরা মুসলমান এবং তারা খৃষ্টান এটুকুই অপরাধ।

আমরা মনে করি অসম্ভব কর্মে লিপ্ত না হয়ে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের বাস্তববাদী ও গঠনমুখী হওয়া উচিত। আমাদের বাংলা ভাষাকে, যে ভাষার জন্য আমরা প্রাণ দিয়েছি, আমাদের জাতীয় ভাবধারা ও ঐতিহ্যের বাহনে পরিণত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হওয়াই হবে তাদের জন্য যথার্থ বুদ্ধিমানের কাজ। আমরা তো প্রাণ দিয়েছিলাম আমাদের মায়ের ভাষায় আমাদের কথা বলতে দেয়া হচ্ছে না বলে। কিন্তু আমাদের মায়েরা যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষায় আমরা কথা বলি, যে ভাষা আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য ও ভাবধারার বাহনে পরিণত হয়েছে, আমাদের সেই মাতৃক্রোড়ে লালিত বাংলা ভাষাকে বাদ দিয়ে তাহলে আমরা গুটিকয় চক্রান্তকারী কলেজীয় পণ্ডিতের তৈরি করা মেকী বাংলা ভাষাকে আমাদের সাহিত্যের ভাষায় পরিণত করছি কেন?

অডিও ভিডিও নির্মাণে ইসলামে সীমা নির্ধারণ

সমস্যার মূল কারণ

অডিও ভিডিও নির্মাণ যে, আমাদের কাছে সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে তার মূল কারণ আমার মনে হয় তিনটি ঃ

১. এটি একটি বিদেশী প্রযুক্তি এবং সম্পূর্ণ বিজাতীয় পরিবেশে গড়ে উঠেছে।

২. মুসলিম সমাজ এ জাতীয় পরিবেশনায় অভ্যস্ত নয়। বিশেষ করে তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ এতে আহত হবার আশংকা রয়েছে।

৩. অতি উৎসাহী হৃদয়াবেগ তাড়িত অদক্ষ ও স্বল্প দক্ষ হাতে মুসলিম সমাজ ও ইসলামী মানস ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

সমস্যার মূল কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করার পর আমি এবার আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি অডিও ও ভিডিও'র কাঠামোগত আকৃতির দিকে। অডিও'র সারা শরীর জুড়ে আছে সংলাপ এবং তার সাথে পরিবেশ ও পরিস্থিতি উপস্থাপনের জন্য আছে কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত ইশারা ইংগিত। মূলত কথাবার্তার মাধ্যমে ঘটনার একটা প্রাণবন্ত চিত্র এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়। শ্রোতাকে তার পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্য থেকে মাত্র একটি ইন্দ্রিয় এখানে ব্যবহার করতে হয়। অন্যদিকে উপস্থাপক তথা পাত্র-পাত্রীগণও একই জায়গায় অবস্থান করে শুধুমাত্র সংলাপ চালিয়ে যেতে থাকেন। এমনকি দুজনের মধ্যে সংলাপ চলার ক্ষেত্রে দুজন দুজায়গায় দাঁড়িয়ে দুই মাইকও ব্যবহার করতে পারেন। তাদের মধ্যে পরস্পর দেখাদেখিরও প্রয়োজন নেই।

অন্যদিকে ভিডিও সম্পূর্ণ চলচ্চিত্রেরই মতো। এখানে পাত্র পাত্রীকে ষ্টেজে আসতে হয়। দর্শকরা তাদের চেহারা ও অভিনয় দেখেন এবং তাদের কথাবার্তা শোনেন।

পাশ্চাত্য বিশ্বের কাছে এ প্রযুক্তি অতি পুরাতন। শুধু ইলেকট্রনিক্সের বদৌলতে আমরা এর নতুন উপস্থাপন দেখছি মাত্র। বিশ্বে এক সময় এগুলো ছিল নিছক বিনোদনের মাধ্যম। কিন্তু আজ এর সাহায্যে আদর্শ প্রচার করা হচ্ছে, জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক ধারাকে পরিচিত করানো হচ্ছে এবং উন্নত পর্যায়ের শিক্ষা দান করা হচ্ছে। যে ফললাভ করতে মানুষের বছরের পর বছর সময় লাগাতো, বই পড়ে বা শিক্ষকের কাছে গিয়ে অধ্যয়ন, আলোচনা ও পর্যালোচনার সাহায্যে দীর্ঘ সময়ে যে জ্ঞান লাভ করতে হতো,

আজ ঘরে বসে অডিও ভিডিও'র মাধ্যমে অতি অল্প সময়ে তা আরো বেশী সহজ করে ও সবিস্তারে মানুষ লাভ করতে পারছে।

এসব কারণে সারা বিশ্বে অডিও ভিডিও আজ বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ফলে এ পর্যন্ত ইসলাম প্রচার এবং ইসলামী ঐতিহ্য ও সামাজিক মূল্যবোধগুলো প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা বক্তৃতা, বিবৃতি, লেখালেখি ও বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার যে পদ্ধতি অবলম্বন করে আসছিলাম তার পাশাপাশি এ পদ্ধতি আমাদের কাছে একটি অত্যন্ত অপরিহার্য পদ্ধতি হিসেবে গণ্য হতে চলেছে। অর্থাৎ এ পদ্ধতিটিকে বাদ দিয়ে বর্তমানে দাওয়াতী ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে এগিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন।

বাস্তব ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরো একটু বেশী জটিল। অর্থাৎ এর মাধ্যমে সত্যের বিরুদ্ধে মিথ্যার প্রলয় অভিযান নতুন উদ্যম ও নতুন প্রাণ লাভ করছে। সমাজের সুকৃতিগুলোকে খতম করার জন্য দুষ্কৃতিগুলো প্রচণ্ড শক্তিতে এগিয়ে আসছে। কারণ তাদের সামনে সমস্ত ময়দান ফাঁকা। সত্যের পতাকাবাহীরা এ ময়দানে আসতে নারাজ। সুকৃতির ধারকগণ এ ময়দানটিকে দুষ্কৃতির দানবদের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে তাদের হাতে মানবতার সর্বনাশ সূচিত হচ্ছে। মনে হয় এ ক্ষেত্রে শুধু সিনেমার দৃষ্টান্তটাই তুলে ধরলে সর্বনাশের ভয়াবহ চিত্রের কিছু অংশ দেখা যেতে পারে।

পঞ্চাশ ষাট বছর আগে আমাদের দেশে যখন সিনেমার আমদানী শুরু হয় তখন থেকেই দেশের উলামায়ে কেরাম এর বিরোধিতা করে আসছেন। সিনেমা দেখা হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছেন। কিন্তু মুসলিম সমাজে সিনেমা দেখা বন্ধ হয়নি। বরং মহামারীর মতো সিনেমা হল গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছে। শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাই হয়েছেন সিনেমা পিয়াসী। এ সুযোগে একদল অর্থলোভী সিনেমার দৃশ্যে যৌন আবেদনের অবতারণা ঘটিয়ে টু পাইস কামিয়ে নিয়েছেন। এমন সব কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে যেখানে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধকে নির্দ্বিধায় পদদলিত করা হয়েছে। দর্শকদের মধ্যে বিজাতীয় কৃষ্টি ও ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে। সিনেমা দর্শকদের সংখ্যা বিপুল হারে বৃদ্ধি পেতে থেকেছে। এভাবে মুসলিম সমাজের সাম্প্রতিক নৈতিক অবক্ষয়ে সিনেমা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

অন্যদিকে সিনেমাকে যেহেতু উলামায়ে কেরাম হারাম ঘোষণা করেছেন ফলে কোনো মুসলিম প্রযোজক ও পরিচালক ভালো সিনেমা তৈরি করতে এগিয়ে আসেননি। কোন সৎ মুসলিম লেখক তাঁর সৎ ও ইসলামী মূল্যবোধ সম্পন্ন গল্প সিনেমা প্রযোজকদের হাতে তুলে দেননি। ফলে ইসলামী ঐতিহ্য ও

ভাবধারা বিরোধী দলগুলো সমস্ত ময়দান দখল করে নিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের চরম ধ্বংস সাধন করেছে। আর এখন তো ভিডিও-এর মাধ্যমে এ সিনেমা হল এসে গেছে আমাদের ঘরের মধ্যে।

এটা তো একটা প্রযুক্তি। একে আমরা আমাদের ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারি। এখন এ প্রশ্ন সামনে এসেছে যে, আমরা এ প্রযুক্তিকে আমাদের ইচ্ছামতো ব্যবহার করে আমাদের জীবন ও সমাজকে গড়ে তুলবো, না সিনেমার মতো একে দানবদের হাতে তুলে দিয়ে ঘরের মধ্যে বসে বসে নিজেদের ও সমাজের বৃহত্তর ধ্বংস প্রত্যক্ষ করতে থাকবো ? বিশেষ করে আধুনিক বিশ্বে যেখানে ইসলামী আন্দোলনগুলো বিশ্বকে নতুন জীবন রসে সমৃদ্ধ করার দাবী নিয়ে এগিয়ে আসছে সেখানে এ ক্ষেত্রে কোন্ পথ অবলম্বন করা হবে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যদিকে সময় বসে থাকছে না। সময় এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা এ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করি বা না করি আমাদের প্রতিপক্ষ কিন্তু একে ব্যবহার করে আমাদের পথে বিরাট বাধার সৃষ্টি করছে।

এসব বিষয় বিবেচনা করলে দেখা যায় অডিও ভিডিও ব্যবহার আমাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

অডিও ভিডিও নির্মাণে সমস্যা

এখন আসুন আমরা দেখি অডিও ভিডিও নির্মাণের ক্ষেত্রে শরীয়তের দিক দিয়ে আমরা কি কি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। আমরা আগেই বলেছি, এটা একটা বিদেশী প্রযুক্তি এবং সম্পূর্ণ বিজাতীয় পরিবেশে এ শিল্পটি গড়ে উঠেছে। যে সমাজে এ প্রযুক্তি গড়ে ওঠে সেখানে আছে নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা। বরং বলা যায় এ অবাধ মেলামেশাই তাদের সামাজিক ভিত্তি। কাজেই তাদের হাতে এর যে চেহারা-সুরাত ও আকৃতি-প্রকৃতি গড়ে উঠেছে এবং যেসব আভ্যন্তরীণ কায়দা-কানুন স্থিরীকৃত হয়েছে সে সবের মধ্যে রয়েছে এ নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং তাদের স্বাধীন ও যথেচ্ছ আচরণ। তবে এ উপস্থাপনার পূর্বে আরো একটা কাজ যা তারা করেছে তা হচ্ছে এই যে, সারা বিশ্বকে তারা তাদের করতলগত করেছে। আমেরিকা থেকে জাপান পর্যন্ত। সর্বত্রই তাদের কর্তৃত্ব। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব তো সামান্য ব্যাপার। ওটা তো দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আবার ভেতরেও প্রবেশ করে না। বরং বিশ্বের সর্বত্র চলছে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক কর্তৃত্ব। তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির রাজত্ব সারা বিশ্বে। অমুসলিম দেশগুলো তো আসলে সংস্কৃতির দিক দিয়ে তাদের সাথে খুব

বেশী ভিন্নতা পোষণ করে না। বরং তারা তো মূলত একই সাংস্কৃতিক জোটভুক্ত। শুধু এপিঠ আর ওপিঠ এই যা ফারাক। অন্যদিকে মুসলিম দেশগুলোতে হাজার দেড় হাজার বছরের সমস্যাবলীতে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা বিধ্বস্ত। আবার দু-তিনটি মুসলিম দেশ ছাড়া বাকি সবগুলোকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সুদীর্ঘ কাল থেকে স্বল্প কাল হলেও পাশ্চাত্য দেশগুলোর গোলামীর শিকল গলায় পরতে হয়েছিল। আর সবচেয়ে বড় আঘাত হেনেছে এ দেশগুলোয় পাশ্চাত্যের শিক্ষাব্যবস্থা। এ শিক্ষাব্যবস্থার বদৌলতে মুসলিম সমাজের মধ্যে একদল অমুসলিম এবং মুসলমানদের ঘরেই একদল অমুসলমান পয়দা হয়ে গেছে। ফলে পাশ্চাত্যের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারার সয়লাব পাশ্চাত্য বিশ্বের বাইরে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। এশিয়া আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলো এর ব্যতিক্রম নয়। তারাও হয়েছে পাশ্চাত্য সভ্যতার করতলগত। এ অবস্থায় পাশ্চাত্য থেকে আগত অডিও ভিডিও প্রযুক্তির আমাদের সমাজে ব্যাপক প্রচলন ও জনপ্রিয়তা অর্জন মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তবে পঞ্চাশ ষাট বছর পূর্বের তুলনায় আজ আমাদের সমাজের একটি অংশের সচেতনতা বেশ কিছুটা বেড়েছে এবং আজ আমরা একটি স্বাধীন জাতি হিসাবে বিরাজ করছি। ফলে দায়িত্বও আমাদের বেড়ে গেছে। আমরা কারোর দেয়া কোনো জিনিসকে না ভেবেচিন্তে বিচার বিশ্লেষণ না করে হুবহু গ্রহণ করে নিতে পারি না। বিশেষ করে আমরা যখন দেখছি এর কোনো কোনো বিষয় আমাদের প্রচলিত শরীয়তী বিধানের সাথে সংঘর্ষশীল এবং আমাদের জীবনধারার সাথে এর অনেক মূল্যবোধের মিল নেই—এক্ষেত্রে আমাদের বিচার বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করতে হবে। যা গ্রহণ করা দরকার তা গ্রহণ করতে হবে। যা বর্জন করা দরকার তা বর্জন করতে হবে। যা সংশোধন করা দরকার তা সংশোধন করে নিজের মতো করে গ্রহণ করতে হবে।

এক্ষেত্রে আমরা অডিও ভিডিও নির্মাণে যে অসংগতিগুলো পাচ্ছি তা নিম্নরূপঃ

অডিওর ক্ষেত্রে ঃ

১. নারী ও পুরুষের এক সংগে সংলাপ করতে হয়।

২. মেয়েদের কণ্ঠ পুরুষরা শোনে।

ভিডিওর ক্ষেত্রে ঃ

১. মঞ্চে পাত্র পাত্রীর উভয়কে আসতে হয়।

২. মেয়েরা চেহারা খোলা না রেখে সংলাপ ও অভিনয় করতে পারে না। আর চেহারা খোলা না রেখে অভিনয় করলে তা দর্শকদের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। ফলে ভিডিওর উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়।

৩. রিহার্সালের সময় নারী-পুরুষের দীর্ঘ ও অন্তরংগ মেলামেশা হয়, যা শরীয়ত সিদ্ধ নয়।

অসংগতি দূর করার উপায়

এ অসংগতিগুলো আমরা কিভাবে দূর করতে পারি তা এবার আমাদের দেখতে হবে।

অডিওর ক্ষেত্রে এটা খুব বেশী কঠিন নয়। আমি শুরুতেই বলেছি অডিওর বিষয়গুলো চোখে দেখা যায় না, শুধুমাত্র কানে শুনতে হয়। কাজেই নারী পুরুষের সুস্পষ্ট অভিনয়ের প্রয়োজন হয় না। তাই সংলাপের ক্ষেত্রে দুই মাইক ব্যবহার করে তাদের মাঝখানে যদি একটা পরদা টাঙিয়ে দেয়া হয় তাহলে তাদের সংলাপ রেকর্ড করায় কোনো সমস্যা দেখা দেয় না।

এখন থাকে মেয়েদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়ার কথা। সত্যিই কি মেয়েদের কণ্ঠস্বর শোনা ইসলামী শরীয়ত পুরুষদের জন্য সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছে? প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও তারা পুরুষদের সাথে কোনো কথা বলতে পারবে না? বরং আমরা দেখি কুরআন বলছে ঃ

اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا ٥ (الاحزاب : ٣٢)

'যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তাহলে বেগানা পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে।'–(সূরা আল আহযাব ঃ ৩২)

এখানে তো কথা বলতে নিষেধ করা হয়নি। বরং কোমল, মোলায়েম ও নীচুস্বরে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে, আর خضع মানেই হচ্ছে বশ্যতা স্বীকার করা, নীচু হওয়া, আস্তে ও নরম সুরে কথা বলা। কাজেই ফিশফিশ করে মোলায়েম স্বরে কথা না বলে বরং সুস্পষ্ট স্বরে দ্ব্যর্থহীন কথা বলতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ এমন স্পষ্টভাবে কথা বলতে হবে যাতে এক কথার অন্য অর্থ না হয়। কাজেই বাইরের লোকের সাথে মেয়েদের কথা বলতে নিষেধ করা হয়নি বরং সুস্পষ্ট ভাষায় কথা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সাহাবী ও সাহাবীয়াতদের জীবনে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। খোদ হযরত আয়েশা

রাদিয়াল্লাহু আনহা এর একটি বড় প্রমাণ। তিনি অত্যধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের একজন। সাহাবী ও তাবেঈগণ তাঁর কাছে এ হাদীসগুলো শুনেছেন। কাজেই তাঁর কন্ঠস্বর তো অন্যেরা শুনেছেন।

তাই নারী কণ্ঠ পুরুষদের শোনায় শরীয়তের সীমা লংঘিত হবার কোনো কারণ নেই। তবে হাঁ, যে পরিবেশ থেকে এ অডিওর সিলসিলা চালু হয়েছে তারা এক্ষেত্রে যেমন অবাধ আচরণ করে, নারী-পুরুষের সংলাপের ক্ষেত্রে যে বেলেল্লাপনা তাদের ওখানে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও স্বভাবসিদ্ধ, তা আমাদের এখানে চলতে পারে না। এখানে অবশ্যই সংলাপের মধ্যে শালীনতা এবং মুসলিম নারীর স্বাভাবিক শুচিতা বজায় থাকতে হবে। তবে যেখানে ঘটনা বর্ণনা করার বা বাস্তবতাকে তুলে ধরার ব্যাপার থাকে সেখানেও অশালীনতা ও কুরুচির গাত্রস্পর্শই যথেষ্ট। তার ভেতরে প্রবেশ করে যথেচ্ছ খেলে বেড়ানোকে মোটেই স্বীকৃতি দেয়া যাবে না। কারণ একদিকে আমরা আমাদের সমাজের কলুষিত অংশকে কলুষমুক্ত করতে চাই এবং অন্যদিকে তার যে অংশটি কলুষমুক্ত আছে তাকে কলুষতা থেকে দূরে রাখতে চাই। এ উভয়বিধ দিক বিবেচনা করলে কলুষিত বাস্তবতার স্পর্শটুকু ছাড়া আর কিছুই এখানে গ্রহণীয় ও সহনীয় হতে পারে না। আর যদি এতটুকুকেও স্বীকৃতি না দেয়া হয় তাহলে বাস্তবতা সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে এবং তা নিছক রূপকথায় পরিণত হতে পারে।

এখন আসা যায় ভিডিওর আলোচনায়। ভিডিওর ব্যাপারটি তো শ্রবণ ও দৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত। এখন আমাদের সমাজে যে পর্দা প্রথার প্রচলন রয়েছে তার সাথে হয় এর বিরোধ। মেয়েদের এখানে প্রকাশ্যে মঞ্চে আসতে হয় এবং অভিনয় করতে হয়। এক্ষেত্রে কয়েকটা ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়।

এক. নারী বর্জিত ভিডিওর প্রচলন। এ পদ্ধতি চালু আছে। কিন্তু এর বেশীদূর অগ্রসর হবার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ সমাজের একটা অংশকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে সেই সমাজের যে কোনো চিত্রই আঁকা হোক না কেন তাকে পুরোপুরি সমাজ চিত্র বলা যাবে না। বড় জোর তাকে খণ্ডিত সমাজ চিত্র বলা যাবে। তবে এর মাধ্যমে যে সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা চালানো হবে তাতে পুরুষের আংশিক সংস্কার হলেও নারীর সংস্কারের আশা করা বাতুলতা মাত্র। এর প্রমাণ আমাদের সমাজ নিজেই। আমাদের সমাজে মেয়েরা গৃহকোণে বাস করে আর পুরুষরা থাকে বাইরে। মেয়েরা মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায পড়ে না। শুক্রবার ইমাম সাহেবের নির্ধারিত খুতবা ও ওয়াজ শোনে না। কোনো ভালো ওয়াজ মাহফিলে যায় না। মাদরাসায়ও পড়ে ছেলেরা। (সম্প্রতি

কিছু মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হলেও সেগুলোর সংখ্যা অতি নগণ্য) মেয়েরা লেখাপড়া, মানে ইসলামের তথা কুরআন হাদীসের লেখাপড়া থেকে একদম দূরে। ফলে গত একশো বছরে মেয়েরা ইসলাম থেকে রয়ে গেছে শত শত কিলোমিটার দূরে। আমাদের গৃহগুলো ইসলামের দুর্গ হতে পারেনি। বরং ইংরেজী শিক্ষার বদৌলতে শিক্ষিতা মেয়েরা এবং স্বাধীনতার পরে আর্থিক অনটনের শিকার হয়ে হুড় হুড় করে ঘর থেকে বরে হয়ে আসা মেয়েরা ইসলামের লজ্জাশীলতা, শালীনতা, পরদা এবং আর এমন কোন নীতিবোধ ও মূল্যবোধ নেই যাকে নির্দয়ভাবে পদদলিত করছে না ? এগুলো সবই সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র এজন্য যে, আমাদের মেয়েদের মধ্যে ইসলামের শিক্ষা মোটেই নেই। পুরুষদের যতটুকু আছে ততটুকুর ওপর ভিত্তি করে তবু তারা কিছুটা ইসলামের নীতি মেনে চলছে। আর যেসব ঘরানায় মেয়েদের মধ্যে ইসলামের শিক্ষা জারী ছিল তারা লেখাপড়া শিখেও এবং বাইরে বের হয়েও তবুও অনেকটা ইসলামী নীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করছে। কাজেই মেয়েদেরকে আলাদা রেখে সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা চালানো নিষ্ফলই প্রমাণিত হবে, এতে সন্দেহ মাত্রও নেই। এজন্যই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের সাথে সাথে সাহাবীয়াতদেরও তালীম দিয়েছেন। পুরুষদের সাথে সাথে মেয়েদেরও মসজিদে আসার অনুমতি দিয়েছেন এবং বলেছেন ঃ

لاتمنعوا اماء الله المساجد

'আল্লাহর বাঁদীদেরকে মসজিদে আসতে বাধা দিয়ো না।' এর মানে, তখন বাধা দেয়া হতো, তাই তিনি বাধা দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি ঈদের নামাযের পরে পুরুষদের কাতার ভেদ করে মেয়েদের কাতারে চলে যেতেন এবং তাদেরকে বিশেষভাবে নসিহত করতেন। এভাবে তিনি পুরুষদের সাথে সাথে মেয়েদেরকেও সংশোধন করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ফলে সাহাবী ও সাহাবীয়াতদের মধ্যে ইলমের তফাত থাকলেও কিন্তু তা পাহাড় ও টিলার পর্যায়ে ছিল না বরং বড় পাহাড় ও ছোট পাহাড়ের মতো ছিল।

এসব দিক বিবেচনা করে পুরুষদের ভিডিও পুরুষরা দেখবে এবং মেয়েদের ভিডিও মেয়েরা দেখবে, এ ধরনের একটা পথ বেছে নেয়া যেতে পারে। এটা হয়তো একটা সাময়িক সমাধান হবে। কিন্তু এ পথেও বেশীদূরে এগুনো সম্ভব হবে না। কারণ মনে রাখতে হবে, এ ময়দানে আমরা একা নই। আমাদের প্রতিপক্ষও চলছে। তারা সংগঠিত এবং প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী। সম্প্রতি এরশাদের পতনের পরে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের রাজধানীতে ও রাজধানীর বাইরে দিনাজপুর থেকে চাটগাঁ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক লং মার্চ থেকে নিশ্চয়ই কিছুটা আন্দাজ করা গেছে।

তাই এভাবে সমাজকে দ্বিখণ্ডিত করে কতদূর বা কতদিন চলা যাবে তা অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে।

দুই. যদি মেয়েদেরকে পুরুষদের সাথে মঞ্চে আসার অনুমতি দেয়া হয় তাহলে কিভাবে তারা আসবে। অবশ্যই তারা খোলামেলা আসবে না। শরীর ঢেকে আসবে।

١- وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا - (النور : ٣١)

"এবং তারা যেন সাধারণত যা প্রকাশ থাকে তা ছাড়া তাদের যীনাত তথা সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা প্রকাশ না করে।"–(সূরা আন নূর ঃ ৩১

কুরআনের এ আয়াতে এর পরই বলা হয়েছে ঃ

٢- وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ص (النور : ٣١)

"আর তারা যেন তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ ওড়না তথা মাথার কাপড় দিয়ে আবৃত করে।"–(সূরা আন নূর ঃ ৩১)

এর সাথেই বলা হয়েছে ঃ

٣- وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاءِ ص وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَايُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ط - (النور : ٣١)

"তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, আপন মেয়েরা, তাদের মালিকানাধীন বাঁদী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং মেয়েদের গোপন অংশ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালকদের ছাড়া অন্য কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে।"–(সূরা আন নূর ঃ ৩১)

সূরা আন নূরের এ ৩১ নম্বর আয়াতের তিনটি অংশ থেকে প্রকাশ হচ্ছে ঃ

এক ঃ মেয়েরা তাদের বাপ, স্বামী, ছেলে প্রমুখ নির্দিষ্ট কিছু লোকের সামনে তাদের সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা প্রকাশ করতে পারে।

দুই ঃ তবে এ সৌন্দর্য ও সাজসজ্জার মধ্য থেকে যা প্রকাশ না করে তাদের পক্ষে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করা মুশকিল তা তারা সবার সামনে প্রকাশ করতে পারে।

তিন ঃ তাদের মাথা, গ্রীবা, বুক ঢেকে চলতে হবে।

আমার মনে হয় কুরআনের এ আয়াত এবং মহিলা সাহাবীগণের এর ওপর আমল সামনে রাখলে আমাদের জন্য পথের দিশা পাওয়া খুব কঠিন হয় না। এ আয়াত নাযিলের পরে মেয়েদের মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায পড়া বন্ধ হয়ে যায়নি। হযরত আসমা মদীনার বাইরে কয়েক কিলোমিটার দূরে তাঁর স্বামীর ক্ষেত থেকে খেজুরের কাঁদি বয়ে আনার কাজ বন্ধ করেননি। মহিলা সাহাবীগণ আগের মতো খোলামেলা চলতেন না। প্রত্যেকে কাপড় চোপড় সামলে, গলা, বুক, মাথা, শরীর ঢেকে চলতেন। মেয়েরা যেভাবে শরীয়তের সীমার মধ্যে অবস্থান করে পথে ঘাটে চলাফেরা এবং দুনিয়ার অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাম কাজ করে সেভাবে তাদের মঞ্চে আসার মধ্যে তো তেমন কোনো ফারাক দেখা যায় না।

তিন. ফারাক দেখা দেয় রিহার্সালের ক্ষেত্রে। এখানে নারী-পুরুষের দীর্ঘ ও অন্তরংগ মেলামেশার প্রয়োজন হয়। আর আসলে কোনো ভালো প্রাকটিস ও প্রশিক্ষণ ছাড়া ভালো অভিনয় সম্ভব নয়। তাই এ ভালো অভিনয়ের জন্য ক্ষতিকর পথ অবলম্বন না করে যদি নাট্য পরিবার ও ঘরানা গড়ে তোলা যায় তাহলে সেটাই হবে সবচেয়ে ভালো। ইরান নাটক ও সিনেমার ক্ষেত্রে এ পথেই এগিয়ে যাচ্ছে।

এসব কথা আমি আপনাদের সামনে বিচার বিশ্লেষণ করার জন্য রাখলাম। মূলত অডিও ভিডিও পদ্ধতির ব্যবহার যে আমাদের জন্য একান্ত অপরিহার্য এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে একে ব্যবহার করতে গিয়ে যদি আমরা এর মান খাটো করে দেই তাহলে আমাদের সব প্রচেষ্টাই নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং আমাদের প্রতিপক্ষ এই উন্নত মানের প্রযুক্তিটিকে ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে আমাদের পথকে আরো বন্ধুর করে তুলবে। তাই আমাদের দেখতে হবে ইসলামী শরীয়ত তথা কুরআন ও সুন্নাহ এ ব্যাপারে আমাদের কতটুকু সুযোগ সুবিধা দিয়েছে। তার সবটুকুই আমাদের ব্যবহার করতে হবে।

এ উদ্দেশ্যে একটা বিশেষজ্ঞ পরিষদ গঠন করা দরকার। এ পরিষদে কুরআন, হাদীস, ফিকহ ও যুগের ইলমের ওপর গভীর জ্ঞান সম্পন্ন উলামায়ে কেরাম সহ অডিও, ভিডিও এবং সমধর্মী প্রযুক্তিগুলো সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের

অধিকারী বিশেষজ্ঞগণও থাকবেন। তাঁরা প্রয়োজন অনুযায়ী একে উন্নত মানে এবং শরীয়ত সম্মতভাবে পরিচালনা করার পরামর্শ দেবেন।

আল্লাহ এ প্রযুক্তিটিকে আমাদের সঠিকভাবে ব্যবহার করার তওফীক দান করুন।

তবে এ ক্ষেত্রে মেয়েদের মঞ্চে আসা এবং নারী-পুরুষের একত্রে অভিনয়ের ব্যাপারে কিছু মূলনীতি মেনে চলতে হবে। যেমন ঃ

১. মঞ্চে নারী ও পুরুষ গা ঘেঁষাঘেষি করে দাঁড়াবেন না। অর্থাৎ একজনের শরীর অন্যজন স্পর্শ করবেন না।

২. আবেগময় মুহূর্তে একজন অন্যজনের ওপর ঢলে পড়বেন না। অথবা একজন অন্যজনকে জড়িয়ে ধরবেন না।

৩. দশ বছর বয়সের নিচের ছেলেমেয়েদের ওপর এ নিয়ম বলবত হবে না।

৪. নারী পুরুষের প্রেমালাপ গ্রহণীয় নয়। হালকা রসিকতা, যা প্রেমমুখী নয় সীমিত ক্ষেত্রে গ্রহণীয় হতে পারে।

প্রেম ও ভালোবাসা একটা স্বাভাবিক বৃত্তি ঠিকই কিন্তু মূলত এর অবস্থান মানুষের মনে। বিশেষ করে দুটি মানব ও মানবীর প্রেম মানুষের ব্যক্তিগত জীবন এমনকি তার সামাজিক জীবনেরও একটি সংগোপন বিষয়। আমাদের প্রাচ্য সমাজে একে জনসমক্ষে প্রচার করার রীতি নেই। এটা পাশ্চাত্য সমাজেরই একটা কাণ্ড। তাদের সমাজে প্রেম হচ্ছে বিয়ের রিহার্সাল এবং এটা সেখানে সম্পূর্ণ রূপে একটা দেহগত যৌন ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। তাই তারা প্রেমের প্রচারের মাধ্যমে বিয়ের অর্ধেক ফল ভোগ করতে চায়। আর এখন তাদের সমাজে বিয়ের আর সেই আগের গুরত্ব ও প্রভাব নেই। ফলে দেহগত প্রেমই তাদের ওখানে সবকিছু। তাই এক্ষেত্রে তাদের অনুকরণ করা আমাদের জন্য পুরোপুরি অনুচিত।

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় পাশ্চাত্য প্রভাব বিস্তার করেছে ব্যাপকভাবে। কিন্তু এখনো একে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়নি। এর প্রাচ্যদেশীয় কাঠামো এখনো টিকে আছে। আমাদের সমাজে বিয়ে এখনো সমাজ গঠনের মুখ্য বিষয়। আর এই বিয়ের পাত্র পাত্রীর জন্য পিতামাতা ও অভিভাবকগণের দায়িত্বকে এখনো অপ্রধান মনে করা হয় না। ছেলেমেয়ের মধ্যে স্বাভাবিক প্রেম ও ভালোবাসাকে আমাদের এখানে কখনো পরিত্যাজ্য গণ্য করা হয়নি। আবার বিয়ের ব্যাপারে এটা একমাত্র পন্থা হিসাবেও কোনোদিন গৃহীত হয়নি। মোটকথা এর বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। আর এসব কারণে প্রাচ্য সমাজে প্রেম একটি অপ্রকাশ রাখার বিষয়।

তাই মঞ্চে প্রেমমূলক কাহিনীর প্রেম বিষয় যতই অপ্রকাশ রাখা হবে ততই তা হবে প্রকৃত বাস্তবানুগ। এ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের অনুকরণ ভাঁড়ামি ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই মঞ্চে প্রেমের অভিনয়ে আবেগ ও উচ্ছ্বাস না থাকলে মান নিম্নমুখী হবার কোনো আশংকা নেই।

৫. নারী পুরুষ প্রেমালাপ ছাড়া অন্য যে কোন সংলাপে আবেগ ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে পারে।

বাংলাদেশের সংস্কৃতি ঃ একটি সাক্ষাতকার

ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে বিরাজমান বিভ্রান্তি দূর এবং বাঙালী ও বাংলাদেশী নামে যে দুটি সংস্কৃতিকে ইসলামী সংস্কৃতির প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে সে সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট করার জন্য নীচে লেখকের সাথে দৈনিক সংগ্রামের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধির সাক্ষাতকারের পূর্ণ বিবরণ মুদ্রিত হলো।

প্রশ্ন ঃ সংস্কৃতি বলতে আমরা কি বুঝবো ? বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রূপরেখা সম্পর্কে আপনার অভিমত জানাবেন কি ?

উত্তর ঃ সংস্কৃতি হচ্ছে আমাদের জীবন চর্চা।

আমাদের জীবন আমাদের বিশ্বাস ও চিন্তার ভিত্তিতে আমাদের দেশ ও পরিবেশে গঠিত লালিত ও পরিপুষ্ট হয়। এর সৌন্দর্যের বিকাশ এবং সৌরভের বিস্তার সবটুকুই আমাদের সংস্কৃতি।

বাংলাদেশে যে মানবগোষ্ঠীর বসবাস তাদের জীবন চর্চা দীর্ঘকালীন। এ দেশের বিশাল অংশ নদীর পলিবাহিত হওয়ার কারণে সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক না হলেও উত্তরের ও পূবের ভূখণ্ডে পাঁচ হাজার বছর পূর্বের মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার সমসাময়িক সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে উপমহাদেশের পশ্চিম ও উত্তর খণ্ড বহিরাগত আর্যদের দ্বারা প্রবলভাবে আক্রান্ত হলে স্থানীয় দ্রাবিড়ীয় জনবসতির মূল চাপটা উপমহাদেশের দক্ষিণ ও পূবের জনগণের ওপর এসে পড়ে। ধীরে ধীরে দক্ষিণের জনপদ আর্য প্রভাব মেনে নিলেও পূর্ব ভারতীয় বঙ্গ অঞ্চল দীর্ঘকাল এ প্রভাব ঠেকিয়ে রাখে। হাজার বছর আগে থেকে এ এলাকায় আর্য প্রভাব বিস্তার লাভ করতে থাকলেও বাংলার অধিবাসীরা কোনোদিন মনেপ্রাণে আর্যদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে স্বীকার করে নিতে পারেনি। তাই আর্যদের সংস্কারবাদী ধর্মগোষ্ঠী বা অন্য কথায় আর্য ধর্মের প্রকৃতি পূজা ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকাবাহী বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম বাংলায় দ্রুত বিস্তার লাভ করে। তারপর এসব ধর্মের মোকাবিলায় সত্য, সাম্য ও ন্যায়ের পতাকাবাহী ইসলাম প্রথম সুযোগেই দ্রুত বাংলার সমগ্র এলাকার হৃদয়ের মধ্যমণিতে পরিণত হয়। এ দৃষ্টিতে বিচার করলে এটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপারই বটে যে, উপমহাদেশের মুসলমানদের কেন্দ্রীয় শাসন এলাকা দিল্লী, উত্তর প্রদেশ এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সমগ্র জনপদ অতিক্রম করে এককভাবে পূর্ব এলাকা বাংলায় মুসলমানদের এমন অস্বাভাবিক

সংখ্যাধিক্য হলো কেমন করে ? বাংলার স্থানীয় অধিবাসীরা এত দ্রুত এত বিপুলভাবে ইসলামের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতে পারলো কিভাবে ? না, এটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। বরং এ এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য এটাই স্বাভাবিক। সমগ্র ভারতবর্ষের আর্যামি থেকে বাংলার অধিবাসীরা যেমন নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে এসেছে, ইসলামের সাথে ঠিক তার বিপরীতে দ্রুত একাত্মতা অনুভব করতে পেরেছে। এ থেকে এ এলাকার জনবসতির মানসিক গঠন আকৃতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর সংস্কৃতি মানস প্রবৃত্তিরই ফসল। তাই বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রূপরেখার সাথে প্রকৃতি পূজা, পুতুল পূজা ও শিরকের তুলনায় তওহীদ তথা আল্লাহর একক সত্তায় বিশ্বাস সবচেয়ে বেশী সামঞ্জস্য লাভের অধিকারী। বাংলার মানুষ আল্লাহতে বিশ্বাস করে ও পরকালে বিশ্বাস করে। একদিন আল্লাহর আদালাতে তাদের দুনিয়ার সমস্ত কাজের বিচার হবে এবং ভালো কাজ ও মন্দ কাজের ভিত্তিতে তারা পুরস্কার ও শাস্তি লাভ করবে, একথা তারা মানে। মৃত্যুর পর কিছুই হবে না, কাজেই দুনিয়ায় জোর, জুলুম, অত্যাচার, শোষণ, অন্যায়, পীড়ন, ভোগ, বিলাস যতো পারো করে যাও, এ ধরনের বিশ্বাস তাদের নেই। তাই তাদের সংস্কৃতি তওহীদী সংস্কৃতির একটি অংশ হওয়ার দাবীদার। এ থেকে যতটুকু ভিন্নতা সেখানে পাওয়া যাবে তাকে অস্বাভাবিক ও আরোপিত এবং সংশোধনযোগ্য বলে ধরে নিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ অনেকেই বলছেন, সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এখন চলছে রকমারি আগ্রাসন। এই আগ্রাসনের স্বরূপ সম্পর্কে কিছু বলবেন কি ?

উত্তর ঃ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন শুধু এখন নয়, সবসময় এবং সবকালেই চলে। রাজনৈতিক আগ্রাসন, অর্থনৈতিক আগ্রাসন, চিন্তাগত আগ্রাসন যেমন সবসময় সবদেশে চলছে তেমিন সাংস্কৃতিক আগ্রাসনও চলছে। দুনিয়ায় এ ধরনের আগ্রাসন চলছে এবং চলবে। কারণ বড় ও ছোট এবং দুর্বল ও প্রবল রয়েছে। তবে আগ্রাসন দু রকমের। স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক। দুর্বলের দুর্বলতা যখন প্রবলের জন্য স্বাভাবিক সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় এবং প্রবল তার শক্তির প্রভাবে ও মাধুর্যে দুর্বলকে পরাস্ত ও বিমোহিত করে তখন সেটা হয় স্বাভাবিক আগ্রাসান। যেমন খৃষ্ট্রীয় সপ্তম শতক থেকে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতার আগ্রাসন চলে দুনিয়ার বিশাল অংশে। সেটা ছিল স্বাভাবিক আগ্রাসন। কিন্তু আগ্রাসন তখনই অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে, যখন সবল শক্তির জোরে বা পরিকল্পিতভাবে দুর্বলের ওপর তা চাপিয়ে দেয়। যেমন পাশ্চাত্য সভ্যতার আগ্রাসন চলছে, সারা দুনিয়ায় অষ্টাদশ শতক থেকে নিয়ে বিংশ শতকের এ শেষাংশ পর্যন্ত। ইউরোপীয়রা সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে। সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ

চালিয়েছে। আর তাদের এ শাসন ও শোষণকে সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘকালীন করার জন্য পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। দুর্বলদের মধ্যে তারা একদল নিজেদের লোক তৈরি করে নিয়েছে। এভাবে সুপরিকল্পিতভাবে তাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের পথ বিভিন্ন দেশে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে তাদের ঔপনিবেশিক আগ্রাসন চলছে অপ্রতিহত গতিতে। এর মূলে রয়েছে তাদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনার মূল ভিত্তি হচ্ছে তাদের শিক্ষাব্যবস্থা, যা তারা এসব এলাকায় কায়েম করে গেছে। সারা দুনিয়ায় আজ তাদের তৈরি শিক্ষাব্যবস্থারই প্রচলন ও প্রবৃদ্ধিই দেখা যায়। আর এখনো ইউরোপ ও আমেরিকাই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও পঠন পাঠনের কেন্দ্রস্থল। তারা থিওরী তৈরি করে এবং সারা দুনিয়া তা গ্রহণ করে। তারা পরিচালনা করে আর আমরা পরিচালিত হই। কাজেই তাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক মনে হলেও মূলত অস্বাভাবিক এবং পরিকল্পিত।

এ দৃষ্টিতে আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে বিচার করা যায়। তবে রকমারি বলা হলেও মূলত দুটি আগ্রাসনই প্রবল। একটি সাবেক এবং অন্যটি আধুনিক। সাবেকটি ভারতীয় আর্যামি। এর মধ্যে রয়েছে ভোগবাদ পুতুল পূজা ও যৌন বিকার। আর আধুনিকটা পাশ্চাত্য ইউরো-ইয়াংকি সংস্কৃতি। এর মধ্যেও রয়েছে ভোগবাদ ও উৎকট যৌন বিকৃতি। আমাদের দেশে বই, পত্র-পত্রিকা, সিনেমা-নাটক এবং প্রচার ও বিনোদন মাধ্যমগুলোর সাহায্যেই এগুলোর বিস্তার ঘটেছে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে। বিশেষ করে ভিসিআর, ভিডিও ও স্যাটেলাইট টিভি প্রোগ্রামের ব্যাপক প্রসারের পর রাতারাতি সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রচণ্ড মূর্তি ধারণ করেছে।

প্রশ্ন ঃ আমাদের দেশে বাঙালী সংস্কৃতি, বাংলাদেশী সংস্কৃতি এবং ইসলামী সংস্কৃতির উচ্চারণ লক্ষ করা যায়। আসলে আমাদের সংস্কৃতি কোন্‌টি ?

উত্তর ঃ আমি বাংলা ভাষায় কথা বলি। আমি বাংলাদেশে বাস করি। আমার ধর্ম ইসলাম। এ তিনটি বাস্তব সত্য। বাংলা ভাষায় কথা বললে আমি বাঙালী হয়ে গেলাম। বাংলাদেশে বাস করলে আমি বাংলাদেশী হয়ে গেলাম। আর ইসলামকে ধর্ম হিসেবে মেনে নেয়ায় আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। এ তিনটির কোনটিই অস্বীকার করা যাবে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমার সাংস্কৃতিক জীবনে এ তিনটির কার কতটুকু অবদান আছে ?

আমার সাংস্কৃতিক জীবনে কি বাংলা ভাষা কোনো মৌলিক উপাদন সরবরাহ করেছে ? বাংলাদেশের কি এক্ষেত্রে কোনো মৌলিক অবদান আছে ? একমাত্র ইসলামই এক্ষেত্রে সমস্ত মৌলিক উপাদন সরবরাহ করেছে। বাংলা

ভাষা বা বাংলাদেশ এমন কোনো মৌলিক চিন্তা ও বিশ্বাসের উদগাতা নয় যার ভিত্তিতে আমার সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে উঠতে পারে। আমি একজন মানুষকে আসসালামু আলাইকুম বলি। এটা বাংলা ভাষার অবদান নয়। অথবা একজন হিন্দু নমস্কার বলে, এটাও বাংলা ভাষার অবদান নয়। তার ধর্মীয় সংস্কার। অথবা একজন নাস্তিক আদাব বা 'হেই-কেমন আছো' বলে এটাও বাংলা ভাষার অবদান নয়। যেহেতু সে ধর্ম মানে না, সংস্কার মানে না, তাই অসংস্কৃতিবান হিসেবে তার ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার ভিত্তিতে সে একটা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চায়। সেক্ষেত্রে তার এ ধর্ম-নিরপেক্ষতা একটা ধর্মে পরিণত হয় এবং তার সাংস্কৃতিক জীবনের উপাদান সরবরাহ করে। ভাষার সেখানে কোনো দখল নেই। দেশের ব্যাপারেও এ একই কথা।

মূলত ভাষা ও দেশ কোনো বিশ্বাসের জন্ম দেয় না। বিশ্বাসকে লালন করে। তাই মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের উপাদান সরবরাহের কোনো যোগ্যতা তাদের নেই। জীবনের যে যে ক্ষেত্রে তাদেরকে সাংস্কৃতিক উপাদান সরবরাহের ভিত্তি হিসেবে আনা হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে রাখা হয়েছে অন্য একটি ধর্ম বা দার্শনিক চিন্তার ছদ্মাবরণ। যেমন বাংলা ভাষার ভিত্তিতে বাঙালী সংস্কৃতি বলে যাকে আনা হচ্ছে তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে মুশরিকানা রীতি। যেমন মংগল প্রদীপ জ্বালিয়ে সভার উদ্বোধন করা হচ্ছে। এর মধ্যে থাকছে অগ্নি দেবতার আরাধনা। মুশরিকী ধর্মেরই এটা একটা রীতি। বাংলা ভাষার সাথে এর কোথাও কোনো সম্পর্ক নেই। এদেশে ব্যাপকভাবে অগ্নিদেবতার পূজা করা হয় না, যার ফলে মংগল প্রদীপ জ্বালানো এদেশের মানুষের সংস্কৃতিতে পরিণত হতে পারে। বরং ভিন দেশের বিপুল সংখ্যক অগ্নি দেবতার পূজারীদের এ সংস্কৃতিকে এ দেশের মানুষের ওপর চাপিয়ে দেবার এটা একটা কৌশল।

কাজেই আমরা দেখছি এদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের মৌল উপাদান সরবরাহকারী হচ্ছে ইসলাম। আর অন্যদিকে আমাদের বাঙালী সত্তা ও বাংলাদেশী সত্তা এ উপাদানকে লালন ও বিকশিত করায় সাহায্য করছে। ইসলাম কোনো স্থানীয় সত্তাকে অস্বীকার করে না। ইসলাম একথা স্বীকার করে যে, لِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ 'প্রত্যেকের একটা দিক আছে, সেদিকে সে মুখ ফিরিয়ে রাখে, তবে তোমরা ভালো ও কল্যাণের দিকে এগিয়ে যাও।'-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৮) এই ভালো ও কল্যাণ হচ্ছে ইসলাম। সমগ্র কুরআনে এই ভালো ও কল্যাণের বিধান পেশ করা হয়েছে। কুরআন যাকে বলে ভালো ও কল্যাণ সেটাই ভালো ও কল্যাণ এবং কুরআন যাকে বলে খারাপ ও অকল্যাণ সেটাই খারাপ ও অকল্যাণ। তাই ইসলামী

মানদণ্ডে যাবতীয় স্থানীয় ও অন্যান্য বিষয়াবলীকে বিচার করে গ্রহণ করতে হবে। ইসলামের মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের সাথে সংঘর্ষশীল হলে তাকে পরিত্যাগ করতে হবে। আর সামঞ্জস্যশীল হলে গ্রহণ করে নিতে হবে অথবা সংস্কারযোগ্য হলে সংস্কার করে গ্রহণ করে নিতে হবে।

এভাবে ইসলামী সংস্কৃতি তার বাঙালী ও বাংলাদেশী সত্তাকে স্বীকার করে নিয়ে এদেশে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ আমাদের সংস্কৃতির বিকাশের পথে প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলো কি ? এ প্রতিবন্ধকতাগুলো দূরীকরণে আমরা কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি ?

উত্তর ঃ এক ঃ আমাদের সংস্কৃতির বিকাশের পথে প্রথম বাধা হচ্ছে আমাদের অজ্ঞতা। যে জীবন দর্শনটি আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের মৌলিক উপাদান সরবরাহ করছে তার সম্পর্কে আমাদের বিপুল পরিমাণ অজ্ঞতা রয়েছে। তার অনেক বিধি বিধান আমাদের জানা নেই। আবার অনেক বিধি বিধানকে বাস্তবে প্রয়োগ করার মতো যোগ্যতাও আমাদের নেই। ফলে আমাদের জীবনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা অন্য জীবন দর্শনের কোনো বিধানকে সুবিধাজনক মনে করে আমাদের জীবনে প্রয়োগ করছি। এর ফলে আমাদের জীবন ক্ষেত্রে ভিন্ন সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটছে।

এজন্য ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ করে কুরআন ও হাদীসের বিধান সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞানার্জন এবং তার প্রয়োগ পদ্ধতি আয়ত্ব করা আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে পরিণত হয়েছে।

দুই ঃ সংস্কৃতি তো জীবন চর্চা। আমরা যদি যথার্থ ইসলামী জীবন চর্চা করি তাহলে আমাদের জীবন অংগনে ইসলামী সংস্কৃতিরই বিকাশ সাধিত হবে। কিন্তু নানা কারণে আমরা ইসলামী জীবন যাপন করতে পারছি না। আমরা একটা মিশ্র জীবন যাপন করছি। আমাদের প্রবল পরাক্রান্ত প্রতিবেশীর মুশরিকানা জীবনধারায় গত আট নয়শো বছর থেকে আমরা কমবেশী কিছুটা প্রভাবিত হয়ে আসছি। তার ওপর ইংরেজের দুশো বছরের গোলামী আমাদের পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সহজ শিকারে পরিণত করেছে।

তাই জনগণের সামনে সঠিক ইসলামী শিক্ষাকে তুলে ধরতে হবে। আমাদের জীবনে শিরক, বিদআত এবং প্রকৃত ইসলামী অনুশাসন বিরোধী প্রত্যেকটি কাজকে চিহ্নিত করতে হবে। রাষ্ট্রীয় ও গণপর্যায়ে এগুলো সংশোধনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

তিন ঃ ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে বিভ্রান্তি দূর করতে হবে। বাঙালী ও বাংলাদেশী নামে যে দুটি সংস্কৃতিকে ইসলামী সংস্কৃতির প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে সে সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট করতে হবে। এ সম্পর্কে আমরা কিছুটা আলোচনা ইতিপূর্বে করেছি। এ বিভ্রান্তি ছড়াবার জন্য আমাদের দেশে প্রকাশনা ও প্রচার মিডিয়াকে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই এদিকে আমাদের নজর দিতে হবে। প্রকাশনা ও প্রচার মিডিয়ার মাধ্যমেই এই বিভ্রান্তি দূর করতে হবে।

মূলত ইসলাম একটা প্রগতিশীল ও যুক্তিধর্মী জীবন দর্শন। জীবনের বাস্তবতার সাথে এর সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। কাজেই বাস্তব গ্রাহ্য যুক্তিপ্রমাণের মাধ্যমে এর শিক্ষা ও জীবন বিধানকে সুস্পষ্ট ও প্রবল করাই হবে একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এপথে অগ্রসর হলে সকল প্রকার বিভ্রান্তি দূর করা সম্ভব হবে।

চার ঃ যে কথাটা আমরা বিশেষ করে বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে, اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ। ইসলাম একটা সচল জীবন বিধান এবং মানুষের জন্য আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান।(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯) শুধু তাই নয়, وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবন বিধান আল্লাহ গ্রহণ করবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন।–(আলে ইমরান ঃ ৮৫) আজ থেকে চৌদ্দ শো বছর আগে থেকে এ বিধান প্রচলিত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য এ বিধানই একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন বিধান হিসেবে থাকবে। কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ ও তাঁর রসূল এ বিধানের মূল ধারাগুলো বর্ণনা করেছেন এবং এর প্রয়োগ পদ্ধতি দেখিয়ে দিয়েছেন। সেই মূলধারাগুলো থেকে বিধানগুলো আহরণ করে আমাদের জীবনে সেগুলো প্রয়োগের কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। প্রত্যেক যুগে সমস্যার ভিন্নতার কারণে এক যুগের বিধান আর এক যুগে অচল হয়ে যায়। কিন্তু ইসলামী বিধান যেমন সর্বজনীন তেমনি সর্বকালীন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর হাজার বছর পর্যন্ত দুনিয়ার অর্ধেক এলাকার বিভিন্ন প্রকৃতির জনগোষ্ঠীর হাজার বছরের পরিবর্তনশীল জীবন অংগনে এ বিধান প্রতিষ্ঠিত থাকাই এর সর্বকালীনতার প্রমাণ। পরবর্তীকালের মুসলিম জনগোষ্ঠী এর প্রয়োগ ক্ষমতার যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম না হওয়ার কারণেই এ বিধানের সচলতায় আজ সন্দেহ পোষণ করা হচ্ছে। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ এবং ইসলামী বিধান প্রয়োগে অক্ষম মুসলমানরা আজ প্রচলিত অন্য বিধান গ্রহণ করে তাদের সাংস্কৃতিক জীবনকে পংকিলতায় পরিপূর্ণ করে তুলেছে।

তাই আজ শুধু ইসলামী বিধানকে জানলে হবে না, এর প্রয়োগ ক্ষমতাও আমাদের অর্জন করতে হবে। নবীর পরে সাহাবা এবং তাঁদের পরে তাবেয়ী, তাবা-তাবেয়ী ও আয়েম্মায়ে মুজতাহিদীন তাদের নিজেদের যুগে যেভাবে ইসলামের সীমানার মধ্যে অবস্থান করে একে প্রয়োগ করেছেন ঠিক তেমনি আজ আমাদেরও তাদের প্রয়োগ পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বাধীনভাবে এ বিধান প্রয়োগের কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। যদি এ কৌশল আয়ত্ব না করা যায়, তাহলে আমাদের জীবনের বিভিন্নমুখী পরিবর্তিত সমস্যাগুলোর ইসলামী বিধান অনুযায়ী সমাধান সম্ভব হবে না। পূর্ববর্তী লোকদের সমাধান বহু ক্ষেত্রে বর্তমানে জটিলতার সৃষ্টি করছে। তাদের যুগে যেটি যথার্থ ছিল বর্তমানের পরিবর্তিত পরিবেশ ও সমস্যার ক্ষেত্রে তা মোটেই সুস্থ ও স্বাভাবিক হচ্ছে না। ফলে সাধারণ মানুষ তা গ্রহণ না করে ভিন্নমুখী হচ্ছে। এখান থেকেই দেখা দিচ্ছে সাংস্কৃতিক বৈকল্য ও নৈরাজ্য। এবং এখান থেকেই শুরু হচ্ছে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন।

তাই আমাদের সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য আমাদের চলতে হবে আমাদের পথে, অন্যের পথে নয়।

রসূলুল্লাহর (স) শিক্ষানীতি

শিক্ষা জাতিকে কেবল উন্নতই করে না, তাকে জীবনীশক্তিও সরবরাহ করে। শিক্ষা যতই বিস্তার লাভ করে জাতিও ততই সমৃদ্ধ ও বিত্তবান হতে থাকে। যে জাতির মধ্যে শিক্ষা লাভের আগ্রহ সৃষ্টি হয়, প্রকৃতি তার জন্য তার সমস্ত সম্পদ স্তুপীকৃত করে এবং সমস্ত গোপন সম্পদ উদগীরণ করে দেয়। প্রকৃতি হচ্ছে শিক্ষার ভাণ্ডার এবং মানুষের মস্তিষ্ক এ ভাণ্ডারের দরোজা। এক কথায় বলা যায়, শিক্ষা আল্লাহর একটা অসীম নিয়ামত।

প্রথম মানুষ আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেই আল্লাহ তাঁকে শিক্ষা দান করলেন, যে শিক্ষা ও যে জ্ঞান ফেরেশতাদের ছিল না। ওয়া আল্লামা আদামাল আসমা-আ কুল্লাহা "আর আদমকে তিনি শিখিয়ে দিলেন সমস্ত জিনিসের নাম।" আর এই জ্ঞানের ভিত্তিতে আদমের সামনে ফেরেশতাদেরকে লা-জওয়াব করে দিলেন। আদম তাদের কাছ থেকে নিজের মর্যাদা আদায় করে নিলেন। আবার আমরা দেখি শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রথম যে আয়াতগুলো নাযিল হয় সেখানেও আল্লাহ শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কুরআনের সূরা আলাকে বলা হয়েছে ঃ আল্লামা বিল কালাম, আল্লামাল ইনসানা মা-লাম ইয়া'লাম—'শিখিয়েছেন তিনি কলমের সাহায্যে মানুষকে। তাই শিখিয়েছেন যা সে জানতো না।'

তাই ইসলামের নবী প্রথম দিন থেকেই শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর রিসালাতের একটি উদ্দেশ্যই ছিল মানুষকে মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে বের করে এনে প্রকৃত জ্ঞানের সম্পদে সমৃদ্ধ করা। তাই আল্লাহ বলেছেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ق وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ۝ (الجمعة : ٢)

"সেই আল্লাহই একটি নিরক্ষর জাতির মাঝে তাদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছেন। সে তাদেরকে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে শোনায়, তাদেরকে পাক পবিত্র করে এবং তাদেরকে শেখায় কিতাব ও হিকমাত, যদিও ইতিপূর্বে তারা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে অবস্থান করছিল।"

–(সূরা আল জুমআ ঃ ২)

এভাবে আর এক জায়গায় বলেছেন ঃ 'আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন—তাদের কাছে পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে এমন একজন রসূল যে তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনায়, তাদেরকে পাক-পবিত্র করে এবং তাদেরকে শেখায় কিতাব ও হিকমাত, যদিও তারা ইতিপূর্বে ছিল সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে।'-(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৪) আরবের লোকেরা তখন অন্ধকার যুগে অবস্থান করছিল। জ্ঞান, শিক্ষা, ভদ্রতা, শিষ্টাচারের ধারে কাছেই তারা ছিল না। তাই পার্শ্ববর্তী দুই সভ্যতা ইরানী ও রোমীয় সভ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট জাতিরা তাদেরকে 'উম্মী' তথা নিরক্ষর জাতি বলতো। কিন্তু ইসলামের নবী এসে তাদেরকে শিক্ষার আলোকে এমনভাবে উদ্ভাসিত করলেন যে, এক যুগ যেতে না যেতেই তারাই হয়ে দাঁড়ালো সারা দুনিয়ার শিক্ষক। কর্ডোভা থেকে ক্যান্টন পর্যন্ত সমগ্র এলাকা মুখরিত হলো তাদের জ্ঞান চর্চায়। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কি শিক্ষানীতি অবলম্বন করেছিলেন যার ফলে একটি নিরক্ষর ও অশিক্ষিত জাতি মাত্র অর্ধ শতকের মধ্যে কেবল শিক্ষিতই হয়ে ওঠেনি বরং দুনিয়ার সমস্ত উল্লেখযোগ্য নগরে বন্দরে শিক্ষার মশাল জ্বালিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। এই শিক্ষাকে আমরা দু ভাগে ভাগ করতে পারি। একটি হচ্ছে 'কিতাব' শিক্ষা এবং অন্যটি 'হিকমত' শিক্ষা। কিতাব হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ বিধান ও অহী, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে জিব্রীলের মাধ্যমে রসূলের (স) কাছে এসেছে। এ হচ্ছে সমস্ত জ্ঞানের উৎস এবং শতকরা একশ ভাগ নির্ভুল জ্ঞান। অন্যদিকে হিকমত হচ্ছে কিতাবকে প্রয়োগ করার জ্ঞান। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির সাথে এ জ্ঞানের সরাসরি সম্পর্ক। কুরআনের সূরা আল বাকারার ২৬৯ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا 'তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে হিকমত দান করেন এবং যাকে হিকমত দান করা হয় তাকে আসলে দান করা হয় বিপুল কল্যাণ।'

এখান থেকে বুঝা যায়, হিকমতের সম্পর্ক আসলে মানুষের সুষ্ঠু ও উন্নত বিচার বুদ্ধির সাথে এবং কিতাবের জ্ঞান এ বিচার বুদ্ধিকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। কাজেই মানুষ দীনি বা দুনিয়াবী, বুদ্ধিবৃত্তিক বা অহীভিত্তিক যত প্রকার জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চা করে, যাতে মানুষের সমাজ-সভ্যতার কল্যাণ হয়, তা সবই হিকমতের পর্যায়ভুক্ত। আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তা তিনি পুরোপুরি পালন করেন এবং উম্মতের জ্ঞানার্জনের জন্য এমন একটি অহী ও বুদ্ধিবৃত্তিক বুনিয়াদ কায়েম করেন যার ভিত্তিতে পরবর্তীকালে জ্ঞান ও শিল্পের বিশাল প্রাসাদ নির্মিত হয়।

অতি অল্প সময়ে মুসলমানদের মধ্যে এমন সব বড় বড় জ্ঞানী, পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞের আবির্ভাব হয়, সমসাময়িক বিশ্বে যারা ছিলেন নজীরবিহীন।

জ্ঞান চর্চা ও জ্ঞানের বিস্তারের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম যে কাজটি করেন সেটি হচ্ছে সাহাবা কেরামকে লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করেন। আরবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র লোক লিখতে পড়তে জানতো। মক্কার কুরাইশদের মধ্যে কিছু লোক লিখতে পড়তে পারতো। কিন্তু মদীনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আসেন তখন সেখানে এদের সংখ্যা নয় দশের বেশী ছিল না। শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়াবার জন্য বদর যুদ্ধের কয়েদীদেরকে তিনি এ কাজে ব্যবহার করেন। যেসব শিক্ষিত কয়েদীর মুক্তিপণের অর্থদণ্ড আদায় করার ক্ষমতা ছিল না তাদের মুক্তিপণ তিনি এভাবে নির্ধারিত করে দেন যে, তারা প্রত্যেকে মদীনার দশটি শিশুকে লেখাপড়া শেখাতে পারলেই মুক্তি পেয়ে যাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ দৃষ্টি দেবার কারণে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল সংখ্যক সাহাবা লেখাপড়া শিখতে সক্ষম হয়েছিরেন। তিনি কেবল এখানেই ক্ষান্ত হননি বরং শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার গুরুত্বকে বারবার সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষ প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য শিক্ষা লাভ করাকে অপরিহার্য কর্তব্য ও জীবনের আবশ্যিক বিষয় হিসেবে গণ্য করেছেন।

শিক্ষা লাভ করার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দীনি শিক্ষা লাভ করার শর্ত আরোপ করা হয়নি। বরং দীনের সাথে সাথে দুনিয়াবী শিক্ষা লাভ করার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কাজেই দেখা যায়, হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেতকে (রা) তিনি ইবরানী (হিব্রু) ভাষা শেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন ইহুদী আলেম ছাড়া কেউ এ ভাষা জানতো না। কাজেই হযরত যায়েদকে ইহুদী আলেমের কাছে পড়তে হয়। এ থেকে এবং বদর যুদ্ধের কয়েদীদের ঘটনা থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, অমুসলিম শিক্ষকের কাছ থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করা যায়।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ প্রচেষ্টার ফলে মুলমানদের ঘরে ঘরে জ্ঞান চর্চা শুরু হয়ে যায়। জ্ঞান অর্জন করার ব্যাপারে মেয়েরাও পুরুষদের থেকে পিছিয়ে থাকেনি। কোনো কোনো মহিলা এতদূর অগ্রসর হয়ে যান যে, তাঁরা নিজেরা লেখাপড়া শেখার পর অন্যদেরও শেখাবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কাজেই শিফা বিনতে আবদুল্লাহ মদীনার মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসাও (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতিক্রমে তাঁর কাছ থেকে লেখাপড়া শেখেন।

সবচেয়ে বড় শিক্ষক ছিলেন নবী (স) নিজেই। একদিন নবী (স) মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে সাহাবাগণের দুটি দল দেখলেন। একটি দল যিকির, তাসবীহ ও দোয়ার মধ্যে মশগুল আছে এবং অন্য দলটি কুরআনের আয়াতের আলোচনা ও জ্ঞান চর্চা করছে। তিনি দ্বিতীয় দলটির সাথে বসে গেলেন এবং বললেন ঃ ইন্নামা বুঈছতু মুআল্লিমান–'আমাকে শিক্ষক বানিয়ে পাঠানো হয়েছে।' মসজিদে নববী ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় শিক্ষায়তন। ইতিপূর্বে মক্কায় অবস্থানকালে মক্কার সাফা পাহাড়ের ওপর দারে আরকাম ছিল তাঁর প্রথম শিক্ষায়তন। প্রতিদিন সাহাবাগণ সেখানে জমায়েত হতেন এবং তিনি তাদেরকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিতেন। মসজিদে নববীতে একটি চত্বর ছিল। ইতিহাসে এটি "সুফফা" নামে খ্যাত। এখানে নিয়মিত ছাত্র হিসেবে দিনরাত অবস্থান করে যাঁরা তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতেন তাঁদেরকে বলা হতো "আসহাবে সুফফা।"

তাঁর কাছে পুরুষরা যেমন শিক্ষা লাভ করতেন তেমনি মেয়েরাও শিক্ষা লাভ করতেন। আবার শুধু মেয়েদের জন্য বিশেষ কয়েকটা দিন নির্দিষ্ট ছিল। মসজিদে নববী ছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহেও ছিল একটি শিক্ষায়তন। এখানে নবী করীমের (স) স্ত্রী ও কন্যারা তাঁর কাছ থেকে ইলম ও হিকমত শিক্ষা লাভ করতেন। তাই কুরআনের সূরা আহযাবের ৩৪ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا "আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখবে। আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সকল বিষয়ে অবহিত।"–(সূরা আল আহযাব ঃ ৩৪) এই শিক্ষায়তনের শ্রেষ্ঠতম অবদান হচ্ছে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা। তাঁর সম্পর্কে হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর বলেন ঃ "আমি ফিকহে, চিকিৎসাশাস্ত্রে, কাব্য সাহিত্যে তাঁর চেয়ে বেশী পারদর্শী আর কাউকে দেখিনি। তাঁর সামনে যে কোনো কথাই বলা হতো তার জবাবে তিনি একটি কবিতা পাঠ করে দিতেন। আবু বুরদাহ আশয়ারী বলেন ঃ কোনো বিষয়ে জটিলতা দেখা দিলে আমরা হযরত আয়েশার (রা) কাছে যেতাম। তিনি সে ব্যাপারে আমাদের বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়ে দিতেন।"

তাঁর ভাইঝি আয়েশা বিনতে তালহা আরবের প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, আরব কবিদের কবিতাবলী ও কাব্যগ্রন্থসমূহ হুবহু শুনিয়ে দিতেন। জ্যোতির্বিদ্যায়ও তাঁর জ্ঞান ছিল বিস্ময়কর। আকাশে যে নক্ষত্রটির উদয় হতো তার সম্পর্কে সমস্ত কথাই তিনি বিস্তারিত বর্ণনা করতে থাকতেন। হিশাম

ইবনে আবদুল মালিক এ ব্যাপারটি দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও কাব্য জ্ঞান লাভ করা তো কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার নয় কিন্তু নক্ষত্রবিদ্যা আপনি কোথায় থেকে শিখলেন ? জবাব দেন ঃ এ বিদ্যা আমার খালার (হযরত আয়েশা) কাছ থেকে শিখেছি।

এ থেকে জানা যায়, সাহাবায়ে কেরামের জ্ঞান ও বিদ্যা চর্চা শুধু দীনি বিষয়াবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং একই সাথে পার্থিব বিষয়াবলীতেও তাঁরা পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন।

এভাবে জ্ঞান চর্চা এবং জ্ঞানের বিস্তার ও প্রসারের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন তা পুরোপুরি সফলকাম হয়। তিনি বলেছিলেন ঃ আনা মদীনাতুল ইলম—"আমি জ্ঞানের নগরী।" আর তাঁর সাহাবীগণ ছিলেন সেই জ্ঞান নগরীর অসংখ্য সুউচ্চ মিনার। পরবর্তীকালে জ্ঞান পিপাসুরা তাঁদের কাছে এসেছেন এবং নিজেদের পিপাসা নিবারণ করেছেন।

সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপক জ্ঞান চর্চার ফলে দুনিয়া জ্ঞানের একটি নতুন ধারার সাথে পরিচিত হয় এবং অহীর জ্ঞানের সাথে সংযুক্ত হয়ে অন্যান্য জাগতিক জ্ঞানেরও বিপুল প্রসার ঘটে। কিছুদিনের মধ্যেই সমগ্র আরব ভূখণ্ড জ্ঞানের আলোয় ঝলমলিয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে আব্বাসীয় আমলে জ্ঞান চর্চা উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়। সমগ্র ইসলামী দুনিয়ার চারদিকে মাদরাসা, মকতব ও শিক্ষায়তনে ভরে ওঠে। এসব শিক্ষায়তনে বড় বড় আলেম, পণ্ডিত ও বিভিন্ন শাস্ত্র বিশেষজ্ঞগণ অধ্যাপনায় রত থাকেন। আজকের বিশ শতকের বিশ্বে যে জ্ঞান চর্চা চলছে তার মূলে রয়েছে রসূলে আকরাম (স), সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তীকালের মুসলমানদের বিপুল জ্ঞান সাধনা। আর এ সবই সম্ভব হয়েছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষানীতির বদৌলতে।

রসূলুল্লাহর (স) শিক্ষানীতিকে আমরা সংক্ষেপে নিম্নোক্তভাবে পেশ করতে পারি–

এক ঃ জ্ঞানের মূল উৎস হচ্ছে আল্লাহর অহী।

দুই ঃ অহীভিত্তিক তথা দীনি জ্ঞানের সাথে সাথে পার্থিব ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানও অর্জন করতে হবে।

তিন ঃ পুরুষ-নারী নির্বিশেষে সবাইকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

চার ঃ মুসলিমের সাথে সাথে অমুসলিম শিক্ষকের কাছ থেকেও জ্ঞান আহরণ করা যাবে।

পাঁচ ঃ মেয়েদের শিক্ষার জন্য পৃথক ব্যবস্থাও করা যাবে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি নিরক্ষর, অনুন্নত ও দরিদ্রতম জাতির জন্য যে সহজ, সরল ও প্রভাব বিস্তারকারী শিক্ষানীতি অবলম্বন করেছিলেন এবং যে শিক্ষানীতির বদৌলতে সেই অনুন্নত যুগেও মাত্র তিরিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মুসলমানরা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত জাতিতে পরিণত হয়েছিল, আজকের বিশ শতকের উন্নত বিশ্বের কোনো মুসলিম দেশের জন্য সে শিক্ষানীতি অবলম্বনে বাধা কোথায় ? আজকের মুসলিম দেশগুলো বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর শিক্ষানীতি অবলম্বন করছে। কিন্তু এরপরও কোনো একটি মুসলিম দেশে শিক্ষিতের হার পাশ্চাত্য দেশগুলোর মতো নয়। এর কারণ এ পাশ্চাত্য ও অনৈসলামী ধাঁচের শিক্ষাগ্রহণ করার ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে অনীহা রয়ে গেছে। তারা অহী বিরোধী জ্ঞান চর্চা ও শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে বেশীদূর অগ্রসর হতে চায় না। সচেতন ও গণ প্রতিনিধিত্বের দাবীদার মুসলিম সরকারগুলোকে অবশ্যই এ বিষয়টি ভেবে দেখতে হবে।

শিক্ষা ব্যবস্থা হবে ঐতিহ্যানুসারী

ইংরেজ আমাদের দেশ শাসন করে একশো নব্বই বছর। সুবায়ে বাংলার বাইরে দিল্লী, পাঞ্জাব ও অন্যান্য এলাকা শাসন করে নব্বই বছর। কিন্তু ততদিনে আমাদের এলাকায় তার শাসন এতবেশী পাকাপোক্ত হয়ে গেছে যে, পুরো হিন্দুস্তানে সে দাপটের সাথে শাসন চালিয়ে গেছে। আর এ দাপট কায়েম হয়েছে আমাদের পূর্ণ পরাজয়ের পরেই। আমাদের বলতে আমি এখানে উপমহাদেশের মুসলমান ছাড়া অন্য জাতিগোষ্ঠীদের কথা বলছি না। তাদেরও কোনো কোনো অংশে হয়তো ইংরেজের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে কিছুটা অসন্তোষ ছিল কিন্তু সে অসন্তোষের পেছনে পরাধীনতার গ্লানি ছিল বলে আমি মনে করি না। বরং সেখানে ছিল বহু দূরদেশের সম্পূর্ণ অজানা এক প্রভুর অতি অদ্ভূত কালচার ভীতি।

আর আমাদের এ প্রতিবেশী জাতিগোষ্ঠীর বিশেষ করে হিন্দু বলে যারা নিজেদেরকে জাহির করেন (অবশ্য আর্য বংশোদ্ভূত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ছাড়া, যারা বর্ণ হিন্দুদের প্রধান দুই শক্তিশালী শাসক গোষ্ঠী, কাউকে হিন্দু বলা যায় না) তারা তো ইংরেজ শাসনে দিব্যি বহাল তবিয়তে থেকে গাছের ফল ভোগ করে চলছিলেন এবং সুযোগমতো তলারটাও কুড়িয়ে নিতে কসুর করছিলেন না। বরং তারাই আগে আগে থেকে ইংরেজকে পথ দেখিয়ে এনেছিলেন। দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিয়ে তারা ইংরেজের গোলামী করেছে দুশ বছর। সে সময় তাদের ইংরেজ প্রভুদের পা চাটার খায়েশ ও আনন্দ এবং তাদের একটু করুণা পাবার জন্য হাপিত্যেশ ভাব দেখলে আজকের যে কোনো স্বাধীনচেতা আত্মমর্যাদাশীল হিন্দুও লজ্জায় অধোবদন হবে।

অথচ অন্যদিকে মুসলমানরা ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেই চলেছে। একশো বছর তারা লড়াই করেছে। ইংরেজদের প্রভুত্বকে মেনে নেয়নি। এমনকি ঘৃণায় ইংরেজের চাকরি নিতে এবং ইংরেজের ভাষা শিখতেও রাজি হয়নি। এটা ছিল মুসলিমের স্বাধীনচেতা মনোবৃত্তি। আর অন্যদিকে ছিল হিন্দুর গোলামী মনোবৃত্তি। তাদের বিবেক আমাদের ইতিহাসের এ একশো বছর হিন্দুদের ইংরেজের পা চাটার এবং দেশ জুড়ে ইংরেজের হাতে মুসলিম নিধন, মুসলমানদের সম্পদ-সম্পত্তি ধ্বংস ও মুসলিম নারী নির্যাতনের ঘটনায় একটুও জাগে না। এ একশো বছরের হিন্দু মানসিকতাকে কোন্ দৃষ্টিতে বিচার করা হবে ? এ মানসিকতার কি এখন

পরিবর্তন হয়েছে ? হলে বংকিমের সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের সমালোচনায় হিন্দুরাও মুখর হতেন এবং এমনকি হাল আমলেও ভারতের পশ্চিম বংগের সাহিত্য জগতের বড় বড় সেক্যুলার দিকপালরাও মুসলিম বিদ্বেষের ধোঁয়ার ভেতর থেকে বের হয়ে সেই প্রভু সুলেমানের বন্দী বিশাল জিনের রূপ ধারণ করতে পারতেন না। একথাই বা কেন ? ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আজকের বিশ্বের বিজাতীয়দের নীতিতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। কাশ্মীর ও বসনিয়ার আজকের ঘটনাবলী এর প্রমাণ।

আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান যে রূপটা আমরা দেখছি এর কাঠামো তৈরি হয় ইংরেজ আমলে। ইংরেজরাই এতে একশো ভাগ ভূমিকা পালন করে। তারা ছিল বিদেশী শাসক এবং তাদের লক্ষ ছিল দেশ গড়া বা জাতি গঠন নয় বরং শুধু শোষণ। তবে তাদের মধ্য থেকে আবার একদল লোক এদেশে বসতি স্থাপনের অভিলাসী ছিল সংখ্যায় অতি নগণ্য হলেও। আর একদল ছিল এদেশীয় এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। এ কারণে শিক্ষাব্যবস্থায় শোষকদের যোগ্য পেয়াদা তৈরি করার সাথে সাথে সামান্য কিছু যোগ্য প্রতিভা বিকাশের সুযোগও ছিল।

এ শিক্ষাব্যবস্থায় আর কি ছিল ? আর ছিল পাশ্চাত্য চিন্তার একশো ভাগ প্রতিফলন। তাদের চিন্তা ভুল হোক আর সর্বনাশা হোক তাই এখানে পরম সত্য হিসাবে পেশ করা হতো। তার আধুনিক উপস্থাপনা, বিন্যাস ও প্রচলন পদ্ধতি ছিল এদেশবাসীর জন্য আকর্ষণীয়। ইংরেজ এদেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করে তার পূর্বে এখানে প্রচলিত ছিল মুসলমানদের প্রণীত শিক্ষা ব্যবস্থা। সে শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের তদানীন্তন জাতীয় চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু যেহেতু আমাদের তৎকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনতার সর্বজনীন অংশগ্রহণ ছিল না এবং সাধারণ মানুষের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক ছিল দূরায়ত বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে একেবারে শূন্য তাই আধুনিক সমাজ জীবনের চাহিদা পূরণে তা ছিল একান্তই অক্ষম। কেবলমাত্র ধর্মীয় ও ব্যবহারিক জীবনের কিছুটা চাহিদা পূরণের জন্য তার একটি অংশ জনতার স্বতস্ফূর্ত প্রচেষ্টায় এখনো তার সেকেলে রূপের কাঠামোয় টিকে আছে।

ইংরেজ তার নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের সময় আমাদের পূর্বোক্ত ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাব্যবস্থাকে একেবারেই মাইনাস করে দেয়। বরং তার বিপরীত ধারা সৃষ্টি করে, যাতে মুসলমানদেরকে পিছিয়ে রাখা, তাদের জাতীয় ঐতিহ্য, ভাবধারা ও ইতিহাস থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া এবং পুরোপুরি একটি গোলামের জাতিতে পরিণত করা যায়। তাদের এ শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের সময়

মুসলমানরা তাদের সাথে ছিল না। তবে শাসকদের সর্বাত্মক সহযোগী হিন্দুরা তাদের সাথে পুরোপুরি সহযোগিতা করে। ফলে এ শিক্ষাব্যবস্থা থেকে হিন্দুরা বেশ অনেকটা লাভবান হয়েছে। কিন্তু মুসলমানরা হয়েছে সর্বাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। দেড়শো বছর পরে আজ আমরা এর প্রমাণ হাতে হাতে পাচ্ছি। ইংরেজ চলে যাবার পর এ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে খুব বড় একটা পরিবর্তন করা হয়নি। মাঝে মাঝে যুগোপযোগী সামান্য একটু কাটছাঁট করা হয়েছে মাত্র। আজ আমরা দেখছি এ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের ভোটে দেশ শাসনের নামে আমাদের একটি প্রভু গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। তারা নিজেদের ইচ্ছেমতো জনগণের মাথার ওপর লাঠি ঘোরাচ্ছে। তাদের সম্পদ লুট করছে। নিজেদেরকে সমাজের প্রথম শ্রেণীর জীব মনে করছে। তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য বিদেশে পাঠাচ্ছে অথবা দেশের অভ্যন্তরে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে উচ্চ মানের শিক্ষায়তন কায়েম করেছে। এসব আমাদের সেই ইংরেজ প্রভুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে তাদের গায়ের চামড়া ছিল শাদা বা লাল আর এদের বাদামী বা কালো, এই যা তফাৎ। তারা আমাদের দীন, ঈমান, ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে পিছিয়ে রাখতো ও অবহেলা করতো, এরাও তাই করে। বরং এরা আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে তার সাথে মস্করা করে, যা তারা করার সাহস করতে পারতো না।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বির্ন্যাসের ক্ষেত্রে আমাদের কয়েকটি বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে ঃ

এক. প্রথমে একথা সামনে থাকতে হবে যে, আমরা একটি স্বাধীন জাতি, অন্যের লেজুড় বা করুণাপ্রার্থী নই। আমাদের একটি পৃথক আদর্শ, উদ্দেশ্য ও জীবনধারা আছে। আমরা একটি স্বতন্ত্র ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক ধারার অধিকারী। দুনিয়াতে মর্যাদার আসন লাভ করতে হলে আমাদের এই আদর্শ, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক ধারার চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমেই লাভ করতে হবে।

দুই. আমাদের একটি হাজার বছরের ইতিহাস আছে, যে ইতিহাস আমাদের এ উপমহাদেশে স্বাতন্ত্র দান করেছে। সে ইতিহাস থেকে আমরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবো না। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও উপমহাদেশের জাতিদের সাথে আমাদের সংঘাত চলেছে অহরহ। সে সংঘাত আমাদের বিশিষ্টতা দান করেছে।

তিন. আমরা শুধু বাংলাদেশের অধিবাসীই নই। বিশ্বব্যাপী একটি বিশাল মিল্লাতেরও অংশ, যে মিল্লাতের উদ্দেশ্যই হচ্ছে দুনিয়ায় মানুষে মানুষে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলা।

চার. আমরা এক আল্লাহে বিশ্বাসী এবং একটি সংখ্যালঘু অংশ এক আল্লাহে না হলেও ধর্মে বিশ্বাসী এবং সেখানেও এক ঈশ্বর বা এক ভগবানের ধারণা সক্রিয় রয়েছে। কাজেই দেশে আল্লাহ, ভগবান বা ঈশ্বর অস্বীকারকারী নাস্তিকদের কোনো গোষ্ঠী নেই। বিচ্ছিন্নভাবে দু' চার জন থাকলেও দেশের মানুষের জীবন ও সংস্কৃতি থেকে তারা বিচ্ছিন্ন।

পাঁচ. জাগতিক দিক দিয়ে আমরা অনুন্নত, সীমিত সম্পদের অধিকারী তবে প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। প্রকৃতি অকৃপণভাবে তার সম্পদ আমাদের দেশে ঢেলে দিয়েছে। তার যথাযথ ব্যবহার করার যোগ্যতা অর্জন করার মাধ্যমেই রয়েছে কৃতিত্ব।

ছয়. আমাদের বিপুল জনসম্পদকে সমস্যা মনে না করে যদি তাকে সুদক্ষ কারিগর ও প্রচণ্ড শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তাহলে তা যে কোনো খনিজ সম্পদের চাইতেও মূল্যবান প্রমাণিত হবে।

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার স্তর বিন্যাস

মুসলমানরা দুনিয়ায় একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা। প্রত্যেক জাতিরই একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা আছে। তবে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন মানের ও প্রকৃতির। অন্যান্য জাতির মধ্যে বহুক্ষেত্রে অভিন্নতা আছে কিন্তু মুসলমানরা সেসব ক্ষেত্রে তাদের সাথে অভিন্ন নয়। যেমন জীবন যাপনের জন্য আইন প্রণয়ন একটি মৌলিক বিষয়। প্রত্যেক জাতি তাদের জীবন যাপনের প্রয়োজন অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করে। আবার প্রয়োজন অনুযায়ী তার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে। এ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাদের জাতীয়, দেশীয় ও অন্যান্য বৈষয়িক স্বার্থই হয় প্রধান নিয়ামক। জাতীয় স্বার্থই হয় তাদের কাছে সত্য ও ন্যায়ের মাপকাঠি।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে মুসলমানরা সম্পূর্ণ ভিন্ন মূল্যবোধের অধিকারী। মুসলমানরা জীবন যাপনের জন্য যে আইন ও বিধান মেনে চলে তার মূলনীতিগুলো সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের তৈরী। এর মধ্যে কোনো রদবদল করার ক্ষমতা কোনো ব্যক্তির, পার্লামেন্টের বা সরকারের নেই। এ মূলনীতিগুলোর ভিত্তিতে মুসলিম ব্যক্তি, পার্লামেন্ট ও সরকার তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আইন প্রণয়ন ও আইনের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করতে পারে। কিন্তু মূলনীতিতে কোনো পরিবর্তন আনার ক্ষমতা তাদের নেই। সত্য ও ন্যায় তাই যা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সত্য ও ন্যায় বলেছেন, তা জাতির ও দেশের স্বার্থ বিরোধী হলেও। কারণ ইসলাম কোনো বিশেষ দেশ ও জাতিকে নয়, সমগ্র বিশ্ব মানবতাকে একটি একক হিসেবে দেখে ও চিন্তা করে। সমগ্র বিশ্ব মানবতার স্বার্থের ভিত্তিতেই সে দেশ ও জাতির স্বার্থ বিচার করে।

এভাবে বিচার করলে দেখা যায়, শিক্ষার ক্ষেত্রেও মুসলমানদের আছে একটি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী ও পৃথক মূল্যবোধ। এ দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ নির্ধারণ করার আগে আমাদের এদেশে এ দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার বৈধতা ও যৌক্তিকতা বিচার করতে হবে। এদেশে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা পঁচাশি থেকে নব্বই। শতকরা দশ থেকে পনর জন অমুসলমান। গণতন্ত্রের দৃষ্টিতে বিচার করলে পঁচাশি-নব্বই জনের কথা ও দাবীই সবসময় গৃহীত হবে। এখানে দশ পনর জনের স্বার্থে পঁচাশি-নব্বই জনের স্বার্থকে জবাই করার দাবী কোনো গণতান্ত্রিক ব্যক্তি বা জোট করতে পারেন না। এ ধরনের দাবী করা গণতন্ত্র সম্মতও হবে না। কাজেই কোনো কোটারী বা হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান

ঐক্যজোটের মতো কোনো মানবিক স্বার্থ বিরোধী একান্ত সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি প্রণোদিত জোট যদি এ ধরনের দাবী করে তবে তাদেরকে গণতন্ত্রের নয় স্বৈরতন্ত্রের পূজারী বলতে হবে। কারণ তারা দশ পনর জনকে বাঁচাবার কথা বলে পঁচাশি-নব্বই জনকে জবাই করতে চায়।

আবার মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এই পঁচাশি-নব্বই জনও ঐ দশ পনর জনের স্বার্থ রক্ষায় তাদের চাইতে কম উদ্যোগী নয়। পঁচাশি-নব্বই জনের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে দশ পনর জনকে তাদের মৌলিক স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে বলা হচ্ছে না। দশ পনর জনের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক সকল ন্যায় সংগত স্বার্থ এর ফলে কোনো প্রকার ক্ষুণ্ন হবে না। পঁচাশি-নব্বই জনের ধর্মীয় ও শরীয়তী বিধানেই এ স্বার্থ রক্ষা করার গ্যারান্টি দেয়া আছে। এ পঁচাশি-নব্বই জন যদি প্রকৃত ধর্মীয় ও শরীয়তী বিধান মেনে চলে তাহলে তারা দশ-পনর জনের স্বার্থ রক্ষা করতে বাধ্য। তাই হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান পরিষদের মত আত্মঘাতী ঐক্যজোটগুলোর পঁচাশি-নব্বই জনকে সেক্যুলার বানাবার বোকামির রোগে আক্রান্ত না হয়ে তাদেরকে খাঁটি মুসলমান ও শরীয়তী বিধান পালনকারী হতে সাহায্য করা উচিত।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, এদেশে মুসলমানরা তাদের জাতীয় ভাবধারা ও আদর্শ অনুযায়ী একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার অধিকার ও বৈধতা রাখে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের এ শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শ, উদ্দেশ্য, লক্ষ ও দৃষ্টিভংগী কি হবে? পূর্বের প্রবন্ধে আমরা আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার জনক ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষানীতি আলোচনা করেছিলাম। তাতে আমরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, লক্ষ ও মূলনীতির উল্লেখ করেছিলাম। তার একটি ছিল শোষণ এবং এ উদ্দেশ্যে একদল প্রভু প্রশাসক তৈরী করা যারা শোষকের থলি ভরে দেবে। আর দ্বিতীয়টি ছিল পাশ্চাত্যের খোদাদ্রোহী ও নৈরাজ্যবাদী চিন্তার প্রসার এবং এর সাহায্যে আমাদের ঈমান আমান ধ্বংস করা, বিশেষ করে আমাদের জিহাদী স্পৃহাকে গলা টিপে হত্যা করা, আমাদের চিন্তা জগতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা এবং একদল চিন্তার গাদ্দার ও গাদ্দার বুদ্ধিজীবি তৈরী করা। এতে তারা অনেকটা সফল হয়েছে এবং তাদের সাফল্যের যতি রেখা টানা এখানো সহজ হয়নি। তবে হ্যাঁ, তাদের দেশেই তারা নাকানি চুবানি খাচ্ছে। এতেই যা আমাদের দেশীয় বুদ্ধির গাদ্দারদের মাজায় ব্যথা দেখা দিয়েছে।

যাক এসব কথা। এখন আসি আসল কথায়। শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন

হওয়া দরকার। এর মূল কাঠামোটাই বদলে ফেলতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে শিক্ষা কেন ? শিক্ষা কার জন্য ? শিক্ষা কিভাবে ? এ তিনটি মূল প্রশ্নের ভিত্তিতেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমরা কি দেশের সমস্ত লোককে পণ্ডিত বানাতে চাই ? আমরা কি সবাইকে সুদক্ষ কারিগর বানাতে চাই ? আমরা কি বিজ্ঞানী করতে চাই ? এ ক'টি কথার মধ্যে আগের তিনটি প্রশ্নের জবাব রয়ে গেছে। অর্থাৎ আমরা শিক্ষা চাই সবার জন্য। তবে সবার জন্য এক পর্যায়ের শিক্ষা নয়। আর মূল কথা হচ্ছে, আমরা শিক্ষা চাই প্রভু তৈরী করার জন্য নয় বরং খাদেম তথা জাতির ও মানবতার সেবক তৈরী করার জন্য। আমরা শিক্ষা চাই কিন্তু বিভ্রান্ত চিন্তার উজবুক বানাবার এবং চিন্তার গাদ্দার তৈরী করার জন্য নয় বরং আল্লাহ ও রসূলের প্রতি অটল বিশ্বাসী, মানবতার বৃহত্তর স্বার্থে নিজের সংকীর্ণ স্বার্থ জলাঞ্জলি দেবার নীতিতে উদ্বুদ্ধ, সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ এবং মিথ্যা ও প্রতারণার প্রতি ঘৃণা পোষণকারী একদল উন্নত চরিত্রবান নীতিনিষ্ঠ মানুষ তৈরী করাই আমাদের লক্ষ। মূলত আমরা শিক্ষার মাধ্যমে জাগতিক ও পারলৌকিক উভয় স্বার্থ উদ্ধার করতে চাই। একদিকে আমরা হতে চাই আল্লাহর খাঁটি ও একনিষ্ঠ বান্দা এবং অন্যদিকে দুনিয়ায় সফল জীবনের অধিকারী। এটাকেই আসলে একজন মুসলমানের জীবনের লক্ষ হিসেবে আল্লাহ স্থিরীকৃত করেছেন ঃ "রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাহ, ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাহ, ওয়া কিনা আযাবান্নার।" অর্থাৎ 'হে আল্লাহ ! আমাকে দুনিয়ায় কল্যাণ দাও, আখেরাতেও কল্যাণ দাও এবং সবশেষে এই উভয় কল্যাণের মাধ্যমে পরকালের শাস্তি থেকে আমাকে বাঁচাও।' অর্থাৎ আমার বৈষয়িক জীবন এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যা আমার আখেরাতের জীবনের জন্য কল্যাণকর হবে। তাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় একদিকে যেখানে থাকবে বৈষয়িক বিষয়াবলীতে পারদর্শিতা অর্জন সেখানে অন্যদিকে থাকবে আমাদের ঈমান-আকীদা-বিশ্বাস এবং আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কের বিষয়। আর এই বৈষয়িক ও জাগতিক বিষয়াবলী নিয়ন্ত্রিত হবে আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কের মাধ্যমে। আমরা যে মুসলমান, আমরা দুনিয়ার সবকিছুর ওপর আল্লাহ ও রসূলের দেয়া মানদণ্ডে দুনিয়ার সমস্ত কাজ কারবারকে বিচার করি, এটা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সবক্ষেত্রে অন্তসলিলা ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত থাকবে। এটিই হবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার স্বতন্ত্র চেহারা। অন্যথ্যায় যদি আমরা পাশ্চাত্য বা অন্য কোনো অমুসলিম দেশের শিক্ষাব্যবস্থার অনুকরণে একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলি তাহলে তাতে আমাদের বর্তমান অবস্থার তেমন কোনো হেরফের হবে না। কারণ পাশ্চাত্যের এ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে অন্যদেশ একটি দেশপ্রেমিক জনসেবকগোষ্ঠী গড়ে তুলতে পারে কিন্তু আমরা পারি না। কারণ আমরা মুসলমান। আমাদের স্বতন্ত্র মূল্যবোধ আছে, যা তাদের নেই

এবং এ মূল্যবোধের কারণে দুনিয়ায় আমরা একটি বৃহত্তর ও মহত্তর দায়িত্ব পালন করি, যা তারা করে না। বরং তারা সংকীর্ণ স্বার্থ বুদ্ধি প্রণোদিত মোনাফিকী নীতি গ্রহণ করে সারা দুনিয়াকে শোষণ করার চক্রান্ত করে। এটাই তাদের শিক্ষাব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ নীতি।

কাজেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় তাদের শিক্ষাব্যবস্থার সাফল্য আনতে গেলে আমাদের ইসলাম ও মুসলমানিত্ব ত্যাগ করতে হবে এবং আমাদেরও কাফের, মুশরিক ও নাস্তিক হতে হবে। আমাদের দেশবাসী কি এজন্য প্রস্তুত আছে ? তারা কি ইসলাম ও মুসলমানিত্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছে ? এক কথায় এর জবাব, না। কাজেই আমাদের উলটো পথে চলে শক্তি ক্ষয় করার চেষ্টা না করে সোজা পথেই চলা দরকার, যদি আমরা এগিয়ে যেতে চাই। আর শিক্ষিত সমাজের একটা গোষ্ঠীর, যাদের আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস নড়বড়ে এবং ইসলামের প্রতি আনুগত্য ঢিলেঢালা, তাদের এই নড়বড়ে ও ঢিলে-ঢালাভাবকে শক্ত করে নেয়া ছাড়া এখন আর উপায় নেই। কারণ হেলায় ফেলায় ও অবহেলায় বেলা অনেক বয়ে গেছে। জাতির অনেক ক্ষতি তারা করেছেন। আর ক্ষতি বরদাশত করার ক্ষমতা এ জাতির নেই। ইংরেজ চলে যাবার পর থেকে গত পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে জাতিকে তারা মূসা আলাইহিস সালামের সেই কওমের মতো কেবল "ইয়াতীহুনা ফিল আরদি আরবাঈনা সানাহ" চল্লিশ বছর পর্বতের পথে-কন্দরে ঘুরিয়ে মেরেছেন। আজো যদি আমরা সঠিক পথে পা না বাড়াই তাহলে বনি ইসরাঈলের ধস আমাদের ওপরও নেমে আসবে।

এর পরবর্তী বিষয়টি থাকে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার স্তর বিন্যাস। ইংরেজ আমলে একটি স্তর-বিন্যাস করা হয়েছিল এবং এখনো সেটিই অপরিবর্তিত আছে। কিন্তু বর্তমানে এটি পুরোপুরি পুনরবিবেচনাযোগ্য। কারণ সমগ্র জাতিকে শিক্ষিত করে তোলা ইংরেজের উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য সমগ্র জাতিকে শিক্ষিত করা। কিন্তু দেশের সমস্ত মানুষের জন্য একটি সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা হতে হবে। এটিকেই আমরা প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা বলতে পারি। অর্থাৎ আমাদের দেশে একটি প্রাথমিক শিক্ষা স্তর গড়ে তুলতে হবে, যা সবার জন্য উন্মুক্ত এবং সবার জন্য সমান পর্যায়ের হবে। এ সাধারণ শিক্ষার পরেই যদি শিক্ষাকে বিশেষমুখী করে দেয়া যায় তাহলে আর সময়ের ও মেধার অপচয় হয় না। এ বিশেষমুখিনতাকে আমরা কারিগরি ও উচ্চ শিক্ষা দু' ভাগে ভাগ করতে পারি।

জনসংখ্যাকে আমাদের দেশের এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে আসা হচ্ছে। কিন্তু কোনো সরকার এর কোনো সমাধান করতে পারছে না।

কারণ সমস্যাটা শুধু অর্থনৈতিক নয়। এ সমস্যায় অর্থনীতির সাথে সাথে সামাজিক শৃংখলা এবং শিক্ষানীতিও সমানভাবে জড়িত। এ পর্যন্ত এর শুধুমাত্র নেতিবাচক সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষানীতির মাধ্যমে এর ইতিবাচক সমাধানেরও একটি অংশ আছে। অর্থাৎ কারিগরি দিকটিকে সম্প্রসারিত করে প্রতিজনের দুটি হাত, শারীরিক সামর্থ ও মস্তিষ্কের উর্বর ক্ষেত্রকে যথাযথ ব্যবহারের উপযোগী করে দেয়া। আল্লাহ পৃথিবীতে বিড়ম্বনা সৃষ্টি করার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করেননি। বরং প্রত্যেক মানুষের জন্মের সাথে সাথে তিনি তার রিজিকও দিয়ে দিয়েছেন, একথা সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে এবং মুসলমান হিসেবে আমরা বিশ্বাসও করি। কিন্তু এ রিজিক তাকে সংগ্রহ করে নিতে হবে। হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে আল্লাহ তার মুখে রিজিক ঠুঁসে দেবেন না। অর্থাৎ দেশের অর্থ ব্যবস্থা ও শিক্ষা ব্যবস্থা এমন ধাঁচে গড়ে তুলতে হবে যাতে দেশে প্রতি বছর লাখ লাখ শিক্ষিত বেকার তৈরী না হয়, লেখপড়া শিখে মাথা খাটিয়ে এবং গায় গতরে খেটে খাওয়াকে লজ্জাকর মনে না করা হয়।

মূল শিক্ষাব্যবস্থার আলোচনায়ই আমরা ফিরে আসি। শিক্ষার দ্বিতীয় স্তরে প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে আগ্রহী ও যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক কিশোর ও যুবকের জন্য কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ এবং তা অনুধাবন করা সহজসাধ্য হয়। আর নিরেট বোকা, যাদের সংখ্যা হাজারে এক দুইও হবে না এবং পাগল ছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তির মস্তিষ্কে আল্লাহ মৌলিক বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তি দান করেছেন। কোনো কাজ শেখা, কোনো কাজ করা, কোনো কাজকে আরো ভালো করে করা, যাকে আমরা এক প্রকার উদ্ভাবনই বলতে পারি, এ শক্তি প্রত্যেক ব্যক্তির মস্তিষ্কে কমবেশী আছে। মূলত দুনিয়ার বিগত হাজার হাজার বছরের ইতিহাস ও সভ্যতা সংস্কৃতি মানুষের মস্তিষ্ক শক্তির বিকাশেরই একটি মহড়া এবং তারই ইতিহাস। গুটিকয়েক অসাধারণ উদ্ভাবক ও আবিষ্কারককে আমরা বিজ্ঞানী বলি কিন্তু সাধারণ পর্যায়ে প্রত্যেকটি মানুষই আসলে একজন উদ্ভাবক ও বিজ্ঞানী। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষের এ শক্তিটিকে কাজে লাগাবার কৌশল থাকতে হবে। তাহলে প্রত্যেকটি মানুষ একটি সমস্যা না হয়ে একটি সম্পদে পরিণত হবে। আর এ সম্পদ শুধু আমাদের নিজেদের দেশের জনতার জন্য নয়, সমগ্র বিশ্ব মানবতার জন্য।

এজন্য বলতে চাই, সাধারণ শিক্ষার পরে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে কারিগরি ও বিশেষ শিক্ষার ওপর। এজন্য দেশের ও বিশ্ব চাহিদা অনুযায়ী হাজার হাজার স্কুল, কলেজ এবং কারিগরি ও বিশেষ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। এটাই হবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে বড় দিক।

এরপর আসে উচ্চ শিক্ষার কথা। উচ্চ শিক্ষা আসলে এমন একটি জিনিস যা সবার জন্য ব্যাপকভাবে উন্মুক্ত রাখা মানে শক্তির অপচয় এবং মেধা ও যোগ্যতাকে সঠিকভাবে কাজে না লাগানো। উচ্চ শিক্ষা তারই লাভ করা উচিত যার উচ্চ শিক্ষা লাভ করার যোগ্যতা ও মেধা আছে। এই সংগে সরকারী আনুকূল্য ছাড়াও ব্যক্তিগত আর্থিক সামর্থের দিকটিও সামনে রাখতে হবে। তাই উচ্চ শিক্ষাকে সাহিত্য, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, ইসলামী বিষয়াবলী যেমন কুরআন, হাদীস, ফিকহ্, উসূল, তুলনামূলক ধর্ম, দর্শন ইত্যাদির ভিত্তিতে এগিয়ে নিতে হবে এবং তার প্রত্যেকটির মধ্যে অবশ্যই গবেষণার দিকটি গুরুত্ব লাভ করবে। তবে দেশের বারো কোটি লোককে উচ্চশিক্ষা দেবার মতো করে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা একটি জাতীয় বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রাথমিক শিক্ষাই হবে জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি

বিশ শতকে আধুনিক শব্দটার খুব বেশী ব্যবহার হয়েছে। এর আগের মানে উনিশ শতকে কিন্তু এ শব্দটার এত বহুল ব্যবহার ছিল না। তখন যেন ভয়ে ভয়ে একে ঋপ খাওয়ানো হচ্ছিল। কিন্তু এ শতকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, মানুষ নিজেকে আধুনিক ভাবতে খুব বেশী সুখ বোধ করছে। জানি না সামনে যে শতকটি আসছে, সেখানে এ শব্দটি কি রূপ নেবে। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সভ্যতা কোন্ দিকে মোড় নেবে।

বিশ্ব অনেক দূর এগিয়ে গেছে। কিন্তু আমরা এ উপমহাদেশের বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষরা এখনো এগুতে পারিনি সামনের দিকে বেশী দূর। তার ওপর আবার আমাদের আছে স্বতন্ত্র ইসলামী ও মুসলমানী সত্তা। শুধু আমরাই বা কেন, সমস্ত মুসলিম বিশ্বের দিকে নজর দিলে দেখা যাবে আমাদের চাইতে অবস্থা কারোর তেমন ভালো নয়। পেছনে পড়ে আছে দুনিয়ার চুয়ান্নটি স্বাধীন মুসলিম দেশ। কিছুদিন আগেও আমাদের মতোই একই সমতলে ছিল যারা সেই দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম এশিয়ার অমুসলিম দেশগুলোও সম্প্রতি এগিয়ে চলেছে। তবে এজন্য তাদের আত্মবিক্রয় করতে হয়েছে পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছে। পাশ্চাত্যের সামাজিক মূল্যবোধগুলো তাদের সমাজেও প্রবলতর হয়েছে। তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক মূল্যবোধগুলোকে এ দেশগুলো প্রায় আত্মস্থ করে নিয়েছে। ফলে পাশ্চাত্যের মূল্যবোধের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা এসব দেশে হচ্ছে।

মুসলমানরা নিজেদেরকে ঠিক এভাবে বিকিয়ে দিতে পারেনি। এই তো এ শতকের গোড়ার দিকে তুরস্ক নিজেকে পাশ্চাত্যায়নের চেষ্টা চালালো। তাদের একটু বাড়তি সুবিধাও ছিল। তাদের দেশের কিছু অংশ ইউরোপের অন্তরভুক্তও ছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত সত্তর বছরের প্রচেষ্টায় তারা একটুও এগিয়ে যেতে পারেনি। তারা নিজেদের ভাষার বর্ণমালা, দেশের রাজনৈতিক কাঠামো, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক চেহারা সবকিছু পাল্টে দিয়ে পাশ্চাত্যের ধাঁচে গড়ে তুলতে চাইলো। এমনকি এজন্য ধর্মীয় মূল্যবোধের ওপর আঘাত হানলো। কিন্তু তুরস্ক সেই তৃতীয় বিশ্বের একটি অনুন্নত দেশই রয়ে গেছে। আমরা যখন ইউরোপের গোলামী করছি তুরস্ক তখন ইউরোপের একটা অংশের ওপর রাজত্ব করছে। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে তুরস্ক ব্যাপক পাশ্চাত্যায়নের পরও এগিয়ে যেতে পারেনি। এর কারণ কি ? এর কারণ তুরস্ক

তার ইসলামী সত্তার মূল্যায়ন করেনি। বরং তাকে তার আধুনিকায়নের পথে বাধা মনে করে কেটে বাদ দিতে চেয়েছে। এ থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, কোনো মুসলিম দেশ তার ইসলামী সত্তাকে বাদ দিয়ে নয় বরং তার যথাযথ মূল্যায়ন করে ইসলামী মূল্যবোধের মধ্য দিয়েই এগিয়ে যেতে পারে। ইসলামী মূল্যবোধ আধুনিকতার বিরোধী নয়। বরং ইসলামী মূল্যবোধই বিশ্বে সর্বাধুনিক। পাশ্চাত্য সভ্যতা যে আধুনিক মূল্যবোধের জন্ম দিয়েছে, বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানে এগিয়ে গেলেও এ আধুনিক মূল্যবোধের কারণে মানুষ এবং মানবতা ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। সংসার ভেঙ্গে পড়েছে। উগ্র জাতীয়তাবোধ হিংস্র হায়েনার রূপ নিয়েছে। পরাশক্তি মানেই হয়েছে বিশ্ব শাসন ও শোষণের অপরাজেয় শক্তি। এ সভ্যতাই জন্ম দিয়েছে সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম ও মার্ক্সবাদের মতো সামুদ্রিক হাঙ্গরের। খাদ্যের অভাবে এ হাঙ্গরের অকাল মৃত্যু না ঘটলে সমস্ত সাগরটাই ভাগাড়ে পরিণত হতো। আর পুঁজিবাদের দানব তো এ সভ্যতার সবচেয়ে বড় অভিশাপ।

ইসলামী মূল্যবোধ এসব অভিশাপ ও হাঙ্গর-হায়েনার উৎপাতমুক্ত। বিগত কয়েকশ বছর থেকে মুসলমানরা এ মূল্যবোধের যথার্থ চর্চা না করার কারণে পাশ্চাত্য সভ্যতা এভাবে বিশ্ব মানবতাকে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশ ভূখণ্ডের দিক দিয়ে ছোট হলেও বিশ্বে তার ভূমিকা সামান্য নয়। এগার কোটি জনসংখ্যার দেশ। আমরা এখন জাতীয় পুনরগঠনের পর্যায়ে অবস্থান করছি। স্বাধীনতার বিশ বছর পরেও আমরা জাতি গঠনে একটুও অগ্রসর হতে পারিনি। ইংরেজ আমলে আমরা দেখতাম আমাদের প্রতিবেশী হিন্দুরা আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে, ভাবতাম আমাদেরও দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ওদের ধরতে হবে। আর এখন স্বাধীন দেশে আমরা ভাবছি বিশ্ব অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আমাদেরও দ্রুত এগিয়ে যেতে হবে। ওদের সাথে তাল মেলাতে হবে। মানে প্রতিযোগিতার দৌড়ে সেই একই পিছিয়ে পড়া। কিন্তু এই প্রতিযোগিতার দৌড়ে যতই এগিয়ে চলতে চাই না কেন, আমরা পিছিয়ে পড়বোই। কারণ এ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নিজস্ব জাতীয় মূল্যবোধকে আমরা কোনো গুরুত্ব দিচ্ছি না। ফলে আমাদের কোনো কর্মকাণ্ড সফল পরিণতির রূপ নিতে পারছে না।

এ প্রতিযোগিতার দৌড়ে সফলকাম হতে হলে আসলে আমাদের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার দিকে নজর দিতে হবে। এটিই এমন একটি ক্ষেত্র যেখান থেকে আমাদের দৌড় তার লক্ষে পৌছুবেই। প্রাথমিক স্তরটিই হচ্ছে এ শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ পর্যায়। বিগত চল্লিশ বছর থেকে সেক্যুলার চিন্তা এ স্তরটিকে

গ্রাস করে ফেলেছে। শিশুদেরকে এমন সব জিনিস শেখানো ও পড়ানো হচ্ছে যার সাথে ইসলামী নৈতিকতা ও মূল্যবোধ তো দূরের কথা সাধারণ নীতি-নৈতিকতারও দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। বরং যা অনেক ক্ষেত্রে তাদের প্রতি মারমুখো। ফলে উন্নত নীতি-নৈতিকতা ছাড়া শিশুদের মনে মানুষ, দেশ ও দেশবাসীর প্রতি যথার্থ মমত্ববোধ সৃষ্টি হচ্ছে না। এজন্য এ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের দেশে উন্নত জাতের মানব গোষ্ঠী গড়ে উঠছে না। অশিক্ষিতদের তুলনায় শিক্ষিতদের মধ্যে নীতি-নৈতিকতার প্রতি বৃদ্ধাংগুলি দেখাবার প্রবণতা অনেক বেশী।

আমি বলবো, জাতির বিরুদ্ধে এটা একটা ষড়যন্ত্র। সমগ্র জাতিকে বিভ্রান্ত করার জন্য গত চল্লিশ বছর ধরে ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছে। কিন্তু এতে লাভটা কি হয়েছে ? যারা ষড়যন্ত্র করছেন তাদের ও তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সন্তানরাও ধ্বংস হয়েছে। তারা তাদের লক্ষে পৌছতে পারেননি, তাদের সন্তানরাও নয়। মাঝখান থেকে দেশ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কাজেই আমাদের দেশের এ প্রাথমিক শিক্ষা স্তরটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সেক্যুলার মতবাদকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেয়া উচিত।

সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছেন। অর্থাৎ এগারো কোটি মানুষকে শিক্ষিত করে তোলাই উদ্দেশ্য। অবশ্যই এ ব্যবস্থা আরো অনেক আগেই নেয়া উচিত ছিল। কারণ খাদ্যের মতো শিক্ষাও মানুষের একটি মৌলিক চাহিদা ও মৌলিক অধিকার। কাজেই দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে এ অধিকারে সমান হিস্সা দিতে হবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, একবার শিক্ষা লাভ শুরু করার পর দেশে সমস্ত মানুষ শিক্ষার শেষ পর্যায়ে পৌছার ক্ষমতা রাখে না। স্বাভাবিকভাবে শতকরা প্রায় আশি-নব্বই ভাগ ছাত্র কেবলমাত্র এ প্রাথমিক শিক্ষাটিই লাভ করতে পারবে। কাজেই এ প্রাথমিক শিক্ষাটি হতে হবে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং উদ্দেশ্যমুখী শিক্ষা। এখানে শিক্ষার ভিতটি এমনভাবে গড়ে দিতে হবে—যাতে প্রাথমিক শিক্ষা খতম করে একজন কৃষকের ছেলের আর লেখাপড়া শেখার ক্ষমতা না থাকলেও কাজের ফাঁকে বা অবসর সময়ে ঘরে বসে চাইলে সে নিজে পড়াশুনা করে আরো জ্ঞান বাড়াতে পারে। এই সঙ্গে নিজের ধর্ম, ঈমান, আকীদা, দেশ ও জাতি সম্পর্কে তার মনে একটা সুস্পষ্ট ধারণা ও ভাব জাগবে।

এ পর্যায়ে আমাদের অবশ্যই চিন্তা করতে হবে, যেখানে শতকরা আশি-নব্বই ভাগ ছেলেমেয়ের প্রাথমিক শিক্ষার গণ্ডির বাইরে আসার সম্ভাবনা নেই, সেখানে তাদের ওপর ইংরেজীর মতো একটি বিদেশী ভাষার বোঝা চাপিয়ে

তাদের পাঠ্য সময়ের অর্ধাংশ এর পেছনে ব্যয় করা শুধু অর্থহীন পণ্ডশ্রমই নয় বরং জাতীয় অর্থ, সময় ও মেধার অপচয়ও। কাজেই প্রাথমিক শিক্ষা স্তর থেকে ইংরেজী উঠিয়ে দেয়া উচিত। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করাই যার লক্ষ তাকে ঐ পাঁচ বছর অনর্থক ইংরেজী পড়ানো এক ধরনের গোলামী মনোবৃত্তিরই পরিচয় দেবে। এটা স্বাধীনতার ভাবধারার সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ তাকে কেন ইংরেজী শেখানো হচ্ছে ? এক সময় আমরা ইংরেজের গোলাম ছিলাম, শুধুমাত্র একথাটি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া ছাড়া এর পেছনে আর কি মহৎ উদ্দেশ্য থাকতে পারে ? কাজেই ইংরেজীকে এ প্রাথমিক স্তরে একদম প্রবেশের অধিকার দেয়া যাবে না।

এর ফলে ছেলে-মেয়েদের সময় অনেকটা বেঁচে যাবে এবং তাদের ভয় ও উৎকণ্ঠাও কমে যেতে থাকবে। এর পরিবর্তে তাদের ধর্মীয় শিক্ষার ভিতটি মজবুতভাবে গড়ে তুলতে হবে। দেশের শতকরা পঁচাশি-নব্বই জন মুসলিম ছেলেমেয়ের জন্য এটা অপরিহার্য হতে হবে। নয় তো দেশ ও জাতির প্রতি তাদের মনে সত্যিকার ভালোবাসা জন্মাবে না এবং দেশ ও জাতির জন্য আত্মত্যাগ করতেও তারা উদ্বুদ্ধ হবে না। অন্যদিকে অমুসলিম ছেলে-মেয়েদেরকেও দিতে হবে তাদের ধর্মীয় শিক্ষা।

এ ধর্মীয় শিক্ষাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হচ্ছে, ইসলামের মৌলিক আকীদা, বিশ্বাস, ইসলামী জীবনধারা অনুসরণ করার জন্য বিভিন্ন নীতি-নিয়ম ও ইসলামী আদব-কায়দা, শিষ্টাচার এবং কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন অনুশাসন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আরবী হরফে কুরআন মজীদ পড়া। প্রাথমিক শিক্ষার পাঁচ বছরে প্রত্যেক মুসলিম ছেলেমেয়েকে সম্পূর্ণ কুরআন মজীদ পড়িয়ে দিতে হবে। তৃতীয়টি হচ্ছে, নবী-রসূলদের ইতিহাস, শেষ নবী ও সাহাবাগণের জীবন কথা ও কার্যকলাপ এবং খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলের ঘটনাবলী। এ বিষয়বস্তুটি প্রত্যেক মুসলিম ছেলেমেয়েকে মজবুত চরিত্রের অধিকারী করবে।

এছাড়াও তাদেরকে বাংলা, অংক, সমাজ পাঠ, বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যনীতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জ্ঞান দান করতে হবে। পাঁচ বছরে একটি শিশু-কিশোর সারা দুনিয়ার জ্ঞান লাভ করতে পারে না। তবে জ্ঞানের দরোজায় সে পৌঁছে যেতে পারে। যদি শিক্ষা উদ্দেশ্যমুখী হয় এবং দেশ, জাতি ও মানবতার জন্য নিবেদিত প্রাণ শিক্ষকগণ শিক্ষা দিতে থাকেন, তাহলে পাঁচটি বছরও কম সময় নয়। বিশেষ করে যখন জীবনের সূচনাকাল, শিশু-কিশোরের ভেতর থেকে জানার আগ্রহ এবং তার আয়ত্ত ও কণ্ঠস্থ করার ক্ষমতাও অনেক বেশী।

দুনিয়ার চিরন্তন-অভ্রান্ত সত্য ও ন্যায় বিধান যে আল্লাহ ও রসূলের বাণী তাকে যদি এ শিক্ষার ভিত বানানো হয় এবং তার ভিত্তিতে সমস্ত জাগতিক শিক্ষা দান করা হয়, তাহলে পাঁচ বছরে সে মৌলিক জ্ঞান লাভ করতে এবং অনেক কিছু শিখতে পারবে। তার মধ্যে সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার প্রেরণা জেগে উঠবে, যার অভাব এখন সমগ্র জাতীয় জীবনে সবচেয়ে বেশী অনুভূত হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থার এ পরিবর্তিত কাঠামোই একমাত্র এ হতাশাগ্রস্ত জাতিকে নতুন জীবনের বাণী শোনাতে পারে।

সমগ্র দেশের সব ধরনের ছেলেমেয়েদের জন্য এ একটি সাধারণ ধরনের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার সাথে সাথে আর একটি কথাও চিন্তা করতে হবে। দেশের যে দশ বিশ ভাগ ছেলেমেয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে আরো সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চায়, তাদের শিক্ষার ভিতটিও এখান থেকেই গড়ে উঠবে। এজন্য প্রাথমিক শিক্ষাটিকে যদি দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়, তাহলে পরবর্তী পর্যায়ে তারা বাড়তি সুযোগটা লাভ করতে পারবে। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার দুটি পর্যায় এভাবে হতে পারে ঃ প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক। প্রাথমিক পাঁচ বছর এবং উচ্চ প্রাথমিক তিন বছর। প্রাথমিক বাধ্যতামূলক এবং উচ্চ প্রাথমিক বাধ্যতামূলক নয়। এ প্রাথমিক পর্যায়ে যে বিষয়গুলোর ভিত গড়ে তোলা হবে, উচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ে সেগুলোকে আরো মজবুত করা হবে। এই সংগে সামনের দিকে উচ্চ শিক্ষার জন্য যাদের ইংরেজী ভাষা শেখা প্রয়োজন, তাদের জন্য ইংরেজী শেখার প্রচলন এখান থেকেই করা যেতে পারে। যেহেতু মেধার দিক দিয়ে তারা একেবারে সাধারণ পর্যায় থেকে কিছুটা উন্নত এবং তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে না বরং তারা অনেকটা প্রয়োজন অনুভব করেই একটি বিদেশী ভাষা শিখছে—তাই তাদের পক্ষে তিন বছরে এ ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব এবং তারা সাধারণ ও নিম্ন পর্যায়ের মেধাকে সামনে রেখে যে বই তৈরী করা হয়েছিল, তার পাঁচ বছরের পাঠসহ এ তিন বছরের পাঠে তার চেয়ে অনেক বেশী আয়ত্ত করতে পারবে। এ তিন বছরে অন্যান্য বিষয়গুলোর পাঠও উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হবে।

এ সংগে আমরা বিগত আলোচনায় যে কথাটি বলেছিলাম সেটিও সামনে থাকতে হবে। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার পর শিক্ষার্থীদের সময়ের অপচয় না করে ব্যাপকভাবে কারিগরী শিক্ষার দিকে এগিয়ে নিতে হবে। তাই এ উচ্চ প্রাথমিক পর্যায় হবে তাদের জন্য—যারা কারিগরীর দিকে না গিয়ে উচ্চ শিক্ষার দিকে এগিয়ে যেতে চাইবে। আর যারা উচ্চ শিক্ষার দিকে যেতে পারবে না, তাদের মধ্যেও এমন অনেক থাকবে যাদেরকে বাপের ক্ষেতে-খামারে বা কাজে-কারবারে সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে। এদের জন্য এরা

যে পেশায় বা কাজে নিযুক্ত হচ্ছে, সে পেশায় ও কাজে পারদর্শী করে তোলার জন্য এদের উপযোগী নৈশ শিক্ষারব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ শিক্ষা নিয়মিতভাবে এলাকার স্কুলে বা গৃহেও হতে পারে। এভাবে দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের মেধা ও সামর্থ যদি রাষ্ট্রীয় তদারকীর অধীন থাকে, তাহলে এর ফলে মূলত রাষ্ট্রই লাভবান হবে এবং রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিক তার মৌলিক অধিকারও লাভ করতে পারবে—যতদূর পর্যন্ত রাষ্ট্র তা দিতে সমর্থ।

এ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আর একটি অপরিহার্য বিষয় থাকে। সেটি হচ্ছে মেয়েদের শিক্ষা। মেয়েরা মূলত সংসারের হাল ধরে। আবার দেশের অর্থনৈতিক দূরবস্থার কারণে মেয়েদেরকে কিছুটা অর্থোপার্জনের দিকেও ধাবিত হতে হচ্ছে। তাই প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং তারপরে কারিগরী শিক্ষার ব্যাপারেও ছেলেদের ও মেয়েদের শিক্ষার মধ্যে তাদের সামর্থ ও প্রয়োজন অনুযায়ী কিছুটা পার্থক্য অবশ্যই থাকতে হবে। আমাদের দেশে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় ছেলেদেরই একচেটিয়া অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এতে যেন মেয়েদের কোনো অধিকার নেই। আবার মেয়েরা মসজিদেও যেতে পারে না। ইসলামী জ্ঞানের আলোচনার কোনো মাহফিলে বা সেমিনারেও তাদের ব্যাপকভাবে যোগ দেবার সুযোগও নেই। ফলে ইসলামী ও নৈতিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা একেবারেই পিছিয়ে থাকছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে আমাদের গৃহে। আমাদের নতুন প্রজন্ম ধর্মীয় ভাবধারা ও ইসলামী মূল্যবোধের ব্যাপারে যেমন দুর্বলতা ও অজ্ঞতার শিকার হচ্ছে, তেমনি আমাদের গৃহপরিবেশও হয়ে উঠছে নৈতিক মূল্যবোধ বর্জিত এবং চারদিকে নৈতিকতা বিরোধী পরিবেশ বেষ্টিত। আমাদের রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এটা একটা অপূরণীয় ক্ষতি। কাজেই প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ব্যাপারে মেয়েদেরকে কোনো ক্ষেত্রে পিছিয়ে রাখলে চলবে না।

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা

ইসলামী জীবন দর্শনে শিক্ষাকে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব দান করা হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অবতীর্ণ অহীর ভূমিকায় আল্লাহ তাআলা শিক্ষার গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন ঃ

اقرا ○ وَرَبُّكَ الاَكرَمُ ○ الَّذِى عَلَّمَ بِالقَلَمِ ○ عَلَّمَ الانسَانَ مَالَم يَعلَم ○

'পড়ো, আর তোমার রব অত্যন্ত অনুগ্রহশীল, তিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে তিনি এমন সব জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না।'-(সূরা আলাক) সূরা 'আয যুমার ৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ শিক্ষিত ও অশিক্ষিতকে সম্পূর্ণ দুটি আলাদা স্তরে বিভক্ত করেছেন। সেখানে তিনি যারা জানে আর যারা জানে না তাদের উভয় দলকে একই স্তরভুক্ত করতে চাননি।

قُل هَل يَستَوِى الَّذِينَ يَعلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَيَعلَمُونَ-

'বল, যারা জানে আর যারা জানে না তারা উভয় কি সমান ?'

সূরা ফাতির এর ২৮ নম্বর আয়াতে আরো স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন ঃ যারা শিক্ষা লাভ করেছে, জানে ও জ্ঞান অর্জন করেছে, একমাত্র তারাই আল্লাহকে ভয় করে।

اِنَّمَا يَخشَى اللّٰهَ مِن عِبَادِهِ العُلَمَاءُ-

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ

শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহকে জানা এবং জানার মাধ্যমে তাঁকে ভয় করা ও তাঁর হুকুম মেনে চলা যায়। আর আল্লাহই তো সেই কেন্দ্রীয় সত্তা যাকে জানা প্রয়োজন এবং আল্লাহ সেই কেন্দ্রীয় সংস্থা যার হুকুম মেনে চলতে হয়। এক্ষেত্রে আল্লাহকে জানা, তাঁর হুকুম, নির্দেশ ও বিধানগুলো জানা এবং তা মেনে চলাই হচ্ছে শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি বক্তব্যে শিক্ষার পরিচিতি আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হযরত আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে তাঁর এ বক্তব্যটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে জ্ঞান ও শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন একটি বৃষ্টি ধারার মতো, যা বর্ষিত হয় একটি জমির ওপর। এ জমির কিছু অংশ উৎকৃষ্ট, ফলে তা বৃষ্টির পানি গ্রহণ করে নেয়। তার সহায়তায় সেখানে গাছপালা, শাক-সবজি, ঘাস প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আবার এ জমির একটা অংশ ছিল নিম্নভূমি। সেই নিম্নভূমি নিজের পানি জমা করে নেয়। এর মাধ্যমে আল্লাহ মানব জাতিকে লাভবান করেন। তা থেকে তারা নিজেরা পান করে, জমিতে পানি সেচ করে এবং চাষবাস করে।"

এখানে ইলম, জ্ঞান ও শিক্ষাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জীবনী শক্তি, খাদ্য ও উপায়-উপকরণ হিসেবে তুলে ধরেছেন। মূলত শিক্ষা ও জ্ঞান এমন একটি সম্পদ যা মানুষকে কেবল লাভবানই করে না, তাকে বাঁচিয়ে রাখে। এটা এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অচেতন মানুষ সচেতনতার অধিকারী হয় এবং তা মানুষের চেতনার বিকাশ সাধনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার মাধ্যমে আমরা জীবন যাপনের কলাকৌশল রপ্ত করতে শিখি। আমরা সমাজে বাস করার, মানুষের সাথে লেনদেন করার, রাষ্ট্র পরিচালনা করার, সমাজ সংস্কৃতি গড়ে তোলার এবং উন্নত জীবনের অংগনে পদচারনা করার যাবতীয় পদ্ধতি আয়ত্ত করি। শিক্ষার মাধ্যমে আমরা আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা ইতিহাস-ঐতিহ্য আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের কাছে স্থানান্তরিত করি। উপরে উল্লেখিত হাদীসে জমির একটা নিম্নভূমির কথা বলা হয়েছে, যে নিম্নভূমিতে বৃষ্টির পানি আটকে থাকে। অর্থাৎ সেখান থেকে পানি প্রয়োজন পরিমাণে চারদিকে সরবরাহ করা যাবে। নিম্নভূমি বলতে শিক্ষার বড় বড় অংগনকে বুঝানো হয়েছে। এখান থেকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য জ্ঞান সরবরাহ করা হয়। তাদেরকে আদর্শ মানুষ, আল্লাহর প্রকৃত অনুগত বান্দা, উন্নয়নশীল মানব সমাজের সংবেদনশীল সদস্য এবং রাষ্ট্রের সুযোগ্য নাগরিক রূপে গড়ে তোলা হয়।

এভাবে নবী আল্লাহর কাছ থেকে যে জ্ঞান এনেছেন তা একটি সুনির্দিষ্ট জীবন দর্শন রূপে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়। এ জীবন দর্শনের আছে একটি সামাজিক আদর্শ, একটি অর্থনৈতিক মূলনীতি, একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামো, একটি নৈতিক মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি। শত শত বছরের প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে এ মূলনীতি, আদর্শ, কাঠামো, ভিত্তি ও মূল্যবোধগুলো সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছে। তাই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা একটি নিছক হেঁয়ালি, একথা বলার সাধ্য কারোর নেই।

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা কি চায় ?

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা এমন একদল মানুষ তৈরী ও এমন একটি সমাজ কাঠামো নির্মাণ করতে চায়, যা সবসময় ও সব অবস্থায় সত্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এ শিক্ষাব্যবস্থায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মানুষেরা সবসময় মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বান জানাতে থাকবে এবং অসত্য ও অন্যায় থেকে তাদের বিরত রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে।

কুরআনে যে ধরনের মানুষের চিত্র আঁকা হয়েছে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ঠিক সেই ধরনের মানুষ তৈরী করতে চায়।

> "তারা দাঁড়ানো, বসা ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে। চিন্তা করে তারা পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টির ব্যাপারে। তারা বলে, হে আমাদের প্রভু ! তুমি এগুলো অনর্থক সৃষ্টি করোনি। হে মহান পবিত্র সত্তা ! তুমি জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদের বাঁচাও।–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯১)

> "তারা বলে ঃ আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি, হে আমাদের প্রভু, তুমি আমাদের (গোনাহগুলো) মাফ করে দাও এবং তোমারই দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৮৫)

> "কোন মুমিন নারী ও পুরুষের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রসূল যখন কোনো সিদ্ধান্ত দিয়ে দেন তারপর তাদের নিজেদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার আর কোনো ইখতিয়ার থাকে না।"–(সূরা আল আহযাব ঃ ৩৬)

এভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশের সামনে নতশির একদল অনুগত মুমিন তৈরী করাই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ। দুনিয়াকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করে শান্তি, সৌভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করাই হয় এই মানব গোষ্ঠীর কাজ।

আধুনিক ও ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতা

আমাদের দেশে প্রচলিত আধুনিক ও মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা কোনোটিই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণাংগ লক্ষ অর্জনে সক্ষম নয়। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা এমন একদল মানুষ তৈরী করতে চায়, যাদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের মূল লক্ষ জাগতিক স্বার্থ, উন্নতি ও অগ্রগতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ শিক্ষাব্যবস্থায় সৃষ্টিকর্তার কোনো বিশেষ মর্যাদা নেই এবং স্রষ্টার অমোঘ বিধান নয়, মানুষের নিজের বুদ্ধিই এখানে তাকে পরিচালিত করে।

অন্যদিকে মাদরাসা শিক্ষার যে উত্তরাধিকার আমরা লাভ করেছি, তা আসলে গোলামী যুগের একটা আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা মাত্র। তার মধ্যে ইসলামী

শিক্ষার সমগ্র দিক পরিস্ফুট হয়নি। রসূলের (স) সময় থেকে নিয়ে পরবর্তীকালে ইসলামী শিক্ষার যে বিকাশ সাধিত হয় তার মূল স্পিরিটকে এর মধ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি। তাছাড়া এ শিক্ষাব্যবস্থায় রয়েছে এমন এক পশ্চাতমুখী প্রবণতা যা আজকের গতিশীল বিশ্বের নেতৃত্ব দানে কোনোক্রমেই সক্ষম হবে না।

তাই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য আজ নতুন কাঠামোর প্রয়োজন।

ইসলামী শিক্ষার তিনটি স্তর

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যেতে পারে ঃ (১) প্রাথমিক (২) মাধ্যমিক (৩) উচ্চশিক্ষা। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা একটি সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা। দেশের সকল অধিবাসীর জন্য এ শিক্ষা হবে অপরিহার্য। ইসলাম যেহেতু একজন মুসলিমের আল্লাহর সামনে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যের ধারক তাই ইসলামী শিক্ষাও তার সমগ্র শিক্ষা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে। নামায-যাকাত-রোযা-হজ্জ ইত্যাদি ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে যেমন সে আল্লাহ ও রসূলের বিধান মেনে চলবে, নিজের মনগড়া কোনো পদ্ধতিতে ইবাদত করবে না, ঠিক তেমনি জাগতিক বিষয়গুলো পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাকে আল্লাহ ও রসূলের বিধানের আনুগত্য করতে হবে। এ ক্ষেত্রেও কোনো মনগড়া বা ধার করা বিধানের অনুসৃতি তার জন্য বৈধ হবে না। যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী, বিচার-আচার, রাষ্ট্র পরিচালনা-প্রশাসনিক কার্যক্রম ইত্যাদি সবক্ষেত্রে আল্লাহ ও রসূলের বিধান অনুযায়ী অগ্রসর হতে হবে।

প্রাথমিক স্তর

এ উদ্দেশ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রয়োজন হচ্ছে একটি শিশুর মানসিক গঠন। একটি মুসলিম শিশুর মনকে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের গৃহে পরিণত করতে হবে। আর এই গৃহকে একটি সুদৃঢ় দুর্গরূপে গড়ে তুলতে হবে। তাই ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে একটি মুসলিম শিশুর মানসিক গঠনের উপর সবচেয়ে বেশী জোর দিতে হবে। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের উপর তার প্রত্যয় এমন সুদৃঢ় ভিত্তিতে গড়ে উঠবে যার ফলে পরবর্তীকালে বিপরীত বিশ্বাসের হাজারো ধাক্কায় তার গায়ে একটুও চিড় ধরবে না বরং বিপরীত বিশ্বাসের সমস্ত গলদ তার সামনে ধীরে ধীরে ভেসে উঠবে এবং ভুল বিশ্বাসের প্রাচীরে হানা দেবার সাহসও সে একদিন অর্জন করতে সক্ষম হবে। একটি মুসলিম শিশুর ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস তার মধ্যে একটি ইসলামী দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি করবে। তার এ দৃষ্টিকোণ ধীরে ধীরে শক্তি অর্জন করতে থাকবে এবং পরবর্তীকালে জীবনের প্রত্যেকটি বিষয় সে এ দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করতে সক্ষম হবে। তাছাড়া

শিক্ষার এ প্রাথমিক স্তরে ইসলামের মূল উৎসের সাথে তাকে এমনভাবে সম্পৃক্ত করে দেয়া হবে যার ফলে আগামীতে জীবনী শক্তি লাভের ক্ষেত্রে তাকে কখনো অন্যের দ্বারস্থ হতে হবে না।

দ্বিতীয়ত শিক্ষার এ প্রাথমিক স্তরে একটি মুসলিম শিশুকে ইসলামী আচার-আচরণ, সাংস্কৃতিক জীবনবোধ পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার ইসলামী নিয়ম-বিধান এবং সুশৃংখল ও সু-সংগঠিত জীবন যাপনের পদ্ধতি শিক্ষা দিতে হবে। আচার-আচরণ ও সাংস্কৃতিক জীবনবোধের ক্ষেত্রে আমাদের আজকের দৃষ্টিভংগীর যে পরিবর্তন ঘটেছে তার প্রতি মমত্ববোধের কোনো প্রশ্নই এখানে অবান্তর।

الحكمة ضالة المؤمن। 'জ্ঞান মুমিনের হারানো সম্পদ' হিসেবে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে যতটুকু গ্রহণযোগ্য কেবল ততটুকুই রাখতে হবে, বাকি সবগুলো নির্দ্বিধায় ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে।

তৃতীয়ত এ স্তরে শিক্ষা দিতে হবে প্রাথমিক পর্যায়ে মৌলিক প্রয়োজনীয় জাগতিক বিষয়গুলো। এ বিষয়গুলো নির্বাচনে যুগ সচেতনতা, সমাজ-সচেতনতা ও ইসলামী আদর্শ সচেতনতার প্রয়োজন। একটি মুসলিম শিশুর জীবনের কোনো একটি খণ্ডিত সময়ের অপচয় যাতে না হয় সেদিকে প্রখর ও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। একটি মুসলিম শিশুর ভবিষ্যত জীবন গঠনে দূরবর্তী প্রভাব ফেলতেও সক্ষম নয়—এমন কোনো বিষয় নির্বাচনের আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই।

চতুর্থত যে বিষয়টি এ স্তরে শিশুদের শিক্ষার জন্য অপরিহার্য সেটি হচ্ছে মানসগঠনের সাথে সাথে শিশুদের চরিত্র গঠন। এটা শুধু কাগজে-কলমে নয়, হাতে-কলমেও শিক্ষার বিষয়। এ বিষয়ে তাত্ত্বিক দিকের সাথে সাথে বাস্তব ক্ষেত্রে সামান্যতম বিচ্যুতিও একটি শিশুর ভবিষ্যত জীবন গঠনের ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে যে কোনো সেক্যুলার চিন্তা ও সেক্যুলার আংগিক এমনকি কোনো নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ও শিশু মনে মারাত্মক দ্বন্দ্বের সূচনা করতে পারে, যা পরবর্তীকালে তার চরিত্রের ভিতকে দুর্বল করে দেবার জন্য যথেষ্ট হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার এ স্তরটি হতে হবে বাধ্যতামূলক এবং সাথে সাথে অবৈতনিকও। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে বলেছেন, "জ্ঞান শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরয" সেখানে ইসলামের

এবং জাগতিক মৌলিক শিক্ষা থেকে কোনো শিশুকে বঞ্চিত করা কোনো মুসলিম সরকারের জন্য কোনোক্রমেই বৈধ হতে পারে না।

এ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি শিশুর পাঁচ থেকে আট বছর সময় ব্যয় করা যেতে পারে। এ সময়কালটা হবে তার জন্য পথ নির্দেশক ও সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শিশুর জীবন ও তাদের ভবিষ্যত কার্যক্রম এই সময় কালের সাথে জড়িত। কাজেই এ সময় কালে যে কোনো প্রকার ফাঁকি ও ভেজাল লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জীবনের ক্ষতি ও বিপথগামিতার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। প্রাথমিক স্তরের এ শিক্ষাকালকে অধিকতর উদ্দেশ্যমুখী করার জন্য এ স্তরের উপযোগী কুরআন ও হাদীস শিক্ষাকে এর কেন্দ্র বিন্দুতে রাখা যেতে পারে।

মাধ্যমিক স্তর

দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে মাধ্যমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের সকল শিক্ষার্থী এ স্তরে অগ্রসর হতে সক্ষম হবে না। তাই এ স্তরের শিক্ষাটা বাধ্যতামূলক হবে না। এ স্তরের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার উত্তরোত্তর বর্ধিত হার। এই স্তরে শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশও সুস্পষ্ট রূপ নেয়। ফলে শিক্ষার্থীর কর্ম জীবনের দিক নির্দেশনাও এ স্তর থেকে শুরু হওয়া উচিত। এসব দিক বিবেচনা করে শিক্ষার্থীর নিজস্ব প্রবণতা, আগ্রহ, যোগ্যতা ও ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক স্তরে তার শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচিত হওয়া উচিত। বিশেষ করে বিশিষ্ট বিষয় ভিত্তিক, কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষার প্রতি এ স্তরে নজর দেবার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। তবে এই সংগে তার আদর্শমুখী ও উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষাও এগিয়ে যাবে।

এ ক্ষেত্রে একথা অবশ্যি মনে রাখতে হবে, আধুনিক বিজ্ঞান ও টেকনোলজির সাথে ইসলামের কোনো বিরোধ নেই। এগুলো হচ্ছে মূলত প্রয়োগিক বিষয়বস্তু। ইসলামের চাহিদা অনুযায়ী এগুলোর উদ্দেশ্য ও লক্ষের পরিবর্তনেরই শুধু প্রয়োজন। আর উদ্দেশ্য ও লক্ষের পরিবর্তনের সাথে সাথে এগুলোর ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ ক্ষেত্রেরও পরিবর্তন এসে যাবে।

জাগতিক অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে এ স্তরে কুরআন, হাদীস, ফিকহ ও ইসলামী জীবন বিধানের বিস্তারিত অধ্যয়ন অপরিহার্য বিষয় হিসেবে থাকবে।

এ স্তরে শিক্ষার্থীরা দু থেকে তিন বছর সময় ক্ষেপন করতে পারে। এ স্তরে শিক্ষার্থীদের ইসলামী বিষয়বস্তুর শিক্ষা পূর্ণতার প্রাথমিক পর্যায়ে পৌছে যেতে হবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে পূর্ণাংগ ইসলামী দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি হয়ে যাওয়াই

স্বাভাবিক। যেসব বিষয় তারা আয়ত্ত করবে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলোর পরিপূর্ণ বিশ্লেষণের ক্ষমতাও তারা লাভ করবে। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাটা থাকবে সাধারণ পর্যায়ভুক্ত। এরপর থেকে শুরু হবে উচ্চ শিক্ষা।

উচ্চ শিক্ষা

উচ্চ শিক্ষা হবে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার শেষ স্তর। সকল সাধারণ শিক্ষার্থীর এ স্তরে প্রবেশের প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা এ স্তরে প্রবেশ করলে এ শিক্ষার যথার্থ হক আদায় হওয়া সম্ভব হবে। এ উদ্দেশ্যে এ শিক্ষাটিকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সীমিত করা যেতে পারে। যে কোনো বিষয়ে পুরোপুরি পূর্ণতায় পৌছানোই হবে এ শিক্ষার লক্ষ। শিক্ষার্থীরা এ ক্ষেত্রে যে কোনো একটি বিষয়ে কামালিয়াত বা পরিপূর্ণ দক্ষতা অর্জনের লক্ষে অগ্রসর হতে পারে। এ উদ্দেশ্যে জেনারেল সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল সায়েন্স, ইতিহাস, ভাষা ও সাহিত্য, ফিকহ ও আইন, ইসলামী দাওয়াত এবং কুরআন ও হাদীসের জন্য পৃথক পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় কায়েম করা যেতে পারে। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা এমন পর্যায়ে পৌছবে যে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় ফিকহ ও আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যে কোনো ইসলামী আইনের মূল সূত্রে পৌছতে সক্ষম হবে, কুরআন ও হাদীস থেকে সংশ্লিষ্ট আইনের যথাযথ মূল্যায়ন করে তার বর্তমান প্রায়োগিক যথার্থতা বিশ্লেষণ করতে পারবে, ইসলামের দৃষ্টিতে যে কোনো পাশ্চাত্য আইনের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন ইজতিহাদ করতে সক্ষম হবে।

উচ্চ শিক্ষার এ স্তরটিকে চার থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে।

ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের এ সমগ্র শিক্ষাকালটি এমনভাবে পরিচালিত হবে যাতে একজন শিক্ষার্থী নিজেকে পরিপূর্ণ মুসলিম রূপে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। বিশ্ব সমাজের যে কোনো স্থানে অবস্থানকালে সে নিজেকে অসহায় ও অন্যের শিকার মনে করবে না। এবং ইসলামী আদর্শ, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতিনিধিত্ব সে এমনভাবে করবে যার ফলে অন্যেরা ইসলামের যথার্থ মাহাত্ম ও বরকত উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

শিক্ষকদের চরিত্র গঠন

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের চরিত্র গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামী শিক্ষা এমন একটি বিষয় যার সাথে শিক্ষার্থীর মানসিক যোগ না থাকলে তার পক্ষে যথার্থ সফলতা অর্জন সম্ভব নয়। আর শিক্ষা বিষয়ের সাথে শিক্ষার্থীদের মনের যোগের ক্ষেত্রে বৃহত্তম ভূমিকা পালন করে শিক্ষকের

উন্নত চারিত্রিক গঠন। শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে শিক্ষা বিষয়ের প্রতি গভীর আকর্ষণ সৃষ্টি সব ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। তাই মুসলিম শিক্ষকদের উন্নত চারিত্রিক বৃত্তির অধিকারী হতে হবে। নিফাক থেকে তাদের থাকতে হবে শত শত মাইল দূরে।

বিশেষ করে ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে তো শিক্ষকের উন্নত চারিত্রিক মানই শিক্ষার্থীদের অর্ধেক পথ এগিয়ে নিয়ে যাবে। এ পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা হয় অত্যধিক অনুকরণ প্রিয়। আর শিক্ষার্থীদের ইসলামী চরিত্র গঠন এ পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংগ। কাজেই শিক্ষকের মধ্যে যদি নিফাক বা অন্য পর্যায়ের কোনো চারিত্রিক দুর্বলতা থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সংক্রমিত হবে মহামারী আকারে।

এই সংগে শিক্ষকের অনুশীলনও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষকের মধ্যে উন্নত চারিত্রিক মান সৃষ্টি করার সাথে সাথে শিক্ষনীয় বিষয়ে দক্ষতা অর্জন এবং নিজের মধ্যে ইসলামী দৃষ্টিকোণ সৃষ্টিও এ পর্যায়ে অপরিহার্য। পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার যে ধারা থেকে আমাদের মূল শিক্ষক শ্রেণী এসেছেন, তাতে তাঁদের মধ্যে সব ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিকোণের অভাব রয়েছে একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নেয়া ভালো। তাই শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থিত হবার আগে শিক্ষকদের মধ্যে পরিপূর্ণ ইসলামী দৃষ্টিকোণ সৃষ্টির প্রতি আমাদের বিশেষ জোর দিতে হবে।

প্রশাসন

শিক্ষাব্যবস্থার প্রশাসনে অগণতান্ত্রিক কার্যক্রম ও দুর্নীতি ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমূলে বিনাশ করার জন্য যথেষ্ট। প্রশাসন কর্তৃপক্ষের সাথে শিক্ষকদের সম্পর্ক হতে হবে মধুর ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ, তবে কর্তব্যে অবহেলা এখানে একটি অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে বাধ্য। শিক্ষকগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুধু বেতন নিয়ে চাকুরী করবেন না বরং তাঁরা নিজেদের দীনি ও মানবিক দায়িত্ব সম্পাদন করবেন।

একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা

আসলে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা কোনো এক বিশেষ শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের শিক্ষাব্যবস্থা নয়। এটি একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা। একমাত্র জাতীয় পর্যায়েই এ শিক্ষাব্যবস্থাকে কার্যকর রূপদান করা সম্ভব। এ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া মুসলিম মিল্লাতের জাতীয় ঐতিহ্য-সংস্কৃতি আদর্শ এমনকি স্বাধীন সত্তা ও পৃথক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কোনোক্রমেই সম্ভবপর নয়।

ইসলামের উত্থান ক্রমপ্রসারমান

হিজরী পনের শতক ইসলামের পুনরুত্থানের শতক হিসেবে চিহ্নিত হতে চলেছে। বিগত পঞ্চাশ-ষাট বছর থেকে বিভিন্ন মুসলিম দেশে বিভিন্ন ইসলামী পুনরুজ্জীবন আন্দোলন চলছে। পঞ্চাশ-ষাট বছরের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে খৃষ্টীয় বিশ শতকের শেষের দিকে এসে এগুলো এখন একটি পরিণত আকৃতি লাভ করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে আমরা দেখি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আবির্ভাবের পর দু হাজার বছরের মধ্যে দুনিয়ার কোথাও খৃষ্টধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটেনি। বরং তিনি যে ধর্মের বাণী শুনিয়েছিলেন তাঁর তিরোধানের পর তা ধীরে ধীরে বিকৃত হতে থেকেছে এবং কয়েকশ বছরের মধ্যে তাঁর তওহীদী ধর্ম একটি মুশরিকী ধর্মের রূপ গ্রহণ করেছে। এজন্য তিনি ইঞ্জিল নামে যে কিতাবটি এনেছিলেন তার মধ্যে বিকৃতি সাধন করতে হয়েছে। এ বিকৃতি করার কাজ প্রকাশ্য দিবালোকেও চলছে। এভাবে খৃষ্টবাদীগণ ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান্ট, পিউরিটান ইত্যাদি যতগুলো ফেরকায় বিভক্ত হন না কেন তাদের কোনোটাই হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মূল আদর্শের ধারক হিসেবে টিকে থাকতে পারেনি। ফলে প্রকৃত খৃষ্টবাদের পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা চালাবার তো কোনো প্রশ্নই দেখা দেয়নি। বরং খৃষ্টবাদীগণ তাদের বিকৃত মতবাদের মধ্যে আরো বহু মনগড়া মতবাদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে মানব সভ্যতার ধ্বংসের আয়োজনে কোনো দিক থেকে কোনো কমতি রাখেননি।

এর আগের একটি বিরাট গোষ্ঠী ছিল হযরত মূসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের। বিগত কয়েক হাজার বছরের দুনিয়ার ইতিহাসে তারা কেবল নেতিবাচক ভূমিকাই পালন করেছে। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের জীবদ্দশায়ই তাঁর সাথে তারা সঠিক ব্যবহার করতে পারেনি। তারপর তারা বহু নবী-রসূলের প্রাণনাশ ও মর্যাদাহানি করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম প্রদত্ত বিধান সঠিকভাবে ও পুরোপুরি মেনে চলা তো দূরের কথা সবসময়ই তাকে পাশ কাটিয়ে চলার মধ্যে তারা বেশী তৃপ্তি অনুভব করেছে। বিকৃত মতবাদের আওতায় শত শত বছর থেকে তারা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ও কার্যকলাপ চালিয়ে আসছে। বর্তমানে তারা ইসরাঈলে এ সন্ত্রাসবাদকে একটি রাষ্ট্রীয় রূপ দিয়েছে। বিশ্ব সন্ত্রাসবাদের সবচেয়ে বড় আণ্ডারগ্রাউণ্ড পৃষ্ঠপোশক আমেরিকা ও তার অনুচরবৃন্দ ফ্রান্স, বৃটেন, রাশিয়া তাকে এ কাজে লাগাতার মদদ জুগিয়ে যাচ্ছে।

তৃতীয় একটি বৃহৎ ধর্মগোষ্ঠী আড়াই হাজার বছর থেকে দুনিয়ার বুকে বিরাজ করছে। মহাত্মা বুদ্ধের এ বৌদ্ধ ধর্মীয় গোষ্ঠী প্রথম দিকে সারা এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এ গোষ্ঠীর অস্তিত্ব এখনো চোখে পড়ার মতো। তবে ধর্মীয় বিকৃতি এ গোষ্ঠীটিকে এমন পর্যায়ে এনে দিয়েছে যে, এর প্রাথমিক ও আসল রূপটি আজো আবিষ্কৃত হয়নি। বিগত কোনো যুগেও এরা বিশ্বে কোনো সংস্কার আন্দোলনের জন্ম দেয়নি এবং বর্তমানেও এর অবস্থা প্রাণহীন ও নিস্তেজ।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি দুনিয়ার বিগত তিন হাজার বছরের মধ্যে কোনো ধর্মীয় মতবাদ পরবর্তীকালে আবার তার সঠিক রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। অথবা সেই মতবাদটি তার সত্যিকার প্রাণশক্তিকে নতুন প্রাণ ধারায় উদ্দীপিত করে আবার নতুনভাবেও জেগে উঠতে পারেনি। বরং ধীরে ধীরে তা বিকৃতির চরম সীমায় পৌঁছে গিয়ে নতুন নতুন মনগড়া মানবিক মতবাদের জন্ম দিয়েছে, যার ফলে বিশ্ব মানবতার ভোগান্তিই বেড়েছে।

অন্যদিকে এ মানবিক মতবাদগুলোর প্রতি লক্ষ করলে দেখা যাবে এগুলোর উদ্ভব হয়েছে এক বিশেষ যুগে, বিশেষ পরিবেশে ও বিশেষ প্রয়োজনে। সেই যুগ, পরিবেশ ও প্রয়োজনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হতেই এগুলোর জীবনী শক্তিও ফুরিয়ে গেছে। কোথাও কোনো দেশে আর এগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজনে একটি পুরাতন মতবাদের আবার নবজন্ম হয়েছে এমনটি কোথাও দেখা যায়নি। বরং নতুন নতুন মতবাদের জন্ম হয়েছে, নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে এ মতবাদগুলো অনেক নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে গেছে।

এ ক্ষেত্রে ইসলামই দেখা যাচ্ছে একমাত্র ব্যতিক্রম। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের শুরুর দিকে ইসলামের আবির্ভাব। এক হাজার বছর পর্যন্ত দুনিয়ার বিশাল এলাকায় চলে তার শাসন। প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। বিগত তিন চার'শ বছর থেকে ইসলামের এ প্রভাব নিষ্প্রভ হতে হতে মাত্র একশ' বছর থেকে একেবারে নিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। মানে, ইসলামের মূল বাণী ও ভাবধারা ঠিকই অবিকৃত থেকে যায়। কিন্তু তার প্রতি মুসলমানদের আকর্ষণ কমে যায়। তারা অন্য ভাবধারায় প্রভাবিত হতে থাকে, যা ইসলামের একেবারেই বিপরীত এবং ইসলামকে জীবন ক্ষেত্র থেকে উৎখাত করে দেয়। ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীদের নানান মনগড়া মতবাদে তারা আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও টেকনোলজিতে তাদের তেলেসমাতি মুসলমানদের একটি অংশকে বিস্ময়াবিষ্ট করে। কিন্তু জাগতিক ও বৈষয়িক জীবন যাপনকে তারা

যতই উন্নত করুক না কেন জীবন সমস্যার সমাধানে তাদের অপরিসীম ব্যর্থতা বরং জীবন ক্ষেত্রে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব এবং তাদের বৈষয়িক জীবনের সুখ-শান্তি কর্পুরের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার কারণে তাদের মতবাদগুলোর প্রতি মুসলমানদের চুম্বক আকর্ষণে ভাটা পড়তে থাকে। এমনিতেই প্রথম থেকেই একদল মুসলমান এ মতবাদগুলোর গলদ চিহ্নিত করে আসছিল। তবে সময়ের আবর্তনে এগুলোর ব্যর্থতা এগুলোর ভেতর থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থেকেছে। ফলে বিশ্বব্যাপী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানদের একটি অংশ এর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। তবে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক বঞ্চিত সাধারণ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানরা পূর্ব থেকেই ছিল এ মতবাদগুলোর বিরোধী।

কাজেই বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইসলামী বিশ্বে যে ইসলামী পুনরুজ্জীবন আন্দোলনগুলোর সূচনা হয় সেগুলো শুরুতে কেবলমাত্র শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলেও ধীরে ধীরে সাধারণ মুসলিম সমাজেও ছড়িয়ে পড়ে। আশি ও নব্বইয়ের দশকে এর সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হচ্ছে মালয়েশিয়া। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এ মুসলিম দেশটি চলতি শতকেই ইংরেজদের শাসনাধীনে ছিল। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মালয়েশিয়া ধনী দেশগুলোর পর্যায়ভুক্ত। সম্প্রতি দেশটি ব্যাপক শিল্পায়নের কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। দেশটিতে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত আছে। পাস (PAS) মালয়েশিয়ার সবচেয়ে বড় ইসলামী আন্দোলন। ছাত্রদের মধ্যে এবিআইএম (ABIM) সারাদেশের মুসলিম ছাত্র সমাজের মধ্যে ব্যাপক কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। মালয়েশিয়ার ইসলামী আন্দোলন শহরের লোকদের তুলনায় গ্রামীণ এলাকায় বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে। পাস-এর সদস্যপদ সবার জন্য উন্মুক্ত। ফলে লাখ লাখ লোক এ দলটির সাথে সংযুক্ত হয়েছে। বর্তমানে এ দলটি মালয়েশিয়ার কিলানতান-এর প্রাদেশিক সরকার পরিচালনা করছে। দেশের কৃষক, উলামা, যুব ও ছাত্র সমাজ সবার মধ্যে ইসলামী আন্দোলন সমানভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এর নেতৃত্বের বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে আলেম সমাজের বিস্তার। কিলানতান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের মধ্যে ৩৫জন হচ্ছেন দীনী মাদরাসার সনদপ্রাপ্ত আলেম এবং তারা সবাই পাস-এর সদস্য। কিলানতানের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন মাথিরী দিস আরস। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের একজন ফারিগ-আত-তাহসীল আলেম। সমগ্র প্রদেশে তিনি সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। তিনি একটি গ্রামীণ দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান। সাধারণ মানুষের মতো সাদামাটা জীবনযাপন করেন। নিজের গ্রামের বাড়িতেই বাস করেন। মুখ্যমন্ত্রী হবার পর তিনি উপনিবেশিক আমলের

সরকারী বিল্ডিং পছন্দ করেননি। কারণ তার এলাকার অধিকাংশ লোক এ ধরনের বাড়িতে বাস করে না। তার বাড়ির গেটে কোনো মিলিটারী, পুলিশ বা অন্য কোনো পাহারাদার নেই। যে কোনো লোক যে কোনো সময় তার সাথে দেখা করতে পারে। তিনি যখন গাড়িতে চলেন তখন গাড়ীতে তিনি ও তার ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ থাকে না। তার গাড়ির সামনে পেছনেও কোনো গাড়ি পথ পরিষ্কার বা পাহারা দেবার জন্য থাকে না। তিনি যেখানেই যান সাধারণ মানুষের সাথে মেলামেশা করেন। তাদের অভাব অভিযোগ শোনেন এবং যথাসাধ্য তা দূর করেন।

জুমার নামায তিনি কোনো একটি বিশেষ মসজিদে পড়েন না। বরং প্রত্যেক শুক্রবার মসজিদ বদল করেন। এভাবে প্রদেশের প্রত্যেকটি মসজিদে জুমার নামায পড়ার তিনি পরিকল্পনা করেছেন। এভাবে যে মসজিদে তিনি একবার জুমার নামায পড়েছেন সেটিতে পুনরায় তার জুমার নামায পড়তে পাঁচ থেকে ছ বছর সময় লাগবে। কোনো মসজিদে যাবার আগে ঘোষণা করে যান না। বরং হঠাৎ গিয়ে জুমার নামাযে হাজির হন। এভাবে স্বতস্ফূর্তভাবে জনগণের সাথে যোগাযোগ করার ও তাদের কথা শোনার সুযোগ হয়।

পাস-এর অধিকাংশ নেতা মসজিদের ইমাম বা খতীব। তারা জনগণের সাথে নামায পড়েন। ২৪ ঘন্টা তাদের সাথে যোগাযোগ রাখেন। এভাবে এসেম্বলীতে তারা জনগণের কথা কোনো আধুনিক শিক্ষিত রাজনীতিকের তুলনায় বরং আরো ভালো করে বলতে পারেন। কেউ কেউ একে মোল্লাদের হুকুমাত বলেন। কিন্তু মোল্লাদের এ গণসংযোগের কোনো জবাবই তাদের কাছে নেই।

মালয়েশিয়া এমন একটি দেশ যেখানে বিপুল সংখ্যক অমুসলিমদের বাস। মুসলমানদের তুলনায় তাদের সংখ্যা সামান্য মাত্র কম। অর্থাৎ অমুসলিমদের সংখ্যা শতকরা ৪২ থেকে ৪৫। অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অনেক দিক দিয়ে এ অমুসলিমরা সে দেশের মুসলমানদের তুলনায় অনেক বেশী অগ্রসর। দেশের জনসংখ্যার ৪২/৪৩ ভাগ অমালয়ী। এরা চীন ও ভারতের সাথে সম্পর্কিত। দেশের অর্থনীতি ও শিল্প কারখানাগুলো বলতে গেলে পুরোপুরি চীনা বাসিন্দাদের হাতে। এদের অতি অল্প সংখ্যক ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কোনো কোনো প্রদেশে তো চীনা বাসিন্দারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছেন। বর্তমান শতকের শুরুর দিকে যেসব ভারতীয় বাসিন্দা বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের তামিল ও উত্তর ভারতের শিখ মালয়েশিয়ায় বসতি স্থাপন করে তারা দেশটির বুরোক্রাসি ও পারস্পরিক সাহায্য সংস্থাগুলোতে প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছে।

মালয়েশিয়ার মতো বেশ কয়েকটি মুসলিম দেশে সংখ্যালঘু জাতি গোষ্ঠী বেশ একটি বড় রকমের সমস্যা সৃষ্টি করেছে। এসব দেশের ইসলামী আন্দোলনগুলো বিশ্বব্যাপী ইসলামী সাম্য ও ঐক্যের আদর্শের ভিত্তিতে এ সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করছে। পাশ্চাত্য চিন্তাবিদরা মনে করতে শুরু করেছেন ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে কোনো প্রতিযোগিতা নেই। বরং গণতন্ত্রের পথ ধরে ইসলাম স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যাবে। তারা মনে করেন, যদি ইসলামী আন্দোলনগুলো দেশের শাসন ক্ষমতা দখল করতে পারে, তাহলে মিশ্র সমাজ, ভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ভিত্তিক সংখ্যালঘু, সাংস্কৃতিক ও ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুরা সংকটের মুখোমুখি হবে। কারণ ইসলামী আন্দোলনগুলো একটি বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের অংশীদার এবং তাদের মধ্যে কোনো সামাজিক ব্যবধান নেই। ফলে এইসব বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও সংখ্যালঘুরা এ ধরনের সমাজে খাপ খেয়ে চলতে পারবে না।

কিন্তু তাদের এ অলীক কল্পনা ও মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা বাস্তবে মার খেয়ে যাচ্ছে। কারণ ইসলামী আন্দোলনগুলো এবং বিশেষ করে ইসলাম সংখ্যালঘুদের প্রতি অত্যন্ত সহনশীল এবং তাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব ও পৃথক সত্তাকে পুরোপুরি স্বীকৃতি দিয়েছে। এমনকি খৃষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকে যখন ইসলামের বিজয় অভিযান দিকে দিকে প্রসারিত হচ্ছিল তখনো মুসলমানরা কোনো প্রলোভন দেখিয়ে অমুসলিমদেরকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতো না। মুসলিম ক্বারী, ফকীহ ও আলেমগণ এদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। তখনো অমুসলিম ও সংখ্যালঘুদের প্রতি কোথাও কোনো প্রকার অবিচার হয়নি। হিমালয়ান উপ-মাহাদেশে মুসলমানদের সাতশ বছরের শাসনই এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। বর্তমানে আমরা দেখছি সুদানের দক্ষিণের খৃষ্টান বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ইসলামী আন্দোলনের মুজাহিদ বাহিনীর সাথে দক্ষিণের একদল খৃষ্টানও অস্ত্র তুলে নিয়েছে, মালয়েশিয়ায়ও একই অবস্থা। সারাদেশে কোথাও চীনা বা ভারতীয় সংখ্যালঘুরা ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে সোচ্চার নেই। বরং তাদের সহযোগিতায় কিলানতান প্রদেশে পাস (PAS) তার সরকার চালিয়ে যাচ্ছে। আসলে ইসলামী আন্দোলন সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা ও অধিকার আদায়ের ব্যাপারে তাদের নিজেদের চাইতেও বেশী সজাগ। আর সংখ্যালঘুরা তাদের শত্রু মিত্র চেনার ব্যাপারে বাস্তব ক্ষেত্রে কোনো প্রপাগাণ্ডা ও ভুলবুঝাবুঝির ফলে সাময়িকভাবে ভুল করলেও আখেরে নিজেদের স্বার্থ ও ভালোমন্দ তারা ঠিকই চিনে নিচ্ছে।

হতাশাই ওদের ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসের উৎস

প্রতিপক্ষ শক্তিশালী হলে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। একে সত্যিকার অর্থে মোকাবিলা বলা যায়। আর এক পক্ষ দুর্বল হলে যা হয় তাকে আর মোকাবিলা বলা যায় না। বর্তমানে ইসলামের সাথে পাশ্চাত্যবাদের ধীরে ধীরে এমনি ধরনের একটা অবস্থার সৃষ্টি হতে চলেছে। এ শতকের শুরুতে যে ইসলাম ও মুসলমানরা সারাবিশ্বে ছিল পাশ্চাত্যবাদ ও পাশ্চাত্য শাসকবর্গের পদানত সেখানে শতকের অর্ধেক সময় পেরিয়ে যেতে না যেতেই মুসলমানরা কয়েক ডজন স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিকারী হয়ে গেছে এবং দেখতে দেখতেই ইসলামী পুনরুজ্জীবন ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন মুসলিম দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

ইসলাম এখন পাশ্চাত্যবাদের মোকাবিলায় এসে দাঁড়িয়েছে। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে মুসলমানরা এখন ইসলামের জন্য প্রাণ দিচ্ছে। ইসলামী পুনরুজ্জীবনবাদের কবি ইকবাল এই শতকের তিরিশের দশকে যে মুসলমানদের দিকে তাকিয়ে দুঃখ করে বলেছিলেন ঃ

> "হৃদয় যার কাফেরী মৃত্যুতেও কাঁপে থরো থরো
> বলবে কে তাকে ঃ মুমিনের মৃত্যুবরণ করো।"

সেই মুসলমানরা আজ ইসলামের জন্য শতে শতে হাজারে হাজারে প্রাণ দিচ্ছে। পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে চলেছে। ইসলাম একটা শক্তি হিসেবে ময়দানে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে। এ দৃশ্য সচেতন পাশ্চাত্যবাদের ধারকদের জন্য হৃদয়বিদারক। মোকাবিলা ইউরোপ আমেরিকা ও এশিয়ার মধ্যে নয়। কারণ এশিয়ার জাপান, চীন বা ভারত এগিয়ে গেলে তাদের জন্য কোনো সমস্যা নয়। তারা পাশ্চাত্যবাদের জন্য একটা বড় আকারের চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দেবে না। সে মোকাবিলায় পাশ্চাত্যবাদ হেরে গেলেও তাতে তারা অনেকটা আরাম বোধ করবে। কারণ সেখানে পাশ্চাত্যবাদ নতুন খোলসে আবির্ভূত হবে মাত্র। আজকের জাপান, ভারত বা চীনের শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান সবকিছুই পাশ্চাত্যেরই নতুন ফসল ছাড়া আর কিছুই নয়। এর মধ্যে প্রাচ্যের কোন্ মৌলিক উপাদানটাই আছে ? পাশ্চাত্য রাজনীতি, পাশ্চাত্য অর্থনীতি, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং পাশ্চাত্য সমাজ-সংস্কৃতির কি কোনো মৌল জাপানী বা মৌল চৈনিক অথবা মৌল ভারতীয় রূপ আছে বা এমনি ধরনের কোনো কিছু কি সামনে আনা হচ্ছে ? না, বরং পাশ্চাত্যবাদই সেখানে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত

হচ্ছে মাত্র। তাই পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের এতে কোনো মাথা ব্যথা নেই। তাদের সব মাথাব্যথা হচ্ছে এশিয়া-আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলো নিয়ে। এ দেশগুলোতেও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা চলছে। শাসকবর্গও পাশ্চাত্যবাদের পুরোপুরি অনুগত। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে বিগত অর্ধশতকের বেশী সময় থেকে এ এলাকাগুলোতে ইসলামী পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন চলছে এবং তা দিনের পর দিন শক্তিশালী হচ্ছে।

পাশ্চাত্যবাদ যদি সাফল্যের সাথে এগিয়ে যেতে পারতো তাহলে এ ইসলামী পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনগুলো তার জন্য ততটা ক্ষতিকর হতো না। আদর্শিক শক্তি নিয়ে সেও মোকাবিলার ময়দানে টিকে থাকতে পারতো। কিন্তু তার আদর্শিক শক্তি নিশেষ হয়ে গেছে। পুঁজিবাদ তো আগেই সারা বিশ্বে নিন্দিত ও শয়তানি শক্তি হিসেবে চিত্রিত হয়ে গেছে। গত সত্তর বছর থেকে মার্কসবাদের নামে আর একটা অন্তসারশূন্য আদর্শ তারা দাঁড় করিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। সেটাও পুঁজিবাদেরই রূপান্তর বরং তার ভয়াবহ রূপ প্রমাণিত হয়েছে। সম্প্রতি বিশ্বমানবতা এর ইন্দ্রজাল ছিন্ন করেছে। এখন পাশ্চাত্যবাদের কাছে আছে শুধুমাত্র মাথা গণনার গণতন্ত্র। এ নিয়ে তাদের দিনগুলো এখন মোটেই ভালো যাচ্ছে না। মুসলিম দেশগুলোতে তারা ইসলামী পুনরুজ্জীবনের ভয়ে সর্বক্ষণ ভীত-সন্ত্রস্ত।

ইসলামের ভয়ে তারা ভীত কেন ? ইসলাম যদি একটা সেকেলে, অযৌক্তিক ও অমানবিক মতবাদ হতো তাহলে তা তাদের জন্য কোনো ভয়ের কারণ হতো না। কারণ তাহলে তো বিশ্বমানবতা এ মতবাদ গ্রহণ করতো না। ফলে পাশ্চাত্যবাদ নির্বিবাদে রাজত্ব করতে পারতো। তাদের জন্য বরং সুবিধাই হতো। কারণ ইসলামকে পরাজিত করা খুবই সহজ হতো বরং ইসলাম নিজেই স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করতো। ব্যাপারটা হয়ে গেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলামের সত্যতা, যৌক্তিকতা ও মানবতাবাদ এতই সুস্পষ্ট যে, তা যতই সামনে আসবে ততই পাশ্চাত্যবাদের মিথ্যা, অযৌক্তিকতা ও অমানবিকতা বিশ্ববাসীর চোখে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এটিই তাদের ভয়ের কারণ। এজন্যই তারা ইসলাম ও মুসলমানের মৌল শক্তিকে নির্মূল করে দিতে চায়। কুরআন তাদের এ দুর্বলতাটাকে এভাবে চিহ্নিত করেছে, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصَارٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ –"যে পর্যন্ত না তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদের মিল্লাতের অনুগত হবে অর্থাৎ তাদের সমাজ-সভ্যতা ও চিন্তাগত আদর্শের অনুসারী হবে সে পর্যন্ত তারা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না।" অর্থাৎ পাশ্চাত্যবাদ সবসময় চায় মুসলমান যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে।

বিগত দু তিন শ বছর থেকে তারা এশিয়া-আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বিস্তার করেছে। সর্বত্রই তাদের একই নীতি দেখা গেছে। জাপানী, কোরীয়, চৈনিক এমনকি ভারতীয় হিন্দুদের অগ্রগতির পথে তারা কোনো বাধার সৃষ্টি করেনি। কিন্তু মুসলমানদের ব্যাপারে তারা দু রকম নীতি গ্রহণ করেছে। একদল মুসলমানকে তারা বাছাই করে নিয়েছে। যারা পাশ্চাত্যবাদের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারে তাদেরকে তারা এগিয়ে নিয়ে গেছে। তাদেরকে চিন্তা-ভাবনা, সামাজিকতা ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে পুরোপুরি পাশ্চাত্যবাদের রঙে রঞ্জিত করেছে। প্রশাসনিক দিক দিয়ে তাদেরকে যোগ্য করে তুলেছে। প্রভুত্বের হাত বদলের সময় তাদেরকেই প্রভুর আসনে বসিয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে তাদের সাহায্যেই ইসলামের ও ইসলামী পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের মোকাবিলা করার ব্যবস্থা করেছে। বাইর থেকে তারা এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, সন্ত্রাস ও ফিতনা সৃষ্টি করে চলেছে।

ইসলামী পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনগুলোর বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী তারা চালাচ্ছে এক বিরূপ প্রপাগাণ্ডা। এগুলোর চেহারা বিকৃত করছে। এজন্য তারা নিজেদের মহাদেশীয় শব্দ 'মৌলবাদ' ইসলামী পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন-গুলোর গায়ে সেঁটে দিচ্ছে। মৌলবাদ তাদের দেশের জন্য এবং খৃষ্টবাদ, হিন্দুবাদ বা বৌদ্ধবাদের জন্য ঠিকই আছে। কারণ এই সমস্ত ধর্ম হচ্ছে বিকৃত এবং বিকৃত হবার কারণে এগুলো মানবতার জন্য ক্ষতিকর। আর এগুলোর বিকৃতির কারণেই ইসলাম সঠিকরূপে আবির্ভূত হয়েছে। এ ধর্মগুলোর বিকৃতরূপই এদের মৌলরূপ। আর তাদের এ বিকৃত রূপের তুলনায় পাশ্চাত্যবাদ মানবতার জন্য বেশ কিছুটা কল্যাণকর ছিল। তাই পাশ্চাত্যবাদ পরিত্যাগ করে এ ধর্মগুলোর মৌল বিকৃত রূপের দিকে যাওয়াটা পশ্চাতপদতারই লক্ষণ। কিন্তু ইসলাম তার সঠিক ও মৌল রূপেই যথার্থ কল্যাণকর এবং পাশ্চাত্যবাদের তুলনায় মানবতার জন্য অনেক বেশী কল্যাণকর। এজন্য ইসলামী পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনগুলোর সাথে ইউরো-আমেরিকীয় মহাদেশীয় অর্থে মৌলবাদ শব্দটির ব্যবহার মোটেই খাপ খায় না। এটা ঠিক কচু পাতায় পানি রাখার মতো ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত এ আন্দোলনগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত ও খতম করার জন্য তারা ভেতরের বিরোধী শক্তিগুলোকে বাইর থেকে অর্থ যোগান দিচ্ছে। এক্ষেত্রে চারদেশীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ, কেজিবি, মোসাদ ও র একই লাইনে কাজ করছে। পাশ্চাত্য উপনিবেশবাদীরা চলে যাবার সময় শুধু তাদের অনুগত একদল শাসকই তৈরী করে দিয়ে যায়নি বরং তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে একদল ইসলাম বিদ্বেষী, ইসলাম বিরোধী ও সংশয়বাদী

তৈরী করে দিয়ে গেছে এবং সব দেশেই এ শিক্ষাব্যবস্থা এখনো পর্যন্ত প্রায় অপরিবর্তিত থাকার কারণে এই অভ্যন্তরীণ বিরোধী পক্ষ তৈরীর ধারা অব্যাহত রয়েছে। ফলে বাইরের শত্রুরা ভেতরের এ বিরাট গোষ্ঠীর সহায়তা লাভ করছে।

তৃতীয়ত ইসলামী পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনগুলোর প্রভাবে কোনো কোনো মুসলিম দেশ ইসলামী শাসন ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলে বাইরে থেকে তাকে একঘরে করার এবং তাকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে বিশ্বসংস্থা থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। সুদানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর থেকে আমেরিকার তড়িঘড়ি করে সোমালিয়ায় সৈন্য সমাবেশ সুদানকে চারদিক থেকে ঘেরাও করারই একটি চক্রান্ত। সম্প্রতি নিউইয়র্কে জাতিসংঘ ভবনে বোমা বিস্ফোরণের দায়ে যে ৮জন মুসলমানকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের মধ্য থেকে ৫জন সুদানের সাথে সম্পর্কিত। তাদেরকে সাহায্য করার জন্য পরিকল্পিতভাবে জাতিসংঘ সদর দফতরে কর্মরত ২জন সুদানী কর্মচারীকে ব্যবহার করা হয়েছে। এখন এ সুদানী কর্মচারীদ্বয়কে জাতিসংঘ অফিস থেকে বহিষ্কার করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জাতিসংঘ অফিস থেকে এই ধরনের বহিষ্কার হবে এ প্রথম ঘটনা। জাতিসংঘ ভবন ক্ষতিগ্রস্ত করার সাথে কোনো রাষ্ট্রের কোনো স্বার্থ জড়িত থাকতে পারে না। কাজেই এ ষড়যন্ত্র নাটক তৈরী করা হয়েছে শুধুমাত্র সুদানকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যায়িত করার জন্য এতে কোনো সন্দেহ নেই।

ইসলামী পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনগুলোর বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের চেহারা অত্যন্ত ভয়াবহ। অমুসলিম গোষ্ঠীর ইসলাম বিরোধিতা তো বোধগম্য বিষয়। প্রধানত তাদের অজ্ঞতা, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে জানার পরও কেবলমাত্র সংকীর্ণ স্বার্থান্ধতাই এর পেছনে কাজ করছে। কিন্তু মুসলিম গোষ্ঠীর একটি অংশের ইসলাম বিরোধিতা মোটেই কোনো বোধগম্য বিষয় নয়। এখানেও একটি অংশের ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতাই কাজ করছে। অন্যান্য ধর্মের মতো একেও তারা একটি ইবাদত-বন্দেগীর ধর্মই মনে করছে। জীবন সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে অন্যান্য মতবাদের তুলনায় ইসলাম যে সবচেয়ে বেশী সক্ষম বরং একমাত্র নির্ভুল সমাধান যে ইসলামই দিতে পারে এ বিশ্বাস তাদের নেই। অথচ কুরআনে স্পষ্টই ঘোষণা করা হয়েছে ঃ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ "যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো মতবাদকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করবে তা মোটেই গ্রহণ করা হবে না।"–(সূরা

আলে ইমরান ঃ ৮৫) কুরআনেই এ জীবনব্যবস্থা সংক্রান্ত সমস্ত মূলনীতি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর পরে বলা হয়েছে ঃ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ। "তবে কি তোমরা আল্লাহর কিতাবের একটি অংশকে মেনে নেবে এবং অন্য অংশকে মেনে নেবে না ?"-(সূরা আল বাকারা ঃ ৮৫) এরপরে এর পরিণতি হিসেবে বলা হয়েছে ঃ "তোমাদের যারাই এরূপ করবে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ৮৫)

একটি গোষ্ঠী নিজেদের দুনিয়াবী স্বার্থের কারণে সচেতনভাবেই ইসলামের বিরোধিতা করছে। ইসলামী জীবন বিধান হক ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত এবং সমস্ত অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে চায় এবং এটা তাদের ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থ বিরোধী, তাই তারা ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার বিরোধী। পুঁজিবাদী মনোবৃত্তিই তাদের এ স্বার্থান্ধ মানসিকতার জনক। মানবিক ও জাতীয় কল্যাণের তুলনায় নিজের দুনিয়াবী স্বার্থ তাদের কাছে অনেক বড়।

একটি গোষ্ঠী পুরোপুরি বিদেশী স্বার্থের ক্রীড়নক হিসেবে ইসলামের বিরোধিতা করছে। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে আন্তরজাতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে। এদের সাথে হাত মিলিয়েছে মুসলিম নামধারী একটি ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী। এ গোষ্ঠীটি ইসলামী ভাবধারা, আদর্শ ও মতবাদে বিশ্বাস করে না। এরা ইসলামকে সেকেলে, বস্তাপচা মতবাদ ও কুসংস্কার মনে করে। ইসলাম যে জীবন সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারে এর ওপর এদের এক রত্তিও বিশ্বাস নেই। এরা প্রকাশ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে, বইপত্র লেখে, নাটক করে এবং গানও গায়। শুধু তাই নয়, ইসলামের পক্ষে কোনো বক্তব্য এলে এদের গাত্রদাহ শুরু হয় এবং তখন এরা প্রকাশ্যে আক্রমণ করতেও কুণ্ঠিত হয় না।

এ শেষোক্ত গোষ্ঠী দুটির মিলিত সন্ত্রাসই আজ সমস্ত মুসলিম দেশের ইসলামী পুনরুজ্জীবন আন্দোলনগুলোর এগিয়ে চলার পথকে রক্তাক্ত করে তুলেছে। ইসলাম কোনোদিন সন্ত্রাস ও রক্তাক্ত বিপ্লবের পথ গ্রহণ করেনি। ইসলামের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন রহমাতুল্লিল আলামীন। তাঁর সমগ্র জীবন ও কার্যধারা বিশ্লেষণ একথাই প্রমাণ করে। দুনিয়ার কোনো লেখক ও গবেষক আজ পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে মত পোষণ করেননি। তাছাড়া ইসলামের একটি অর্থই হচ্ছে শান্তি—অশান্তি বা সন্ত্রাস নয়। ইসলামী আদর্শের পতাকাবাহীরা দুনিয়ার বহু দেশ জয় করেছে। সিরিয়া,

ইরাক, ইরান, মিসর, আলজেরিয়া, মরক্কো, স্পেন, আফগানিস্তান, ভারতবর্ষ তথা দুনিয়ার বিশাল অংশকে তারা করতলগত করে। কিন্তু কোথাও তারা এজন্য অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম, সন্ত্রাস ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছিল একথা কি ইতিহাস প্রমাণ করে ? ইতিহাস বরং উল্টোটাই বলে। জুলুম, নিপীড়ন দমন করার জন্যই তারা যুদ্ধের আশ্রয় নিয়েছিল। এজন্য ইসলাম এক হাজার বছর ধরে দুনিয়া শাসন করতে সক্ষম হয়। অন্য কোনো মতবাদের পক্ষে এত দীর্ঘকাল সগৌরবে টিকে থাকা সম্ভব হয়নি।

মাত্র দু তিনশ বছর থেকে বিশ্ব ব্যবস্থায় ইসলামের সার্বিক প্রাধান্য অনুপস্থিত। এরি মধ্যে বিশ্বে দু দুটি বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে। পাশ্চাত্যবাদ বিশ্ব মানবতাকে ধ্বংসের শেষ প্রান্তে এনে বসিয়ে দিয়েছে। জাতীয়তাবাদ, ধনতন্ত্র, মাথাগণনার গণতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ, নাৎসীবাদ, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি অনেক মানবিক মতবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে গেলো। সম্প্রতি ঘটা করে মৃত্যু শয্যায় শায়িত হলো মার্কসবাদ। আর কত। পাশ্চাত্যবাদ এখন হতাশার জন্মদাত্রী হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে গেছে।

এরপরও কি আমাদের দেশীয় বিভ্রান্তদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে না ? ইসলামী পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসের পরিসমাপ্তি ঘটবে না ? তারা কোথায় যাবেন আলোতে না অন্ধকারে ?

উপমহাদেশে ইসলামী আন্দোলন

উত্তরের হিমালয় পাহাড় ও উত্তর পূর্বের হিন্দুকুশ পর্বতমালা এ এলাকাটিকে সারা পৃথিবী থেকে একেবারে আলাদা করে রেখেছে। উত্তর-পূর্বের কয়েকটি গিরিপথ এবং তিব্বতের মালভূমি পেরিয়ে প্রাচীনকালে বিভিন্ন জাতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে এ উপমহাদেশে। সারা দুনিয়া থেকে এভাবে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে এ এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণতার ধারণা জন্মে। এরি ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটা জনশ্রুতি আমরা শুনে থাকি ঃ "যাহা নাই ভারতে তাহা নাই জগতে"। আসলে এটা জ্ঞানের নয় বরং কুসংস্কার ও কূপমণ্ডুকতার ফসল। নয়তো ব্যাঙ আর হাতির সামর্থে ফারাক কেনা জানে। কিন্তু আজ এ এলাকার ভারত নামক বৃহৎ অংশটিতে যে বিশেষ "সাম্প্রদায়িক" বাদের উত্থান ঘটাবার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে তার মূলে এ ধারণা ও কুসংস্কার সবিশেষভাবে কার্যকর রয়েছে।

এ উপমহাদেশে প্রাচীন সভ্যতা ছিল দ্রাবিড়দের। দ্রাবিড়রা ছিল সেমেটিক জাতি বলয়ের অন্তরভুক্ত। তাদের পাঁচ হাজার থেকে সাত হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতাকে ধ্বংস করে ইরান ও মঙ্গোলিয়া থেকে আগত আর্যরা এ উপমহাদেশে বর্ণাশ্রমবাদী সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন করে। জৈন ও বৌদ্ধরা এ বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু রক্ষণশীল বর্ণাশ্রমবাদী আর্যদের কাছে তারা পরাজিত হয়। জৈন ও বৌদ্ধরাও বর্ণাশ্রমবাদী সমাজে বিলীন হয়ে যায়। এভাবে প্রাচীনকালে বিদেশাগত সমস্ত জাতির অস্তিত্বই এ বর্ণাশ্রমবাদী সমাজে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং তাদের ধর্ম রক্ষণশীল মুশরিকী ধর্মের সাথে একীভূত হয়ে নানা বর্ণের ও নানা ধর্মের বৃহত্তর মুশরিকী ধর্মের রূপ লাভ করে।

এ অবস্থায় খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে সমুদ্র পথে এ উপমহাদেশের দক্ষিণ ও পূর্ব সমুদ্র উপকূল এলাকায় ইসলামের আগমন হয়। পরবর্তী অষ্টম শতকে স্থল পথে সিন্ধু ও পাঞ্জাবের মুলতান এলাকায় ব্যাপকভাবে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে এবং এ শতকে পশ্চিম এলাকায় মুসলমানরা স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রেরও পত্তন করে। এরপর পাঁচ শতকের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত সমগ্র ভারতে বিস্তার লাভ করে। একদিকে বিদেশ থেকে ব্যাপকভাবে মুসলমানদের আগমন হতে থাকে এবং অন্যদিকে স্থানীয় অধিবাসীদের ইসলাম গ্রহণের ধারা চলতে থাকে প্রচণ্ড গতিতে। তেরো শতকের শুরুতে দিল্লীতে মুসলিম শাসনের

প্রতিষ্ঠার পর এ ধারা স্বাভাবিকভাবেই শক্তিশালী হয়। একশ বছরের মধ্যে পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব ভারতে মুসলমানরা শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে তোলে। মুসলমানরা মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের দিকেও এগিয়ে যায় এবং সেখানেও তাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করে। দেখতে দেখতে সর্বভারতীয় এলাকায় মুসলমানরা একটি একক উল্লেখযোগ্য মিল্লাতে পরিণত হয়। মুসলমান ছাড়া এ এলাকার অন্যান্য ধর্মীয় জাতিসত্তা বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত ছিল।

মুসলমানদের মধ্যে ছিল তুর্কী, মোগল, ইরানী ও স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ। বিদেশাগত মুসলমানরা প্রথম থেকেই তাদের নানান গোত্রীয় ও স্থানীয় কুসংস্কার সাথে করে এ দেশে আগমন করেছিল এবং তাদের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণার মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহর অনুশাসনের বাইরের অনেক কিছুই স্থান লাভ করেছিল। আবার তারাই ছিল এদেশীয় মুসলিম সমাজের মধ্যমনি। অন্যদিকে এদেশীয় নওমুসলিমদের সঠিক ইসলামী প্রশিক্ষণ দানও তাদের পক্ষে পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। ফলে একদিকে মুসলিম সমাজের আকৃতি বাড়তে থাকে এবং অন্যদিকে তাদের মধ্যে ইসলাম বিরোধী ভাবধারার আকারও স্ফীত হতে থাকে। বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আমীর-উমরাহ ও বিত্তশালীদের অবাধ কর্তৃত্ব ও বিলাসিতা, অবৈধ পথে অর্থোপার্জন এবং জুলুম শাসন ব্যাপকহারে বেড়ে যেতে থাকে। ধীরে ধীরে মুসলিম শাসক সমাজ আল্লাহ থেকে গাফিল হয়ে যায়। ষোল শতকে মোগল বাদশাহ আকবরের শাসন আমলে ইসলামের সত্য-সরল পথ থেকে বিচ্যুতি চূড়ান্ত রূপ নেয়।

সাইয়েদ আহমদ সরহিন্দী

আকবর ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান। কিন্তু কৈশোরে রাজনৈতিক সংকটের ডামাডোলে শিক্ষালাভ করার সুযোগ তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। ফলে ইসলাম সম্পর্কে যাবতীয় বিভ্রান্তিই ছিল তাঁর কাছে প্রকৃত জ্ঞান। স্বার্থান্বেষী পণ্ডিতবর্গও তাঁকে আরো বেশী বিভ্রান্ত করেন। অন্যদিকে উপমহাদেশের রাজনৈতিক অবস্থায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুশরিক তথা হিন্দু সমাজের মোকাবিলায় নিজের সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখাই তাঁর কাছে বড় সমস্যা মনে হয়। ফলে স্বার্থান্বেষী এ দেশীয় বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতবর্গ ও উলামায়ে কেরামের প্ররোচনায় তিনি এ দেশীয় মুশরিকী ধর্মের সমন্বয়ে এক নতুন ধর্মের উদ্ভব ঘটান। সে ধর্মের নাম দেন 'দীনে ইলাহী'। সকল ধর্মের যাবতীয় শিরকীয় মতবাদ ও আচার অনুষ্ঠান এ ধর্মে স্থান লাভ করে। ইসলামের বিভিন্ন চিন্তা-বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানকে এখানে বিদ্রূপে পরিণত করা হয়। এভাবে একদিকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা চলে এবং অন্যদিকে ইসলামের মোকাবিলা করার জন্য

রাজকীয় পর্যায়ে অন্য একটি নতুন ধর্মকে সামনে আনা হয়। এদেশীয় জনতা তো এমনিতেই বিভ্রান্ত ছিল। এখন দেশের বাদশাহ ও সকল ধর্মের পণ্ডিতবর্গের সম্মিলিত প্রচেষ্টা তাদেরকে আরো বেশী বিভ্রান্ত করে। ইসলামের মৌল আকীদাসমূহ যেমন নবুওয়াত, আখেরাত, অহী, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদিকে বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করা হয়। নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি ইসলামী অনুষ্ঠানাদিকে উপহাস করা হয়। বাদশাহ আকবরকে যুগের নেতা ও আল্লাহর প্রতিবিম্ব বলে প্রচার করা হয়। সালামের পদ্ধতি পরিবর্তিত করা হয়। রাজপূজাকে আকবরের দীনে ইলাহী ধর্মের অংশে পরিণত করা হয়। প্রতিদিন সকালে লোকেরা বাদশাহর দর্শন লাভ করতে আসতো। বাদশাহ দর্শনের পরে তাঁকে সিজদা করা হতো। মুশরিকরা বাদশাহকে "দিল্লীশ্বরো জগদীশ্বরো" বলে সম্বোধন করতো। সূদ, জুয়া ও মদকে হালাল করা হয়। দাড়ি চেঁছে ফেলার ফ্যাশন প্রবর্তন করা হয়। চাচাত ও মামাত বোনদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়। রেশম ও সোনার ব্যবহার বৈধ করা হয়। সিংহ ও বাঘের গোশত হালাল এবং শূকরের গোশত কেবল হালালই নয় বরং শূকরকে পবিত্র প্রাণী হিসাবে গণ্য করা হয়। মৃতদেহ কবরস্থ না করে পুড়িয়ে ফেলা বা পানিতে ভাসিয়ে দেয়াকেই ভালো গণ্য করা হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষাদানকে অপছন্দ করা হয়। ভাষার মধ্যে হিন্দী রীতি সৃষ্টির প্রচলনকে উৎসাহিত করা হয়। আরবী শব্দগুলোকে ভাষার মধ্য থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করার প্রচেষ্টা চালানো হয়।

এভাবে আকবরী প্রচেষ্টার যথাযথ বিশ্লেষণ করলে আমরা এর পেছনে পুরাতন হিন্দী সমন্বয়বাদী দর্শন সক্রিয় দেখতে পাই, যে দর্শনের ভিত্তিতে পাঁচ হাজার বছর থেকে তারা 'ভারতের মহামানবের সাগর তীরে' সব ধর্মকে এক দেহে লীন করে একক হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়কে বিলুপ্ত করে দিয়ে বর্ণাশ্রমবাদী সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিতে ব্রাহ্মণ্যবাদের একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। মানুষকে করেছে মানুষের দাস এবং ধর্মকে পায়ের ভৃত্য।

সতের শতকে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমলে হযরত সাইয়েদ আহমদ সরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফেসানী এ আকবরী ফিতনার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করেন। তিনি নিসহায় ও নিসম্বল অবস্থায় একাকী এর মোকাবিলা করেন এবং দীর্ঘ সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ফিতনার গতি পরিবর্তন করেন। আকবরের দীন ইলাহীকে তিনি তার যাবতীয় 'বিদআত' সহ বিদায় করে দেন। ফলে ইসলামী বিধানসমূহের মধ্যে যেসব পরিবর্তন সাধন করা হয়েছিলো তা পুরোপুরি বাতিল হয়ে যায়। বাদশাহ তাঁর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য,

আন্তরিকতা ও সংগ্রামের কাছে নতিস্বীকার করেন। পিতার অন্যায়ের খেসারত হিসাবে তিনি নিজ পুত্র শাহজাহানকে ইসলামী শিক্ষা দেবার ভার তাঁর হাতে তুলে দেন। শায়খ সরহিন্দীর মৃত্যুর তিন চার বছর পরই শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র আলমগীরের জন্ম হয়। শায়খের সংস্কারমূলক কার্যাবলীর ভিত্তিতে আওরঙ্গজেব আলমগীর রাজকীয় পর্যায়ে এমন সব সংস্কারমূলক বিধি ব্যবস্থা জারি করেন যার ফলে সমগ্র উপমহাদেশের ইসলামী মিল্লাত দীনী ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। তিনি এমন একটি নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেন যার মাধ্যমে ইসলামী চিন্তা-দর্শনের ভিত্তিতে ভবিষ্যত বংশধরদেরকে শিক্ষা দেয়া এবং এমন একদল লোক তৈরী করা যায় যারা দেশের সমগ্র ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতে সক্ষম হয় এবং শিক্ষা ব্যবস্থাও সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে যাবার যোগ্যতা অর্জন করে।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ

বাদশাহ আলমগীরের ইন্তিকালের চার বছর পূর্বে রাজধানী শহর দিল্লীতে শাহ ওয়ালিউল্লাহর জন্ম হয়। তিনি শিক্ষা লাভ করে কর্মক্ষেত্রে নেমে আসতে আসতেই মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘনিয়ে আসে। ইসলামী মূল্যবোধ পুনরুজ্জীবনের জন্য বাদশাহ আলমগীর ইতিপূর্বে যেসব সংস্কারের সূচনা করেছিলেন সেগুলো বিরাট হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। দেশের চতুরদিকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। বিদ্রোহী শিখ ও মারাঠারা বিভিন্ন ময়দানে মোগলদেরকে পরাজিত করতে থাকে। ইংরেজরা উপকূল এলাকায় তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেই চলছিল এবং অভ্যন্তরে কোথাও শক্ত করে আস্তানা গড়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। এ অবস্থায় শাহ ওয়ালিউল্লাহ তাঁর ইসলামী সংস্কারমূলক কাজের সূচনা করেন। ইসলামকে জীবনের সব ক্ষেত্রে পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটি ব্যাপকতর কর্মসূচী নিয়ে তিনি এগিয়ে যান। এটি ছিল তাঁর যাবতীয় সংস্কারমূলক কার্যাবলীর প্রাণবস্তু। এ কর্মসূচী সফল করার জন্য তিনি জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, কর্মকৌশল, ধৈর্য ও ভারসাম্যপূর্ণ কর্মনীতি সহকারে অগ্রসর হন।

এ উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমেই যে প্রচেষ্টাটি চালান সেটি হচ্ছে, তিনি কুরআন ও হাদীসের সাথে উম্মতে মুসলিমার সম্পর্ক পুনস্থাপিত করেন। ইতিহাস ও ইসলাম তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। এ অধ্যয়নের ফলে যথার্থই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তর্ক ও কালাম শাস্ত্রের যুক্তিজালে বা তাসাউফের কারামতি দেখিয়ে মুসলিম মিল্লাতকে সক্রিয় এবং কোনো বৃহত্তর কাজে উদ্যোগী করা যাবে না। তাদের মধ্যে কর্মস্পৃহা সৃষ্টি করতে পারে একমাত্র

কুরআন ও সুন্নাহ। তাই তিনি ফারসীতে কুরআন অনুবাদ করেন। হাদীস ও উলুমে হাদীসের চর্চার ও দরস তাদরীসের ব্যবস্থা করেন। হাদীসে নববীর মাধ্যমে দীনের বিধি বিধান ও তত্ত্বজ্ঞান বরং সমগ্র ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। এটিকে তাঁর সবচেয়ে বড় কাজ হিসাবে চিহ্নিত করা যায় এবং এরি বদৌলতে উম্মাতে মুসলিমা পুনরায় তার আসল বুনিয়াদের ভিত্তিতে নিজেকে সুসংগঠিত করার চেষ্টা করে।

শাহ সাহেবের দ্বিতীয় কাজটি হলো, তিনি ইসলামকে একটি সমাজ বিধান, একটি পূর্ণ দীন এবং একটি ব্যাপকতর জীবন ব্যবস্থা হিসাবে পেশ করেন। জীবনের সমগ্র বিভাগের সংশোধন ও সংস্কার সাধন ছিল তাঁর লক্ষ। অর্থাৎ জীবনের কোনো একটি বিভাগের জন্য নয় বরং সমস্ত বিভাগের জন্য তিনি ইসলামকে তুলে ধরেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহর রচনাবলী থেকে জানা যায়, দর্শন থেকে শুরু করে ইবাদত, ব্যক্তিগত জীবন থেকে নিয়ে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতির নীতির ক্রম পরিবর্তন এবং ফিকহের মাসায়েল থেকে নিয়ে তাসাউফের গভীর তত্ত্ব পর্যন্ত সব কিছুকে তিনি তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত করেন এবং সেগুলোর ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থাপন করেন। কুরআন, হাদীস, ফিকহ, উসুল, ইতিহাস, দর্শন, তর্কশাস্ত্র এবং ইলমের অন্যান্য শাখা প্রশাখার ওপর কী গভীর পড়াশুনা এবং এই সঙ্গে যুগ সমস্যা সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি ও সচেতনতা থাকলে তবে মহান সংস্কারকের ভূমিকা পালন করা সম্ভব তা সহজেই অনুমান করা যায়। এ কারণে তাঁর গ্রন্থাবলী পাঠ করলে মনে হবে যেন বিশ শতকের কোনো মহান চিন্তানায়ক তাঁর চিন্তাধারা পেশ করে যাচ্ছেন। যে বিভ্রান্তির যুগে তাঁর জন্ম ও বিচরণ তার মধ্যে বসেও তিনি চিন্তার ক্ষেত্রে অদ্ভুত ভারসাম্য প্রদর্শন করেছেন। তিনি ফিকহের সমস্ত মযহাব অধ্যয়ন করেন এবং তারপর তার মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যম পন্থা অবলম্বনের প্রচেষ্টা চালান। তাসাউফের যতগুলো তরীকা উপমহাদেশে প্রচলিত ছিল। তার প্রায় সবগুলো থেকেই তিনি ফায়দা হাসিল করেন এবং তারপর এগুলোর সারবস্তু পেশ করেন।

ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ তৃতীয় যে কাজটি করেন সেটি হচ্ছে, তিনি একটি নতুন ইলমে কালামের ভিত্তি স্থাপন করেন। এ ইলমে কালামের সাথে গ্রীক তর্কশাস্ত্রের ভিত্তিতে রচিত মুতাযিলা ও মুসলিম দার্শনিকদের ইলমে কালামের সুস্পষ্ট বিরোধ ছিল বরং আশায়েরাদের ইলমে কালাম থেকেও এ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কুরআনের যুক্তি উপস্থাপন পদ্ধতি এবং রসূলের হাদীস থেকে বক্তব্য পেশ করার যে সহজ সরল ভঙ্গী পাওয়া যায় এবং যে বক্তব্য সহজে

হৃদয়গ্রাহী হয় তারি ভিত্তিতে এ ইলমে কালামের অবয়ব রচনা করা হয়। দার্শনিক তত্ত্বের আড়ালে সেখানে বক্তব্যকে জটিল থেকে জটিলতর করে তোলা হয়নি এবং শ্রোতার ও পাঠকের সন্দেহ নিরসন করার পরিবর্তে তার সন্দেহ আরো বাড়িয়ে তোলা হয়নি। অপ্রয়োজনীয় ও কাল্পনিক কোনো সমস্যা নিয়ে সেখানে গভীর দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা ফাঁদা হয়নি বরং জীবনের ও জগতের প্রয়োজনীয় সমস্যাবলী সেখানে আলোচিত হয়েছে। পরবর্তীকালে বিশ শতকে যে ইসলামী আন্দোলনগুলোর সূচনা হয় যুক্তি উপস্থাপনের এ পদ্ধতির ভিত্তিতেই তাদের সমগ্র সাহিত্য গড়ে ওঠে।

ইমাম সাহেব চতুর্থ যে কাজটি করেন সেটি হচ্ছে, তিনি একটি স্বতন্ত্র শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ছাত্ররা তাঁর মারকাযে ইলম ও দাওয়াতে শিক্ষা গ্রহণ করতে আসতো। এখান থেকে ইসলামের সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করে তারা নিজেদের এলাকায় চলে যেতো এবং সেখানে তার প্রসার ঘটাতো। এভাবে তিনি একটি সুসংগঠিত দল গঠন করতে না পারলেও তার শিক্ষায়তন থেকে এমন এক দল ছাত্র তৈরি করেন যারা তার আদর্শ, পয়গাম, দাওয়াত ও শিক্ষা নিয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

এই সাথে তিনি সবশেষে যে কাজটি করেন সেটি হচ্ছে, দেশের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা চালান। দেশের ও জাতির প্রত্যেকটি শ্রেণীকে সম্বোধন করে তিনি তাদের কার্যধারার সমালোচনা করেন এবং ইসলামের যথার্থ বিধান অনুযায়ী সেগুলোর সংশোধন ও পুনরবিন্যাসের আহ্বান জানান। উলামায়ে কেরামকে বলেন, তোমরা নিজেদের কর্তব্য স্মরণ করো, শাসক ও রাজনীতিকদেরকে বলেন, তোমরা জাতিকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো ? বিত্তবানদেরকে বলেন, তোমাদের এসব ধনদৌলত তোমাদের কোন কাজে লাগবে না, যদি তোমরা দীনের অগ্রগতি ও দুস্থের সেবায় একে ব্যয় না করো ? জনতাকে বলেন, ওঠো, আল্লাহর পথের সৈনিক হও ! নিজের দায়িত্ব অনুধাবন করো এবং দীনকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম করো। এভাবে সকল শ্রেণীকে আহ্বান করার পর যখন তিনি দেখলেন দেশের রাজনীতিকরা তার দাওয়াত গ্রহণ করছে না এবং মুসলমানদের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা অপসারিত হতে চলছে তখন তিনি আফগানিস্তানের শাসক আহমদ শাহ আবদালীকে হিন্দুস্তানে আসার এবং এখানে এসে ইসলামী হুকুমাত কায়েম করার আহ্বান জানান। এ ব্যাপারে হিন্দুস্তানী মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাকে পূর্ণ আস্থা প্রদানের আশ্বাস দেন। এ পর্যন্ত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবীর যে সমস্ত পত্র ছাপা হয়েছে তা থেকে দেশের রাজনীতিতে তাঁর আগ্রহ পুরোমাত্রায় প্রমাণিত হয়েছে এবং কার্যক্ষেত্রেও তিনি তাতে অংশগ্রহণ

করেছেন। আর একথা সুস্পষ্ট যে, আহমদ শাহ আবদালী তাঁরই আমন্ত্রণে হিন্দুস্তানে আসেন এবং শিখ ও হিন্দুদেরকে পর্যুদস্তু করেন।

সাইয়েদ আহমদ শহীদ

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবীর চার ছেলে বিশেষ করে তাঁর বড় ছেলে শাহ আবদুল আযীয দেহলবী পিতার মৃত্যুর পর তাঁর আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যান। সামনের দিকে গিয়ে এ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন শাহ আবদুল আযীযের সুযোগ্য ছাত্র রায় বেরেলীর সাইয়েদ আহমদ শহীদ এবং দুই দেহ এক প্রাণ হয়ে তাকে পূর্ণ সহযোগিতা দান করেন শাহ ওয়ালিউল্লাহর সুযোগ্য প্রপুত্র শাহ ইসমাঈল শহীদ ও মওলানা আবদুল হাই।

সাইয়েদ আহমদ শহীদ উনিশ শতকের শুরুতেই তাঁর সংস্কার কর্মসূচীর সূচনা করেন। এ সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি একদিকে মুসলমানদের মধ্যে যেসব বিভ্রান্ত চিন্তা ও ইসলাম বিরোধী রসম রেওয়াজের প্রচলন ছিল, সেগুলো শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলার চেষ্টা করেন। যেমন তিনি বিধবা বিবাহের জন্য অভিযান চালান। মুসলিম সমাজে যেসব শিরক ও বিদআত শিকড় গেড়ে বসেছিল, সেগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। বিশেষ করে শিরকের যাবতীয় আকৃতিকে সমূলে বিনাশ করার চেষ্টা করেন। তারপর তরীকত ও শরীয়তের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন। শাহ ইসমাঈল শহীদ লিখিত কিতাব 'সিরাতে মুস্তাকীমে' মূলত তাঁর বক্তব্যই উপস্থাপিত হয়েছে। সেখানে প্রথমেই তিনি নবীর তরীকা ও সুফীর তরীকার মধ্যে ফারাক বর্ণনা করেছেন। তারপর বিদআতের স্বরূপ এবং তা দূর করার পদ্ধতি বাতলেছেন। তারপর হিন্দুস্তানে তাসাউফের যেসব পদ্ধতির প্রচলন ছিল তার মধ্য থেকে কেবলমাত্র যেগুলো তার দৃষ্টিতে সঠিক সেগুলো বর্ণনা করেন এবং সবশেষে আত্মার পরিশুদ্ধি ও নৈতিক চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে নবীর পদ্ধতি কি ছিল—তা বর্ণনা করেন।

এ সময় উলামায়ে হিন্দ হিন্দুস্তান থেকে মক্কা যাওয়ার পথ অতি দুর্গম হওয়ার কারণে এ দেশের মুসলমানদের ওপর হজ্জ ফরয হওয়াকে মুলতবী করে দিয়েছিলেন। সাইয়েদ সাহেব জোরেশোরে এ ফতোয়ার বিরোধিতা করেন। তিনি হজ্জের মতো একটি ফরযকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য নিজেই হজ্জ সফরের প্রস্তুতি নিতে থাকেন এবং সমগ্র হিন্দুস্তানে লোক পাঠিয়ে ঘোষণা করেন, জীবন ও মৃত্যু আল্লাহর হাতে, কাজেই আল্লাহ আরোপিত একটি ফরয আদায় করার জন্য যারা আমার সাথে হজ্জে যেতে চান, তারা আসতে পারেন। হাজীদের জন্য ছয়টি জাহাজ ভাড়া করে তিনি বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে নিয়ে হজ্জ সম্পন্ন করেন।

তারপর তিনি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও হেদায়াত দানের জন্য একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। লোকদেরকে বাইআত করতেন এবং তাদের মধ্য থেকে যারা ভালো বক্তৃতা করতে পারতেন, তাদেরকে পাঠিয়ে দিতেন বিভিন্ন নগরে-বন্দরে-গ্রামে। শিরক ও বিদআত নির্মূল ও সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন এবং জনতার মধ্যে জিহাদী জোশ জাগ্রত করার জন্য তারা নির্ধারিত এলাকা চষে বেড়াতেন।

তিনি কেবলমাত্র জনতার মধ্যে জিহাদী জোশ জাগ্রত করেই ক্ষান্ত হননি বরং কার্যত জিহাদ করেও দেখিয়েছেন। হিন্দুস্তানের ইতিহাসে এটি ছিল প্রথম ও একক দৃষ্টান্ত। এর আগে মুসলমানরা রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করেছে এবং যুদ্ধের পরে ব্যক্তিতান্ত্রিক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এ সর্বপ্রথম ডাক আসে উপমহাদেশের সরজমিনে। উপমহাদেশের ইতিহাসে এ সর্বপ্রথম গ্রাম-নগর-বন্দর থেকে মুসলমানরা জিহাদের ডাকে সাড়া দিয়ে সকল প্রকার দুনিয়াবী স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে সমবেত হতে থাকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের একটি পার্বত্য উপজাতীয় এলাকায়। জিহাদের জামায়াতে শামিল হবার জন্য তিনি মুমিনদের দল গঠন করেন, তাদের আত্মার পরিশুদ্ধি করেন, তাদের মধ্যে ইসলামের একটি বৈপ্লবিক চেতনা জাগিয়ে তোলেন। তাদের মধ্যে দীনের দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যবস্থা গড়ে তোলেন এবং শুধুমাত্র সত্যের কালেমা বুলন্দ করার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করার প্রেরণায় তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন।

এ উদ্দেশ্যে সাইয়েদ আহমদ শহীদ সীমান্ত এলাকায় একটি ছোট্ট ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেন। হিন্দুস্তানের সরজমিনে এটি ছিল প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র।

কিছু লোক বলেছিল, আরে, তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের জন্য একটি ছোট রাষ্ট্র গঠন করা। এর জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ "না, সমগ্র হিন্দুস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্রের আওতাধীন করাই আমার উদ্দেশ্য। এখানে একমাত্র আল্লাহর আইন জারি হবে। ইংরেজদেরকে এদেশ থেকে বের করে দেয়া হবে। শিখদের কোমর ভেঙ্গে দেয়া হবে। মারাঠিদেরকে পর্যুদস্ত করা হবে। এভাবে এদেশটি আবার ইসলামের জন্য নিষ্কণ্টক হয়ে যাবে।" এ ছিল তাঁর উদ্দেশ্য এবং এ উদ্দেশ্য সম্পাদনের লক্ষে তিনি কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং রসূলের সুন্নাতের ইত্তেবা করার ডাক দিয়েছিলেন। তাঁর আন্দোলনের অবস্থা পড়ে যথার্থই মনে হবে, এ যুগে যেন আমরা সাহাবায়ে রসূলের নিকটবর্তী কোনো দলের কথা পড়ছি। সেই একই জোশ ও আবেগ-উদ্দীপনা, একই হাল অবস্থা, একই কুরবানী-ত্যাগ-তিতিক্ষা, একই ইখলাস আন্তরিকতা, একই আল্লাহ

নিবেদিত প্রাণ ! প্রত্যেক ব্যক্তি তার আমিরের হুকুম পালন করার জন্য সদা সর্বদা প্রস্তুত। আমীরের প্রতি তার শ্রদ্ধা ভালোবাসা অসাধারণ। জিহাদের ময়দানে যাবার প্রস্তুতি চলছে। এক ব্যক্তি জ্বরে ধুঁকছে। তাকে বলা হচ্ছে, তোমার জ্বর, তুমি বিশ্রাম করো। জবাব দিচ্ছে, না, কোথায়, আমি তো ভালোই আছি, এই প্রথম জিহাদ, মেহেরবানী করে আমাকে এতে অংশগ্রহণ করার অনুমতি দিন। এমন সব অসাধারণ দৃষ্টান্ত এখানে পাওয়া যাবে যে, অন্তত উপমহাদেশের ইতিহাসে এর কোনো নজির নেই। তারপর যেসব সংকট তাঁরা অতিক্রম করেছেন, সে ক্ষেত্রে যেমন ধৈর্যধারণ করেছেন এবং যে ধরনের আস্থা, দৃঢ়তা ও হিম্মতের সাথে তারা তার মোকাবিলা করেছেন তা সবই অসাধারণ। তাদের ব্যক্তিগত চরিত্র, নিষ্কলুষ মনোবৃত্তি ও কার্যক্রম এবং পবিত্রতার মানদণ্ড ছিল অতি উচ্চমানের। হাজার হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী একটি শহরে প্রবেশ করছে অথচ কোনো ব্যক্তির একটি মাটির পাত্রও ভাঙছে না, কারোর দোকান থেকে একটি জিনিসও উঠিয়ে নেয়া হচ্ছে না, দাম না দিয়ে কোনো একটি জিনিসও কেনা হচ্ছে না। মেয়েরা সাক্ষ দিচ্ছে ঃ না জানি সাইয়েদ বাদশাহর লোকেরা কোন্ ধাতুতে গড়া, আমাদের দিকে একবার চোখ উঠিয়ে দেখেও না। এ ছিল তাদের অবস্থা।

এ ছিল এদেশের প্রথম ইসলামী আন্দোলন, যার মাধ্যমে একদিকে চিন্তার পরিশুদ্ধি করা হয় এবং অন্যদিকে এ পরিশোধিত লোকদেরকে সংঘবদ্ধ করে সারা দেশে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ পরিচালনা করা হয়। একথা ঠিক, দুর্বল ঈমানদারদের গাদ্দারী এবং অন্য কিছু কারণে দুনিয়াবী দিক থেকে বাহ্যত এ আন্দোলন কামিয়াব হতে পারেনি। কিন্তু চিরকালের জন্য একথা প্রমাণ হয়ে গেছে যে, আল্লাহর প্রতি যথার্থ ঈমান সহকারে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলে আজো চরিত্র ও নৈতিকতার এমন একটি আদর্শ পেশ করা যেতে পারে, যার ফলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবায়ে কেরামের মুবারক স্মৃতি মানসপটে ভেসে ওঠে।

তাছাড়া ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বালাকোটের শাহাদত গাহে এ আন্দোলন খতম হয়ে যায়নি। জনতার হৃদয়ে এ আগুন জ্বলতে থেকেছে। গোপনে গোপনে এ আন্দোলন কাজ করতে থাকে। ঐতিহাসিকদের মতে একই সময় তাঁর ৬৬জন খলীফা ময়দানে কর্মতৎপর ছিলেন। অর্থাৎ সারা দেশে এ আন্দোলনের ছিল ৬৬টি কেন্দ্র। তাঁরা চতুরদিক থেকে ইংরেজদের কণ্ঠরোধ করে ফেলার উপক্রম করেছিলেন। তাঁদের কারণে ইংরেজ শাসকদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিল। ১৮৩১ সালের পরও কমপক্ষে ৫০ বছর পর্যন্ত এর তৎপরতা এগিয়ে

চলে। আর এর মাঝখানে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পেছনে যে এ আন্দোলন প্রেরণা ও শক্তি যুগিয়েছে, এতে সন্দেহ নেই।

ফারায়েযী আন্দোলন

সমসময়ে বাংলাদেশে হাজী শরীয়তুল্লাহ পৃথকভাবে একটি ইসলামী আন্দোলন পরিচালনা করেন। বাংলার মাটিতে এবং বাংলার মুসলমানদের দীনি ও জাগতিক সমস্যাবলীর প্রেক্ষিতে বর্তমান শরীয়তপুরে এ আন্দোলন গড়ে ওঠে। এ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মওলানা শরীয়তুল্লাহ বাংলার মুসলমানদের ইসলামী আকীদা বিশ্বাস সংশোধন, শিরক ও বিদআত নির্মূল, জাহেলী রসম রেওয়াজসমূহ সমূলে উৎপাটিত এবং সবশেষে সমগ্র জীবনকে ইসলামের বিধান অনুযায়ী গড়ে তোলার এবং আল্লাহর সত্য দীনকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। হাজী সাহেব তাঁর জীবদ্দশায় শুধুমাত্র জনগণের আকীদা বিশ্বাস সংশোধন এবং ইসলামী সমাজ ও চরিত্র গঠনের কাজেই মনোনিবেশ করতে পারেন। তাঁর ইন্তিকালের পরই তাঁর সুযোগ্য পুত্র মুহসিন উদ্দীন ওরফে দুদু মিয়া এ আন্দোলনকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার এবং রাজনৈতিক ময়দানেও যথাযথ ভূমিকা পালন করেন।

সাইয়েদ সাহেবের আন্দোলনের সাথে এ আন্দোলনটির গভীর একাত্মতা থাকলেও মূলত উভয়ের মধ্যে কোনো দূরবর্তী সম্পর্কও ছিল না। দুটি আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ পৃথক ধারার। হাজী সাহেব ছিলেন হানাফী ফিকহের কড়া অনুসারী—যেখানে সাইয়েদ সাহেবের আন্দোলন ছিল ফিকহী মযহাবের ব্যাপারে পুরোপুরি শিথিল বরং তিনি বিশেষ মযহাবের অনুসৃতির পরিবর্তে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলীল গ্রহণের ওপর জোর দিয়েছেন।

এ আন্দোলনের মৌল উদ্দেশ্য ও লক্ষ ছিল ঃ

এক ঃ মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের সঠিক নীতি ও আদর্শের প্রচার করা। তাদের মধ্যে ইসলামের শিক্ষার প্রসার ঘটানো। বিদআত ও শরীয়ত বিরোধী যাবতীয় কার্যকলাপ থেকে তাদেরকে দূরে রাখা। এভাবে তাদের সমগ্র জীবনকে পুরোপুরি কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে গড়ে তোলা। বিশেষ করে বাংলার যেসব মুসলমান দীর্ঘকাল অমুসলিমদের সাথে মেলামেশার কারণে বহু অনৈসলামী রীতিনীতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে এবং সেগুলোকে দীনের অংশে পরিণত করেছে—তাদের সংশোধন করা।

দুই ঃ মুসলমানদের গ্লানিময় ও দুর্দশাগ্রস্ত জীবন যাপন থেকে রক্ষা করা। বিশেষ করে যেসব মুসলিম কৃষক হিন্দু জমিদারদের জুলুম নিপীড়নের শিকার

হয়েছে তাদেরকে রক্ষা করা। তাদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, সাম্য, আত্মমর্যাদাবোধ ও দায়িত্বের অনুভূতি সৃষ্টি করা।

তিন : বাংলায় অমুসলিম (ইংরেজ) শাসন প্রতিষ্ঠার পর ফারায়েযী আন্দোলনের ধারকদের মতে এটি দারুল হরবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কাজেই একে দারুল ইসলামে পরিণত করার উদ্দেশ্যে কার্যত প্রচেষ্টা সংগ্রাম চালাতে হবে। এরি ফলশ্রুতিতেই মুসলমানরা ইসলাম ও তার দাবী অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারবে।

পূর্ব ও দক্ষিণ বংগে ফারায়েযীরা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন। ১৮১৮ থেকে শুরু করে বিশ শতকের শুরু পর্যন্ত তাদের কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। বহু ক্ষেত্রে হিন্দু জমিদারদের অত্যাচার থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করার জন্য তাদের সাথে তারা সশস্ত্র সংঘর্ষে অবতীর্ণ হন।

জামায়াতে ইসলামী

সাইয়েদ আহমদ শহীদের জিহাদ আন্দোলন এবং হাজী শরীয়তুল্লাহর ফারায়েযী আন্দোলনের প্রভাব বিশ শতকের শুরুতে উপমহাদেশের বিস্তৃত এলাকায় অনুভূত হতে থাকে। ততদিনে ইংরেজের শাসন এ উপমহাদেশে পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজের গোলামীতে মুসলমানদের একশ বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। ১৮৩১ সালে বালাকোটের জিহাদে পরাজয়, ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবের ব্যর্থতা এবং উনিশ শতকের শেষ অবধি সমগ্র বাংলা এলাকায় এ দেশে ইংরেজের বৃহত্তম এজেন্ট হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে ফারায়েযীদের নেতৃত্বাধীনে বাংলার মুসলমানদের সশস্ত্র সংগ্রামের ব্যর্থতার পর বিশ শতকে সারা উপমহাদেশ জুড়ে মুসলমানদের মধ্যে নেমে আসে হতাশা। ইত্যবসরে ইংরেজ শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর সবচেয়ে বড় আঘাত হানে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেও তারা সম্পূর্ণরূপে সূদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে। ইতিপূর্বে প্রচলিত সমস্ত ইসলামী আইন রহিত করে রোমান ল' এর ভিত্তিতে দেশের সমগ্র আইন ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এভাবে হাজার বছরের মধ্যে উপমহাদেশের মুসলমানরা সবচেয়ে বড় সংকটের সম্মুখীন হয়। তারা কেবল রাজনৈতিক দাসত্বের শিকার হয়নি, তাদের দীন ও ঈমানও হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল। তাদের ভবিষ্যত বংশধররা গড়ে উঠতে শুরু করেছিল সম্পূর্ণ অনৈসলামী কায়দায়। কিছু উলামায়ে কেরাম বেসরকারীভাবে দীনী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাদের দীনি ঐতিহ্য রক্ষার কিছুটা প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। বাংলা এলাকায় সরকারী সহায়তায়ও কিছু দীনী মাদ্রাসা চলছিল। কিন্তু ধ্বংসের কাজ যে হারে চলছিল, তাতে এগুলো ছিল নদীর তুলনায় কুয়ার

মতো। ইত্যবসরে দেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়নের আন্দোলনও শুরু হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানরা জিহাদের পথ বন্ধ হয়ে যাবার পর এখন এ আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করে। কিন্তু ইংরেজের আইনের আওতায় এবং তাদের প্রচলিত ধারায় এ আন্দোলন পরিচালিত হতে থাকে। এতদিনে মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষিত সমাজের মনে ইসলামের প্রতি বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং ইংরেজ বিতাড়নের আন্দোলনে তারা শামিল হয়ে গেলেও দেশে ইংরেজের প্রচলিত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই হয় তাদের লক্ষ। উলামায়ে কিরামও ইংরেজ বিরোধিতার লক্ষে তাদের সাথে হাত মেলায়।

এ অবস্থায় দক্ষিণ ভারতের হায়দরাবাদ রাজ্য থেকে মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ইসলামকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসেন। এ উদ্দেশ্যে মাসিক 'তরজমানুল কুরআন' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এক দশককাল তিনি অতিবাহিত করেন দাওয়াত ও ক্ষেত্র প্রস্তুতের কাজে। তারপর এ উদ্দেশ্যে ১৯৪১ সালে লাহোরে জামায়াতে ইসলামী নামে একটি দল গঠন করে এ প্রচেষ্টাকে একটি সুসংগঠিত আন্দোলনের রূপ দেন। ইংরেজ শাসনের দেড়শ বছরে মুসলমানদের মধ্যে চিন্তার ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য ও ইসলাম বৈরি মনোভাব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তা দূর করার জন্য তিনি ব্যাপক সাহিত্য সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমত মুসলমানদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানান। এজন্য কুরআনের তাফসীর রচনায় হাত দেন। কুরআনের বিধান ও সমাধান যে সবচেয়ে স্বাভাবিক, যুক্তিগ্রাহ্য, গ্রহণীয়, বাস্তববাদী ও আধুনিক তা তিনি প্রমাণ করেন। এই সঙ্গে হাদীস বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিধানকে তাঁর সমগ্র জীবনে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর সাহাবাগণ যেভাবে তাঁর অনুসরণ করেছেন তা আজো এই বিশ শতকে আমাদের জন্য সঠিক ও নির্ভুল পথ নির্দেশিকা।

একই সঙ্গে তিনি উপমহাদেশের শিক্ষিত জনমানসে প্রাধান্য বিস্তারকারী পাশ্চাত্য চিন্তা-দর্শনের কঠোর সমালোচনা করে ইসলামের দৃষ্টিতে ও বাস্তব প্রেক্ষাপটে তার গলদ চিহ্নিত করেন, যা কেবল প্রাচ্যকে নয় পাশ্চাত্যকেও নাড়া দিয়েছে।

সাথে সাথেই ইসলামের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি জীবনের সকল বিভাগের চিন্তাধারাকে সুসমন্বিত করে তাকে নতুন সাজে সজ্জিত করেন, যাতে আধুনিক মানসের কাছে তাকে গ্রহণীয় করে তোলা যায়।

নতুন সাহিত্য সৃষ্টি ও চিন্তার পরিশুদ্ধির পাশাপাশি চরিত্র গঠনের নিয়মিত কর্মসূচী গ্রহণ করেন। মুসলিম শাসনের শেষের দু তিন শ বছর বিশেষ করে মোগল শাসনামলে মুসলিম চরিত্রে যে অবক্ষয় ও এণার্কির সৃষ্টি হয়েছিল ইংরেজ শাসনের প্রতিকূল পরিবেশে তা ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই ইসলামী চরিত্র গঠনই ছিল সবচেয়ে কঠিন ও দুরূহ কাজ। এ কাজকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে তিনি দলীয় শৃংখলার ওপর সবচেয়ে বেশী জোর দেন। দলকে এমনভাবে ঢেলে সাজান যার ফলে ত্যাগ, কুরবানী, সবর ও জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর মনোভাব জীবনের সমগ্র কর্মকাণ্ডের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে।

তৃতীয়ত দেশের সার্বিক নেতৃত্বের পরিবর্তনের জন্য তিনি ব্যাপক রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। ইসলামী চিন্তায় ও চরিত্রে সুগঠিত জনগোষ্ঠীকে দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বে সমাসীন করার উদ্দেশ্যে জনসংযোগ বৃদ্ধি এবং ইসলামী অনুশাসন অনুযায়ী জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার ব্যবস্থা করেছেন।

বিগত পাঁচ দশক থেকে এ আন্দোলন উপমহাদেশের ছটি এলাকায় পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, নেপাল ও কাশ্মীরে সক্রিয় রয়েছে। উপমহাদেশের সমগ্র জনজীবনে এ আন্দোলন একটি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে একথা অবশ্যই বলা যায়।

সমস্যা ও সম্ভাবনা

সম্ভাবনার সাথে সমস্যাও জড়িয়ে আছে। আমাদের মতে, বর্তমান যুগে ইসলাম ও মুসলমানের যে সমস্যা এটা কোনো দেশের একক সমস্যা নয়। চৌদ্দশ বছর পরে একটা জাতির পুনরুজ্জীবন, তার আগের ধারার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে নতুন ধারা প্রবর্তন চাট্টিখানি কথা নয়। উনিশ শতক পর্যন্ত ইসলামী দুনিয়ার অবস্থার পরিবর্তন হলেও, আগের ধারা থেকে মুসলমানরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি, কিন্তু বিশ শতকে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের শক্তিশালী অংশটি ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়েছে বা ইসলামের সাথে তার সম্পর্ক ঢিলেঢালা হয়ে গেছে। আর উপমহাদেশে এ সংকট সবচেয়ে বেশী প্রকট। কাজেই এ অবস্থায় তাদের মধ্যে চিন্তার পুনরবিন্যাস যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে বরফ গলতে শুরু করেছে এবং এতে খোদ পাশ্চাত্যও সাহায্য করছে। কারণ তাদের স্বহস্তেই তাদের চিন্তা আজ নিন্দিত এবং কোথাও কোথাও পরিত্যক্ত। তাই ইসলামী আন্দোলনের সাফল্যের চূড়া দেখা না গেলেও, সেখানে যে ঘন্টা বাজছে তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অবদান

ইসলাম একটি আদর্শ, একটি মতবাদ, একটি জীবন দর্শন, একটি ইবাদত পদ্ধতি, একটি সাংস্কৃতিক জীবনাচরণ, একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা, বিশ্ব মানবতার জন্য কল্যাণমুখী একটি সার্বিক জীবন বিধান। ইসলামী আদর্শ দুনিয়ার সব দেশের মানুষের জন্য সমান কল্যাণকর। দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে ইসলাম সমান চোখে দেখে। ইসলামী আদর্শের বাণী বাহক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে এসে বিদায় হজ্জের সময় কয়েক লাখ উপস্থিত প্রাণ উৎসর্গকারী জনতার সামনে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন ঃ আজ থেকে আজমের ওপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কালোর ওপর সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই—কুল্লুকুম মিন আদামা ওয়া আদামু মিন তুরাব—'তোমরা সবাই আদমের বংশজাত, আর আদমের জন্ম মাটি থেকে।'

এভাবে ইসলাম সমস্ত মানুষকে আহ্বান জানায় তার ন্যায়, সত্য ও কল্যাণ নীতির দিকে। কোনো প্রকার জাতিগত, বংশগত, ভাষাগত, সম্প্রদায়গত বিভেদ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টির কৌশলকে ইসলাম তার এ কল্যাণ নীতি অর্জনের লক্ষে ব্যবহার করে না। সমাজ গঠনের প্রথম পর্যায়েই ইসলাম ঘোষণা করেছে ঃ আল ফিতনাহু আশাদ্দু মিনাল কাতল—'বিশৃংখলা, বিপর্যয় ও বিভেদ সৃষ্টি হত্যাকাণ্ডের চাইতেও মারাত্মক।' এ ভাঙার তুলনায় গড়ার দিকে সবিশেষ নজর দেবার কারণেই দুনিয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থা যখন উন্নতির মুখই দেখেনি, এক হাজার মাইল দূরে একটি ঘটনার খবর পৌঁছতে যখন মাসের পর মাস বছরের পর বছর সময় লাগতো, যখন অশ্বই ছিল সবচেয়ে দ্রুতগামী বাহন, সে যুগে মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে জনঅধ্যুসিত অর্ধেক পৃথিবী ইসলামী আদর্শের পদানত হয়েছিল।

তরবারি দিয়ে দেশ জয় করা যায় কিন্তু মানুষের মন জয় করা যায় না। কারণ সেটা যে ধাতুতে গড়া তার কাছে মানুষের তরবারি ভোঁতা। দেহ একটুতেই অবশ হয়ে পড়ে কিন্তু মন হাজার নিগ্রহ নির্যাতনের পরেও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। অথচ ইসলাম এ অর্ধেক পৃথিবীর মানুষের মন জয় করে নিয়েছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল প্রথম যুগের ইসলামী আদর্শের অনুসারীদের আদর্শ অনুকরণীয় জীবনাচরণের কল্যাণেই। দুনিয়ার অন্য কোন আদর্শ তার অনুসারীদের ওপর এর একশ ভাগের এক ভাগও প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তাই এ আদর্শের

অনুসারীরা দুনিয়ার যেখানেই গেছে মানুষ তাদেরকে সাদরে বরণ করে নিয়েছে। এতবড় পরিবর্তন কোনো আদর্শ দুনিয়ার কোনো দেশে আর কোনো দিন করতে পারেনি।

উপমহাদেশে ইসলামের প্রতিষ্ঠা

রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের তিন চারশ বছর আগেই ইসলাম একটি আদর্শ ও মতবাদ হিসেবে উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। উপমহাদেশের পশ্চিমে, পূর্বে ও দক্ষিণে এর বিস্তার ঘটে। এখানকার বর্ণবাদে আক্রান্ত সামাজিক অমানবিকতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা অর্থনৈতিক শোষণ-নিপীড়ন এবং ধর্মীয় বিকৃতি ও অন্তসারশূন্যতা ইসলামী আদর্শের জন্য পথ পরিষ্কার করে। অতি অল্প দিনের মধ্যেই এ বিশাল এলাকার লাখো লাখো মানুষ ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয় এবং ইসলামী ভাবধারাকে তাদের জীবনের কেন্দ্রীয় শক্তিতে পরিণত করে। বিদেশ থেকে যেসব মুসলমান আগমন করে তারাই মূল প্রেরণা যোগায়। তাদের বিশ্বাস ও চরিত্র চুম্বকের কাজ করে।

অতীতে নবী রসূলগণের অনুরূপ বহু মহাপুরুষ এ এলাকার মানুষের জীবন গঠনের কাজে বিরাট অবদান রাখেন। আর্যদের নগর জীবনের কলুষতা, বর্ণাশ্রম পীড়িত সমাজ ব্যবস্থা ও ধর্মীয় বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে দুটি বৃহৎ ধর্মীয় আন্দোলন উপমহাদেশের সমগ্র এলাকাকে বিপুলভাবে নাড়া দেয়। জৈনবাদ ও বৌদ্ধবাদ ইসলামের আগমনের পূর্বে প্রায় দেড় দু হাজার বছর ধরে এখানকার বিপুল সংখ্যক মানুষের মনে একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করে রাখে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদের হিংস্রতার কাছে এদের অপমৃত্যু ঘটে। মনে হয় ব্রাহ্মণ্যবাদের হিংস্রতার মুহুর্মুহু আক্রমণ ও সুচতুর রণকৌশলের কাছে এ মতবাদ দুটি তাদের অভ্যুদয়ের একশ বছরের মধ্যেই আত্মসমর্পণ করে। তারপর থেকে তারা হয়ে পড়ে ব্রাহ্মণ্যবাদের হাতে জিম্মী। বাংলায় ইসলামের আগমনের প্রাথমিক দিনগুলোয় এ মতবাদ দুটিকে ব্রাহ্মণ্যবাদের খোলসের মধ্যে সহজিয়া, তান্ত্রিক, নাথপন্থী ইত্যাদি বিভিন্ন আকৃতিতে নিজেদের পৈত্রিক রূপের ছিটেফোঁটা সংরক্ষণে ব্যস্ত দেখা যায়।

উপমহাদেশে এই দুটি মতবাদের লাখো নিগৃহীত ব্যর্থ অনুসারীদের কাছে ইসলাম সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হিসেবে দেখা দেয়। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু পাঞ্জাবের অধিকাংশ এলাকা ও বাঙলা ছিল বৌদ্ধদের পীঠস্থান। ফলে ইসলামের আগমনে এসব এলাকার লোকেরা তাকে বিপুলভাবে স্বাগত জানায়। স্থানীয় জনসমাজের অন্যান্য নিগৃহীত গোষ্ঠীও ইসলামের পতাকাতলে নিজেদের ইহকাল ও পরকালের সাফল্য খুঁজে পায়। এভাবে আরবের ন্যায় এদেশেও

দরিদ্র নিগৃহীত ও নিপীড়িত মানব গোষ্ঠীই ইসলামের প্রতি সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ অনুভব করে। অবশ্যি এর পেছনে অবদান রয়েছে একদল সুফী ও দরবেশ ইসলাম প্রচারকের এবং একদল আলেম ও একনিষ্ঠ সাধকের ইসলামী জ্ঞান ও জীবন চর্চার। তাই আমরা দেখি দিল্লীতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই আজমীরে হযরত খাজা মুইনউদ্দীন চিশতীর (র) হাতে উত্তর ভারতের হাজার হাজার মানুষের ইসলাম গ্রহণ।

এভাবে মুসলিম রাজশক্তির বিকাশের অনেক আগেই ইসলাম উপমহাদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবনে আশার আলো জ্বালিয়ে দেয়। যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে অথবা তাঁর পরবর্তীকালে তাঁর সাহাবীদের একটি ক্ষুদ্রতম দল এদেশে চলে আসতো তাহলে পরবর্তীকালে এদেশে ইসলামের পতাকা ছাড়া আর কোন পতাকা দেখা যেতো না। অথবা যদি ইসলামের প্রথম যুগের বিজেতা মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের (র) বিজয় অভিযান সিন্ধুতে থেমে না যেতো, তাকে শৃংখলিত হয়ে দামেস্ক ফিরে যেতে না হতো এবং ইসলামের নিবেদিত প্রাণ মুজাহিদরা রাজশক্তির বিকাশ ও রাষ্ট্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নয় বরং পথভ্রষ্ট, নিগৃহীত, নিপীড়িত মানবতাকে সঠিক পথের সন্ধান দেবার এবং তাদের জীবনে সত্য ন্যায় ও কল্যাণের আলো জ্বালিয়ে দেবার লক্ষে এদেশে বিজয় অভিযান চালাতেন তাহলে আজ এদেশের আকাশে বাতাসে এবং এদেশের পাহাড়ে পর্বতে বনে প্রান্তরে প্রতিটি গৃহে আল্লাহ ও রসূলের বাণী ছাড়া আর কিছুই শ্রুত হতো না। শিরকের সমস্ত উপাদান আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরে নিক্ষিপ্ত হতো। মোটকথা এদেশে ইসলামের প্রথম অভিযানের ধারা বিবরণী থেকে আমরা এতটুকু জানতে পারি যে, সে সময় ইসলাম এদেশে তার বৃহত্তম ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়নি।

শুধুমাত্র সিন্ধুতে এবং পাঞ্জাবের মুলতান পর্যন্ত একটি এলাকায় ইসলাম একটি আন্দোলন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। বিভিন্ন কারণে তার বিস্তৃতি সে আমলে এ এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে। উত্তর পশ্চিম ভারতে অন্যান্য এলাকায় সীমান্ত পার থেকে মুসলিম প্রচারক ও বিজেতা দলসমূহের বারবার ও ক্রমাগত আগমনে এ এলাকাও ইসলামের ভূখণ্ডে পরিণত হয়। কিন্তু এ এলাকায় ইসলাম কোনো সার্বিক আন্দোলনের রূপলাভ করেনি। পূর্ব দিকে বাঙালা ও কামরূপ এলাকায় মূলত সুফি দরবেশরাই ছিলেন ইসলামের পতাকাবাহী। তাদের নিষ্ঠাপূর্ণ, ত্যাগী ও খানকাহী জীবন ইসলামের সত্য বাণীর বিপুল প্রচার ও প্রসারে সহায়তা করে। তাঁদের কথায় ও কাজে ভোগ, স্বার্থবাদিতা, লোভ, প্রতারণা ও জুলুমের লেশমাত্রও ছিল না। অন্যদিকে তাঁরা একটি আল্লাহ ও

রসূলে বিশ্বাসী গভীর শান্তিময়, ক্লেদমুক্ত, সরল সমতাপূর্ণ জীবনের সন্ধান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের প্রচেষ্টায় এ এলাকায় ইসলাম অচিরেই একটি বিরাট শক্তিতে পরিণত হয়। তাঁদের এই প্রচার কাজে সবচেয়ে বেশী সহায়তা করে অন্যায় জুলুম শোষণের বিরুদ্ধে তাদের আপোশহীন সুদৃঢ় অবস্থান। কোথাও তাঁরা অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে স্থানীয় রাজা ও সামন্তদের সাথে সশস্ত্র সংগ্রামে রত হন। এর ফলে বিভিন্ন এলাকায় নিগৃহীত জনতার মধ্যে ব্যাপক গণ-বিদ্রোহ দেখা দেয়। জনতাই জুলুমের শৃংখল ছিন্ন করে। এভাবে ইসলাম একটি গণ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। মুসলিম রাজশক্তির বিজয় অভিযানের আগে ও পরে এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে।

তবু ইসলামের যে আন্দোলনী রূপ, যা মুসলিম জীবনে সমাজ ব্যবস্থায় একটি দ্রুত সার্বিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চালায় তা প্রথম যুগে ইসলামের এ বিজয় অভিযানে উপমহাদেশের এ পূর্বাঞ্চলে কোনোদিন বিকাশ লাভ করতে পারেনি। এর প্রধান কারণ, ততদিনে ইসলামী বিশ্বে ইসলামের আন্দোলনী রূপ ও ভূমিকা নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। মোগল, তাতার, তুর্কী, পাঠান ইত্যাদি ইসলামের নতুন সিহাপসালাররাই তখন ছিলেন এ এলাকায় ইসলামের প্রধান প্রতিনিধি। আর কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তাঁরা সবাই ইসলামের আন্দোলনী চরিত্র থেকে ছিলেন অনেক দূরে। দ্বিতীয়ত রসূলের সংস্পর্শের ঘ্রাণও যাদের মধ্যে পাওয়া যেতো অর্থাৎ তাবেঈ ও তাবেতাবেঈদেরও স্পর্শ এ এলাকার মুসলমানরা পেয়েছিল বলে এখনো ইতিহাসের কোনো সুস্পষ্ট প্রামাণ্য তথ্য সামনে আসেনি। আর তেমন দু চারটে নাম সামনে এলেও তাতে ইসলামের আন্দোলনী চেহারাকে মূর্ত করে তোলার ছবি খুবই অস্পষ্ট।

এমনি ধরনের আরো বহুবিধ কারণে ইসলাম প্রথম দিকে এ এলাকায় একটি সঠিক আন্দোলনের রূপ লাভ করতে সক্ষম হয়নি।

মুসলিম শাসকদের স্বার্থবাদিতা

পরবর্তীকালে মুসলিম রাজা-বাদশাহ ও শাসক সমাজ ইসলামকে শুধু নিজেদের স্বার্থেই ব্যবহার করেছেন। শাসকদের এ প্রক্রিয়া এখনো অব্যাহত আছে। ইসলামকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে গিয়ে এবং মুসলিম জনতার ওপর নিজেদের প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখতে গিয়ে তাঁরা ইসলামী সমাজ কাঠামোকে যে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন তার ফলে উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলের এ সদ্য প্রতিষ্ঠিত এবং দিল্লীর কেন্দ্র থেকে হাজার মাইল দূরে অবস্থিত সম্ভাবনাময় মুসলিম সমাজটি বারবার বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। দিল্লীর শাসনমুক্ত সুলতান আমলের দুশো বছর এ বিভ্রান্তিতে কোনো পরিবর্তন

আনতে পারেনি। কারণ শাসনের কেন্দ্র দু জায়গায় থাকলেও শাসকদের প্রবণতা ও মনোবৃত্তিতে কোনো ফারাক ছিল না। তাদের শাসন প্রণালীও ছিল এক। ইসলামী স্বার্থ ও ইসলামী সমাজের নৈতিক, আধ্যাত্মিক উন্নয়নের চাইতে তাদের কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল নিজের ও নিজের পরিবারের শাসন ধারা টিকিয়ে রাখা। তাই বাঙ্গালী প্রজাদের স্বার্থে তারা বাংলা ভাষার উন্নয়ন করেছেন। কিন্তু তাতে ইসলামী ভাবধারা সংযোজন এবং মুশরিকী ও কুফরী ভাবধারার প্রভাব থেকে তাকে মুক্ত করার কোনো সাহসিক প্রচেষ্টা তারা চালাননি। বরং নিজেদের আসন টিকিয়ে রাখার স্বার্থে কেউ কেউ শিরক ও কুফরীর চর্চাও করছেন। রাজ অন্তপুরেও এর চর্চা হয়েছে। ফলে রাজ পরিবারের সাথে জড়িত অভিজাত পরিবারগুলোতে এক প্রকার ইসলাম বিরোধী পরিবেশ লালিত হয়েছে।

আর সাধারণ মুসলিম সমাজের বৃহত্তর অংশ ছিল নিকটবর্তী ও পার্শ্ববর্তী মুশরিক সমাজ থেকে আগত তাদের কর্তিত অংশ। সঠিক ইসলামী তালীম ও সুষ্ঠু ইসলামী চেতনা সঞ্জাত পরিচর্চার অভাবে এ সমাজের মূলগত কাঠামো থেকে শিরকী ভাবধারা ও আচার অনুষ্ঠান পুরোপুরি বিদায় নিতে পারেনি। সেখানে রয়ে গিয়েছিল শিরকের ক্ষতাবশিষ্ট। দীর্ঘকাল পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। মোগল আমলের শেষের দিকে বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব নেন।

ইসলামী আন্দোলনগুলোর সীমিত কার্যক্রম

উনিশ শতকে দুটি ইসলামী আন্দোলন এদেশের মাটিতে দানা বেঁধে ওঠে। তাদের একটি বাংলার বাইর থেকে আগত এবং অন্যটির জন্ম এদেশেই। একটি তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া বা জিহাদ আন্দোলন এবং অন্যটি ফারায়েযী আন্দোলন নামে পরিচিত। এ ইসলামী আন্দোলন দুটির সংস্পর্শে এসেই এদেশের মুসলমানরা সর্বপ্রথম নিজের জীবন ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। এ প্রথম শিরক ও তওহীদের পার্থক্য তাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়। নিজেদের জীবনে ও সমাজ কাঠামোর কোথায় কোথায় শিরক আছে তা তারা চিহ্নিত করতে তৎপর হয়ে ওঠে। ইসলামের মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহর গুরুত্ব তারা উপলব্ধি করতে পারে। ইসলামী বিশ্বাস, ইসলামী জীবন ও ইসলামী সমাজ তাদের কাছে মূল্যবান বলে মনে হয়।

প্রথম আন্দোলনটির সাথে বাংলার একটি এলাকার গভীর সংযোগ স্থাপিত হয়। এ আন্দোলনটির লক্ষ ছিল উপমহাদেশে একটি যথার্থ ইসলামী রাষ্ট্র

প্রতিষ্ঠা। এজন্যে তারা জিহাদের পথ অবলম্বন করে। ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্তরগত রায়বেরিলীর হযরত সাইয়েদ আহমদ (র) এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তিনি সারা ভারতবর্ষ থেকে উৎসর্গিত প্রাণ একদল মুজাহিদ নিয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর প্রাথমিক সংঘর্ষ শুরু হয় নিকটবর্তী পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের শিখ শাসকদের সাথে। ১৮৩৭ সালে কাশ্মীরের বালাকোটে শিখদের সাথে এক সংঘর্ষে তিনি নিজের প্রথম সারির কয়েকজন সহযোগীসহ শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর শাহাদত বরণের পর আরো প্রায় অর্ধ শতক পর্যন্ত এ আন্দোলন সক্রিয় ছিল এবং বিভিন্ন পর্যায়ে জিহাদও পরিচালিত হয়েছিল। বাংলার একটি সীমিত এলাকায় এই জিহাদ বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। পূর্ব বাংলার নোয়াখালী কুমিল্লা ঢাকা থেকে সোজা উত্তর বাংলার পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ এলাকাটি থেকে বরাবর মুজাহিদ ও অর্থ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও কাশ্মীরে সরবরাহ হতে থেকেছে।

অন্যদিকে ফরায়েযী আন্দোলনের প্রভাব মূলত মধ্য, দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলার পূর্বতন ফরিদপুর, ঢাকা ও মোমেনশাহীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। পশ্চিম বংগের চব্বিশ পরগণা জেলায়ও এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে।

এ দুটি ইসলামী আন্দোলন সীমিত পর্যায়ে যতটুকু প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় তার ফলে বাংলার সাধারণ মুসলমানরা এ প্রথম নিজেদের ইসলামী জীবন ধারার বৈশিষ্ট সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করে। মুশরিকী চিন্তাভাবনা ও আচার অনুষ্ঠান থেকে তারা নিজেদেরকে পৃথক করার প্রচেষ্টা চালায়।

বিশ শতকের ইসলামী আন্দোলন

এ আন্দোলনের প্রভাব শেষ হতে না হতেই বালাকোটের জিহাদের একশো বছর পর উপমহাদেশে আর একটি সার্বিক ইসলামী আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৯৪১ সালে লাহোরে এ আন্দোলনের সূচনা হলেও এর প্রস্তুতি কাজ আরো দশ বছর আগে থেকে চলতে থাকে। দক্ষিণ ভারতের হায়দরাবাদের আওরংগাবাদ শহর থেকে মওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (র) তরজমানুল কুরআনের মাধ্যমে সমগ্র বৃটিশ ভারতে একটি সার্বিক ইসলামী আন্দোলন পরিচালনার জন্য সচেতন মুসলিম চিন্তাশীল সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। তাঁর এ আহ্বানে সারা ভারতে বিভিন্ন এলাকার ৭৫জন শ্রেষ্ঠ উলামা ও চিন্তাবিদের সমন্বয়ে ১৯৪১ সালে লাহোরে ইসলামী আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামী গঠিত হয়।

বৃটিশ শাসনের অবসানের আগেই বাংলার মাটিতেও এ আন্দোলনের কাজ শুরু হয়ে যায়। বিগত অর্ধ শতকে এ আন্দোলন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগিয়েছে। এ আন্দোলন মুসলিম জন জীবনে যে পরিবর্তনগুলো এনেছে তা সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরছি ঃ

১. মুসলমানদের দীনী আকীদা ও বিশ্বাসকে পরিশুদ্ধ করেছে। শিরক ও মুশরিকী ভাবধারা সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন করে তুলেছে।

২. তওহীদ খালেসের সাথে তাদের সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছে। নির্ভেজাল তওহীদ এই এলাকার মুসলমানদের আকীদা বিশ্বাস ও চিন্তা রাজ্যে আজ সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ বলে বিবেচিত হতে চলেছে। আমাদের বিগত কয়েকশো বছরের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক অবদানগুলো থেকে আমরা এ নির্ভেজাল তওহীদকে কলুষিত করার সবচেয়ে জঘন্য প্রচেষ্টার সন্ধান পাই। এরপর আছে বিভিন্ন ধর্মীয় অসাধু ও ভণ্ড পীরের প্রচেষ্টা। ইসলামী আন্দোলন তার মূল্যবান সাহিত্য ও বিভিন্ন পর্যায়ে সরাসরি চিন্তার বিনিময় ও বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যমে এ গোমরাহী থেকে মুসলমানদেরকে সচেতন করে চলেছে।

৩. মুসলমানদের সমগ্র চিন্তা ও কার্যক্রমকে একটি কেন্দ্র ও উৎসাভিমুখী করেছে। সমস্ত চিন্তা ও কাজের মোড় কুরআন ও সুন্নাতের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে। মানে তাদের মধ্যে এই প্রবণতা সৃষ্টি করেছে যে, কুরআন ও সুন্নাতের মূলনীতি ও মৌল ভাবধারার সাথে সংঘর্ষশীল কোনো চিন্তা ও কার্যক্রম যথার্থ ও সঠিক নয়। যে কোনো চিন্তা ও কার্যক্রমকে তারা কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে বিচার করতে শিখছে।

৪. মুসলমানদের জীবনে শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতার প্রসার ঘটিয়েছে। মূলত এটি ইলাহী গুণাবলীরই একটি অংশ, যা মানুষের জীবন গঠনের একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান।

৫. তাদের মধ্যে সত্য ও ন্যায়ের জন্য ত্যাগ স্বীকার করার এবং লাগাতার প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার প্রেরণা সৃষ্টি করেছে।

৬. জুলুম, অন্যায়, অবিচার ও নিগ্রহ নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার এবং তার উৎখাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করার মনোবল সৃষ্টি করেছে।

৭. যে কোনো প্রকার সামাজিক দুর্নীতি ও অপরাধ থেকে মুক্ত থাকার এবং এজন্য যে কোনো বিপদ ও ক্ষতি বরদাস্ত করার মতো দৃঢ় মানসিক চেতনায় তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে।

৮. তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্ববোধ এবং পারস্পরিক সাহায্য ও সহানুভূতির ভাবধারা সৃষ্টি করেছে। একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এর অপরিহার্যতা প্রশ্নাতীত।

৯. ইসলামী আন্দোলন এ দেশের সার্বিক জনমতের ক্ষেত্রে ইসলামকে একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মাত্র তিরিশ বছর আগেও এ বিষয়টি এদেশে স্বীকৃত ছিল না। আজ ইসলাম একটি পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা নয়, একথা বলার মতো একটি মুসলমানও এদেশে নেই।

১০. এ দেশের জনমনে খালেস ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাংখা ও চেতনা জাগিয়ে তোলা ইসলামী আন্দোলনের একটি বৃহত্তম অবদান।

বিশ্ব ব্যবস্থায় পরিবর্তন অপরিহার্য

আমাদের গোটা বিশ্বটাই গড়ে উঠেছে একটা পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। সৃষ্টির কোনো এক বিশেষ লগ্নে মহাশক্তিধর মহান স্রষ্টা এক তাৎপর্যময় মহা বিস্ফোরণের মাধ্যমে এ মহাবিশ্ব ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছিলেন। মহাকাশে ছড়িয়ে পড়েছিল গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ, নীহারিকা। তারপর থেকে পরিবর্তনের ধারা গতিশীল রয়েছে সর্বক্ষণ। আর গতিই হচ্ছে এ বিশ্ব ব্যবস্থার প্রাণ। কুল্লা ইয়াওমিন হুয়া ফী শান—'প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ সৃষ্টি মুখর।'

–(সূরা আর রহমান ঃ ২৯)

বিশ্ব জগতের সৃষ্টি ও স্থায়িত্বের মধ্যে যেমন গতিশীলতা রয়েছে তেমনি দুনিয়ায় মানুষের জীবনে ও জীবন ব্যবস্থাপনায়ও রয়েছে গতিশীলতা। মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি, দেশে দেশে ছড়িয়ে যাওয়া, জীবন যাপনের জন্য নতুন ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা এবং প্রচলিত ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় ও যুগোপযোগী পরিবর্তন সাধন করে তাকে সচল ও সক্রিয় রাখা এসবই গতিশীলতার অংগীভূত। সারা দুনিয়ায় মানুষ এভাবেই তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত মানুষ এভাবেই তার সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করেছে। কোথাও সে থেমে থাকেনি। একটি পথের সন্ধান পেয়েছে। সে পথেই এগিয়ে গেছে। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে পথ থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে। সে বিচ্যুতির ওপরই সে টিকে থাকেনি। আবার নতুন পথের সন্ধান করেছে এবং বিচ্যুতির সংশোধন করে আবার সঠিক পথে চলে এসেছে। এ প্রক্রিয়াকেই কুরআনে বলা হয়েছে ঃ ওয়া কুল জাআল হাক্কু ওয়া যাহাকাল বাতিল, ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা। "আর বলে দাও, সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অবশ্যই মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েই থাকে।"–(সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ৮১)

বর্তমান ও আধুনিক বিশ্বে যে ব্যবস্থার প্রচলন ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তাতে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের কম বেশী কিছু অংশ থাকলেও তার মূল উপাদান সরবরাহ করেছে ইউরোপীয় তথা পাশ্চাত্য জাতিরা। চলতি শতকে এ ব্যবস্থা সারা বিশ্বকে গ্রাস করেছে। এর আগের শতকে এ ব্যবস্থার বিস্তার ঘটে প্রবলভাবে এবং এর প্রায় দুশ বছর আগে থেকে এটি প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। বলা যায়, চারশ বছর থেকে এ ব্যবস্থার উত্থান এবং বর্তমানে এটি একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে গেছে।

এ ব্যবস্থা বিশ্বকে কি দিয়েছে এবার আমরা এর পর্যালোচনায় আসতে পারি। আমরাও এ ব্যবস্থার মধ্যেই চোখ খুলেছি। বড় হয়েছি, একে দেখেছি এবং এর মধ্যেই আমাদের জীবনের দিনগুলো অতিবাহিত করছি। আধুনিক বিশ্বের একজন নাগরিক হিসেবে আমরা কি পেয়েছি ?

এক. জীবনের সবচেয়ে বড় যে খুঁটি বিশ্বাস, তা আমরা পাইনি। পেয়েছি এক গাদা সংশয়। আমাদের যার যা বিশ্বাস ছিল—আল্লাহ, খোদা, ঈশ্বর, ভগবান, নবী, রসূল, অবতার, পরকাল, বেহেশত, দোজখ, স্বর্গ, নরক, কিয়ামত, হাশরের ময়দানে আল্লাহর আদালতে দুনিয়ার জীবনের সমস্ত কাজকর্মের চুলচেরা বিচার, এসবই নানান সংশয় ও সন্দেহের আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। ইউরোপীয় ও পাশ্চাত্য চিন্তা গত চারশ বছর ধরে সারা পৃথিবীতে এ সংশয়ের বীজ বপন করেছে। সংশয় দূর করার চেষ্টা তার এক রত্তিও নেই। ফলে আমাদের জীবন হয়েছে নোঙ্গর ছাড়া। কোন্ ঘাটে তরী ভিড়বে তার ঠিক নেই।

দুই. আমরা পেয়েছি একটা প্রকাণ্ড স্বার্থ কেন্দ্রিক জীবন। নিজের স্বার্থলাভটাই এখানে সবচেয়ে বড় পাওয়া। এমনকি নিজের স্বার্থটা সংকুচিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র ব্যক্তিসত্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ছেলেমেয়ে এবং নিজের স্ত্রীও এখানে পর। নিজের ব্যক্তি স্বার্থের জন্য আমি সবার স্বার্থ বলি দিয়ে যাই, এ যেন ইয়া নফসি ইয়া নফসি কিয়ামতের ময়দান। এভাবে একটা একক আত্মস্বার্থ কেন্দ্রিক জীবন এ পাশ্চাত্য চিন্তা আমাদের উপহার দিয়েছে।

তিন. একটা ব্যবস্থার জুলুম নিরসনের জন্য করুণাময় আল্লাহ আর একটা ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটান। وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ 'আল্লাহ যদি মানব জাতির একদলকে অন্যদলের সাহায্যে প্রতিহত না করতেন তাহলে পৃথিবী বিপর্যস্ত হতো। কিন্তু আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতি অনুগ্রহশীল।'–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৫১) এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইউরোপীয় ও পাশ্চাত্য জাতিরা চারশ বছর পরে আজ আমাদের যে ব্যবস্থা উপহার দিয়েছে তা সরাসরি জুলুম, শোষণ, নির্যাতন, সন্ত্রাস, এক জাতির ওপর আর এক জাতির আধিপত্য বিস্তার এবং একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতারণা ও জুলুমের আশ্রয় গ্রহণ এবং আইনের ছত্রছায়ায় চরম বেআইনী কার্যকলাপ করার মহড়ায় পরিণত হয়েছে। ইতিমধ্যেই এ ব্যবস্থা এ শতকের প্রথমার্ধেই বিশ্ববাসীকে দু দুটো বিশ্বযুদ্ধ উপহার দিয়েছে। যাতে কয়েক কোটি নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে তার চেয়েও

অনেক বেশী লোক। পংগু হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে কোটি কোটি মিলিয়ন ডলারের। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর বুকের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল দীর্ঘ চল্লিশ বছর ব্যাপী এক মহা অস্বস্তিকর ঠাণ্ডা যুদ্ধ।

আর এ ব্যবস্থার এ শতকের সবচেয়ে ভয়ংকর মানবতা বিরোধী অবদান হচ্ছে মার্কসবাদ ও কমিউনিজম। স্রষ্টাকে অস্বীকার করে মানবতার সকল প্রকার সৎ গুণাবলীকেই নির্মূল করা হয়েছে। কুরআনে আল্লাহর রংকেই সবচেয়ে সুন্দর বলা হয়েছে। (ওয়ামান আহ্‌সানু মিনাল্লাহি সিবগাতান) এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমাকে পাঠানো হয়েছে মানুষের নৈতিক চারিত্রিক গুণাবলীকে পূর্ণতা দান করার জন্য (বুঈসতু লিউতাম্মিমা মাকারিমাল আখলাক)। সে ক্ষেত্রে মার্কসবাদ আল্লাহ ও রসূলকে অস্বীকার করে মানুষের জীবনে ও চরিত্রে সৃষ্টি করেছে নৈরাজ্য। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় কমিউনিস্ট বিপ্লবের সূচনালগ্নে মাত্র দশ দিনে যে লক্ষ লক্ষ নিরীহ রুশ জনতাকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হয় তা এ ব্যবস্থার মানবতা বিরোধিতারই একটি বিশিষ্ট অংশ। তারপর থেকে মধ্য ও পূর্ব এশিয়ার স্বাধীন দেশগুলোকে গ্রাস করে সেখানে নির্যাতন ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে কমিউনিজম বিস্তারের প্রচেষ্টা চালানো মানবতা বিরোধিতারই একটি অংশ। পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোয়ও সন্ত্রাস, নির্যাতন, গণহত্যা, ষড়যন্ত্র ও দমননীতির মাধ্যমে দীর্ঘকাল কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং দুনিয়ার দেশে দেশে কমিউনিস্ট সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বিস্তৃত করাও মানবতা ধ্বংসেরই একটি চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়।

পুঁজিবাদী ও কমিউনিস্ট পরাশক্তি বিগত কয়েক দশক ধরে বিশ্ব শাসন করে আসছিল। সারা বিশ্বকে হিংসা, ঘৃণা, হত্যাকাণ্ড, শোষণ, জুলুম, অন্যায় ও অবিচারে ভরে তুলেছিল। অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য তারা জাতিসংঘ নামে একটি বিশ্বসংস্থা গড়ে তুলেছে ঠিকই। কিন্তু ধীরে ধীরে দেখা গেলো এ সংস্থাটি তাদের শিখণ্ডীতে পরিণত হয়েছে এবং তার কাজই হয়েছে এ দুই গোষ্ঠী যেসব অন্যায় করবে তার গায়ে ন্যায় ও ইনসাফের মোহর মেরে দেয়া এবং তাকে বৈধতার ছাড়পত্র দিয়ে অন্যায়কে গায়ের জোরে প্রতিষ্ঠিত করা। সম্প্রতি কমিউনিস্ট পরাশক্তির স্বাভাবিক অপমৃত্যুর পর পুঁজিবাদী পরাশক্তি তথা আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপীয় গোষ্ঠী নতুন উদ্যোগে জুলুম ও নির্যাতনের পথে এগিয়ে চলছে। দুনিয়ার সমস্ত দেশ এখন তাদেরই খপ্পরে। তাদেরই গড়ে তোলা ব্যবস্থার মাধ্যমে আজ এশিয়ার কিছু দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ঢেউ লেগেছে। কিন্তু এ দেশগুলো ইতিপূর্বেই পাশ্চাত্য চিন্তা ও সভ্যতাকে গ্রহণ করে নিয়েছে। কাজেই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্র পরিবর্তন হলেও জীবন চিন্তা ও

জীবনের কর্মকাণ্ডে কোনো পরিবর্তন আসছে না। ফলে জুলুম ও অন্যায় একই ধারায় এগিয়ে চলবে। আমেরিকার ভূমিকায় হয়তো তখন চীন বা জাপানকে দেখা যাবে। এভাবে বিশ শতক শেষ হয়ে যাবে। তারপর দু' হাজার সালের পরে দেখা যাবে জুলুমের নতুন ও আরো ভয়াবহ রূপ। কারণ শাসক ও শাসন ব্যবস্থার মধ্যে কোনো গুণগত পরিবর্তন আসছে না, পরিবর্তন আসছে শুধু চেহারায়।

বিশ্ববাসীর জন্য এটা এমন একটা শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা যা থেকে তাকে মুক্তি পেতেই হবে।

তিন চারশ বছর আগে যখন এ ব্যবস্থাটার বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটেছিল তখন বিশ্বের বৃহত্তম অংশে ইসলামী চিন্তা ও ব্যবস্থার প্রাধান্য ছিল। কিন্তু মুসলমানরা ততদিনে অনেকটা নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। ইসলামের মূলনীতি ও অনুশাসনের প্রতি তাদের আস্থা ও নিষ্ঠা অনেক কমে গিয়েছিল। ইজতিহাদী প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ মূলনীতিগুলোকে যুগসমস্যার সমাধানে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে তারা ব্যর্থ হচ্ছিল। ফলে বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে তারা হীনপ্রভ হয়ে পড়ছিল। এই সময় যুগ সমস্যার সমাধানে ইউরোপীয় ও পাশ্চাত্য চিন্তা প্রবলভাবে এগিয়ে আসে। কিন্তু আজ তারা খেই হারিয়ে ফেলেছে। তাদের তৈরী করা বিশ্ব ব্যবস্থার জুলুম নির্যাতনের কোনো প্রতিকার আজ আর তাদের কাছে নেই। চরম হতাশা আজ তাদের সম্বল। এ অবস্থায় বিশ্ব মুসলিম সমাজের একটা অংশ ইসলামের ওপর দৃঢ় আস্থা নিয়ে এগিয়ে আসছে। ইসলামী ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থা মেনে নিতে তারা প্রস্তুত হচ্ছে না। এজন্য তারা জীবন উৎসর্গ এবং শাহাদত বরণ করে চলছে। তারা ইসলামের মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যাবার প্রেরণা যোগাচ্ছে। এ সংগে কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতির ভিত্তিতে চলতি জীবন সমস্যার সমাধান খুঁজে ফিরছে। সমাধান একমাত্র মুসলমানদের কাছেই আছে, অন্য কারো কাছে নেই। মুসলমানদেরকেই এর সমাধান করতে হবে। বিশ্বমানবতাকে সংকটমুক্ত করার জন্য মুসলমানদের যথার্থ ও সার্থক ভূমিকা পালন করতে হবে।

মুসলিম সামাজিক জীবনে বিবর্তন ও ইসলামী বিপ্লব

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত লাভের পর তের বছর মক্কায় অবস্থান করেন। কিন্তু সেখানে মুসলমানদের কোনো সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। আল্লাহ তাঁকে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিধানও সেখানে দেননি। অথচ সেখানে মুসলমানদের বেশ কিছু ঘরানা সমবেত হয়ে গিয়েছিল যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এ বিপুল সংখ্যক নারী-পুরুষকে কাফেরদের অত্যাচার ও মারমুখি আগ্রাসন থেকে বাঁচার জন্য দু দফায় আবিসিনিয়ায় হিজরত করার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। তারপর শেষবারে বিপুল সংখ্যক মুসলমান মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। এসব হিসাব করলে নারী-পুরুষ মিলে মক্কায় মুসলমানদের সংখ্যা যে এই তের বছরে এক-দুই শতের বেশী হয়ে গিয়েছিল তা নিসন্দেহে বলা যায়। অর্থাৎ কমপক্ষে একশতের বেশী ঘরানা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এরপরও এদেরকে নিয়ে একটি সমাজ গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হয়নি।

কিন্তু ইসলামী সমাজ গঠনের সমস্ত কাঠামোই এখানে তৈরি হয়ে গিয়েছিল। মক্কী সূরাগুলোর প্রতি লক্ষ করলে তা সহজে উপলব্ধি করা যায়। মক্কী সূরাগুলোর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আল্লাহ, রসূল ও আখেরাতের প্রতি ঈমান। সমস্ত বিষয়ের হুকুমদাতা আল্লাহ। সেগুলোর ব্যাখ্যাতা ও প্রয়োগকর্তা আল্লাহর নবী। তাছাড়া সেগুলো মেনে চলা ও না মেনে চলার ব্যাপারটা এমন নয় যে, দুনিয়া পর্যন্তই তার কার্যকারিতা শেষ এবং এরপর আর তার কোনো হিসাব-নিকাশ নেই। বরং এ দুনিয়া একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর সবাইকে সমবেত করা হবে হাশরের ময়দানে। সেখানে বিচারক হবেন একমাত্র আল্লাহ। তিনি প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ ও সাক্ষী-সাবুদ উপস্থিত করে প্রত্যেকের কাজের চুলচেরা হিসাব করবেন। কে আল্লাহর হুকুম কতটুকুন মেনেছে এবং আল্লাহর নবীর ব্যাখ্যা ও তাঁর প্রয়োগ পদ্ধতি অনুযায়ী মেনেছে। আর কে তা মানেনি এবং কেন মানেনি এর পুরোপুরি ন্যায়নিষ্ঠ ও ইনসাফপূর্ণ বিচার হবে। এজন্য সেখানে ন্যায়ের তুলাদণ্ড যাকে কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে 'মীযান' কায়েম করা হবে।

এ বিচারের ভিত্তিতেই জান্নাত ও জাহান্নামের অনন্তকালীন জীবন শুরু হয়ে যাবে। একে এক কথায় বলা হয়েছে আখেরাত। মক্কী সূরাগুলোর মধ্যে অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে এগুলো বিশেষ করে আখেরাতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে অন্যান্য

ধর্মগুলোর মধ্যেও এই আখেরাতের একটা ধারণা দেয়া হয়েছে। পরকাল, স্বর্গ, নরক, হেভেন, প্যারাডাইস ইত্যাদি বহু শব্দ পাওয়া যায়। সুসভ্য মানব গোষ্ঠী ছাড়াও যাদেরকে অসভ্য, প্যাগান, মানব বসতি থেকে দূরে পাহাড়ে বনে-জংগলে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপনকারী হিসেবে দেখা যায়, তাদের মধ্যেও পরকালের একটা আবছা ধারণা পাওয়া যায়।

এ ধারণাগুলো তো আল্লাহর নবীরাই দিয়েছেন। যেভাবে ধর্মকে বিকৃত করা হয়েছে, ধর্মগ্রন্থগুলোকে বিকৃত করা হয়েছে এবং নবী ও ধর্মপ্রচারকদেরই জীবন ধারা ও কর্মকাণ্ডকে বিকৃত করা হয়েছে, ঠিক তেমনি এ আখেরাতের ধারণাকেও বিকৃত করা হয়েছে। নবীগণ যখন আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন তখন তারা আখেরাতের জীবনের বিষয়টিও পূর্ণাংগরূপে বর্ণনা করেছেন। কোনো অস্পষ্ট বর্ণনার ভিত্তিতে ঈমান গড়ে উঠতে পারে না। ঈমান মানেই প্রত্যয়, পূর্ণ বিশ্বাস, যার মধ্যে সামান্যতমও সংশয় ও অস্পষ্টতা নেই। প্রত্যেক নবীর প্রথম যুগের উম্মতগণ আখেরাতে জবাবদিহি এবং ভালো ও মন্দ কাজের ফলাফলের ভিত্তিতে জীবন গড়ে তুলেছিলেন। তারপর তাদের এ সম্পর্কিত ধারণা ও বিশ্বাস অস্পষ্ট ও দুর্বল হয়ে যেতে থাকে। এতদিন পর্যন্ত তাদের এ বিশ্বাস অস্পষ্টভাবে হলেও টিকে থাকাই একথা প্রমাণ করে যে, এ বিশ্বাস পূর্ণ সত্যের ভিত্তিতে এক সময় প্রতিষ্ঠিত ছিল।

বর্তমানে একমাত্র ইসলামী বিধান তথা কুরআন ও হাদীসের মধ্যে এ আখেরাতের সুস্পষ্ট ধারণা ও পূর্ণাংগ রূপরেখা পাওয়া যায়। আল্লাহ ও রসূলে বিশ্বাসের সাথে আখেরাতে বিশ্বাসও অংগাংগীরূপে জড়িত হয়ে গেছে। অন্যান্য ধর্মে গড, প্রফেট, ভগবান ও অবতারের ধারণার সাথে পরকালের ধারণা ঠিক তেমনি গুরুত্ব পায়নি। ফলে এ তিনটি বিশ্বাস একীভূত হয়ে যেমন একটি ব্যক্তি মুমিন চরিত্র গড়ে তুলেছে, অন্যান্য ধর্মে ঠিক তেমনটি নয়। ফলে মুসলিম ব্যক্তিদের সমন্বয়ে যে ইসলামী সমাজ গঠিত হয় সে সমাজে এ তিনটি একীভূত বিশ্বাস একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার তের বছরের জীবনে এ তিনটি একীভূত বিশ্বাসের ভিত্তিতে মুসলমানদের সমগ্র কর্মজীবন গড়ে তুলেছিলেন।

এ কর্মজীবনের প্রথম অধ্যায়টি ছিল নামাযের। ইসলাম গ্রহণ করার ও মুসলমান হওয়ার সাথে সাথেই নামায ফরয হয়ে যায়। এমনকি যদি আসরের শেষ সময়ে কেউ ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর আসরের ওয়াক্ত খতম হয়ে যায় তাহলে আসরের নামায তার ওপর পাওনা হয়ে যায়

এবং তাকে আসরের নামায কাযা পড়তে হবে। অর্থাৎ নামায দিয়েই কর্মজীবন শুরু। সমস্ত নবীর উম্মতের জন্য নামায ফরয ছিল। এমনকি তাদের দিবা রাতের ঘুমাবার সময়টুকু বাদ দিলে বাকি সময়ের বেশীর ভাগ নামাযে ব্যয় হতো। অন্তত মিরাজ সম্পর্কিত হাদীসে মূসা আলাইহিস সালামের বক্তব্য থেকে তাই আন্দাজ করা যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আল্লাহর কাছ থেকে তাঁর উম্মতের জন্য পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরয নামাযের তোহফা নিয়ে চলে আসছিলেন, ষষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাঁকে রুখে দিলেন। তিনি বললেন, যাও, আল্লাহর কাছে গিয়ে এ ওয়াক্ত কমিয়ে আনো। এতো ওয়াক্ত নামায তোমার উম্মত পড়তে পারবে না। এ ব্যাপারে আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। আল্লাহর কসম বনি ইসরাঈলদেরকে আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। অর্থাৎ তারা পারেনি। এ হাদীসটি ইমাম বুখারী কিতাবুল মানাকিবে মিরাজ অনুচ্ছেদে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

এখন একবার চিন্তা করা যাক, যদি পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয হতো তাহলে কি অবস্থা হতো। দিনরাতে ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমপক্ষে ৬ ঘন্টা ঘুমের জন্য বাদ দিতে হবে। তাহলে থাকে ১৮ ঘন্টা। তার থেকে গোসল, খাওয়া-দাওয়া ও পেশাব-পায়খানার জন্য আরো অন্তত ২ ঘন্টা বাদ দিলে থাকে ১৬ ঘন্টা। এ ১৬ ঘন্টায় ৫০ ওয়াক্ত নামায পড়তে গেলে গড়ে প্রত্যেক ১৯ মিনিটে এক ওয়াক্ত নামায পড়তে হতো। প্রত্যেক ওয়াক্তে যদি দু রাকাত করে নামাযও ফরয হতো তাহলে এক ওয়াক্ত নামায পড়তে খুব কম করে হলেও ৫ মিনিট সময় লাগতো। তার সংগে আছে অযু করা এবং অন্য কোনো আনুষংগিক বিষয়। এজন্যও যদি আরো ৫ মিনিট ধরা হয়, তাহলে প্রত্যেক নামাযে ১০ মিনিট সময় চলে যেতো। ফলে এক নামায থেকে আর এক নামাযের মাঝখানে মাত্র ৯ মিনিট করে সময় থাকতো। অবশ্যই আজকের কর্মব্যস্ত জীবনের সাথে এটা মোটেই খাপ খায় না। কিন্তু ৫০ ওয়াক্ত নামাযের কথা সামনে রেখে ইসলামিক মানবিক জীবনে নামাযের গুরুত্ব আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। এ পাঁচ ওয়াক্ত আসলে পঞ্চাশ ওয়াক্তের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রত্যেক দু ওয়াক্তের মাঝখানে যে সময়গুলো রয়েছে সেগুলো প্রায় নামাযেরই অন্তরভুক্ত হয়ে গেছে। এজন্য মুসলিমের জীবনের সমস্ত কাজই ইবাদতের মর্যাদাযুক্ত হতে হবে। কুরআনের 'ওয়া মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়া বুদুন'–(মানুষ ও জিনকে আমি ইবাদত করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি) একথার তাৎপর্য এখানেই উপলব্ধি করা যায়।

হিজরতের তিন বছর পূর্বে নামায ফরয হয়। তার আগে নামায ফরয না থাকলেও সাহাবাগণ নামায পড়তেন যখন তখন। এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিল না। তবে ইসলাম গ্রহণ করার পর নামাযই হতো একজন মুসলমানের আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও মুসলমানত্বের প্রমাণ। নামাযের সাথে সাথে মক্কী জীবনে মুসলমানরা রোযাও রাখতেন। এ রোযা হতো একমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদিত।

মক্কা থেকে হিজরত করার পরই ইসলামী সমাজ গড়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। মদীনায় প্রবেশ করার পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েক দিন শহরের উপকণ্ঠে কুবায় অবস্থান করেন। কুবায় প্রবেশ করেই তিনি একটি মসজিদ গড়ায় মনোনিবেশ করেন। কুবা থেকে বের হয়ে কয়েকদিন পরে তিনি পৌঁছলেন মদীনায়। সেখানে তিনি গড়ে তুললেন সমজিদে নববী। এটি ছিল ভূপৃষ্ঠে মুসলমানদের দ্বিতীয় মসজিদ। এ মসজিদটি গড়ায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এবং সাহাবাগণ সবাই শ্রমদান করলেন। মসজিদ গড়ে তোলার মাধ্যমেই তাঁদের মধ্যে সামাজিক চেতনা জেগে উঠল। মসজিদে শুধু তারা ইবাদতের জন্য মিলিত হতেন না। বরং তাদের সামাজিক সমস্ত কাজের কেন্দ্রবিন্দুই ছিল মসজিদ। দিনে পাঁচবার নামাযের জন্য মিলিত হতেন। তখন কুশল বিনিময় ছাড়াও অন্যান্য সমস্যার আলোচনা হতো। তাছাড়া যে কোনো জাতীয় সমস্যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবা কেরামকে মসজিদে সমবেত করে সংকট সমাধানে উদ্যোগী হতেন। এভাবে একটা মসজিদকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। অর্থাৎ মসজিদ যেমন ছিল কেন্দ্রীয় ইবাদতখানা তেমনি ছিল সমগ্র সামাজিক কর্মকাণ্ডের হেড অফিস। ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রণ একদিকে তিনটি একীভূত মৌলিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এবং অন্যদিকে সমাজ জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু করা হয় মসজিদকে। এ সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিতে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সফল রূপায়ণ হয়। মদীনায় এসে মুসলমানদের সামাজিক চেতনা ও সামাজিক কাঠামোকে একটি সফল ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করার পরই ইসলামী রাষ্ট্র গড়ার স্বপ্ন সফল হয়।

ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকার কারণে ইসলামী সমাজের সঠিক পরিচালনা ও বিকাশ সাধিত হয়। তাই ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের পূর্বশর্ত যেমন ইসলামী সমাজ গঠন তেমনি ইসলামী সমাজের সঠিক পরিচালনা, বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাও অপরিহার্য।

চৌদ্দশ বছর পরে আজকের মুসলিম বিশ্বে ইসলামী সমাজের অবক্ষয় ও পতনের মূলে রয়েছে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনুপস্থিতি। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা

এবং কুরআন ও সুন্নাহর শাসনই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ও জনগণের ইসলামী জীবন-যাপনের সবচেয়ে বড় রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক। খিলাফতের পতনের পর এর মধ্যে কমতি দেখা দিতে থাকে। রাজতান্ত্রিক শাসনামলগুলোতে কুরআন ও সুন্নাহর শাসন থেকে যতটা সরে আসা হয়েছে ইসলামী সমাজ কাঠামোয়ও ঠিক ততটা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ সময়ে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের পাশাপাশি মুসলমানদের আর একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্থা গড়ে ওঠে। এটা হচ্ছে "ফিকহ্"। রাষ্ট্রের সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়াই বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের প্রচণ্ড বিরোধিতার মোকাবিলা করে এ সংস্থাগুলো বিভিন্ন নগরীতে ও এলাকায় সাধারণ মুসলিম জনগণের সমর্থনে এগিয়ে চলে। ফকীহ্ ও মুজতাহিদগণ ছিলেন এ সংস্থাগুলোর পরিচালক ও সদস্য। রাষ্ট্রযন্ত্রের সমর্থনের তোয়াক্কা না করে জনগণের স্বার্থে ও প্রয়োজনে তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আইন প্রণয়ন করতেন। রাষ্ট্রযন্ত্রে যেহেতু জনমতের প্রভাব ছিল না এবং জনগণের স্বার্থের প্রতিফলন সেখানে অনেক ক্ষেত্রে বিঘ্নিত হতো তাই এ ফিকহ্ প্রতিষ্ঠান অতি দ্রুত প্রসার লাভ ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বরং দু-চারটি ব্যতিক্রম ছাড়া কোনো ফকীহ ও মুজতাহিদের সরকারী যন্ত্রের সাথে অসম্পৃক্ততাই জনগণের কাছে তাঁদের ইজতিহাদের গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হতো। এভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রের দুর্বলতা, বিভ্রান্তি ও দুষ্কৃতির পরও কেবলমাত্র এ ফিকহ্ প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্রিয়তা, দায়িত্ববোধ ও দৃঢ়তার কারণে মুসলিম সমাজ জীবন শত শত বছর এগিয়ে চলেছে। এ ফিকহ্ প্রতিষ্ঠানগুলো যতদিন যুগের চাহিদা অনুযায়ী মুসলমানদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর পথে পরিচালিত করতে পেরেছে ততদিন ইসলামী সমাজ তার বৈশিষ্ট নিয়ে টিকে থাকতে পেরেছে। নবুওয়াত ও খিলাফতের অবসানের অর্ধ সহস্র বছর পরে যখন রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে অন্যায়, দুর্নীতি, জুলুম ও ইসলামী মূলনীতি থেকে দূরে অবস্থান অনেক বেশী বেড়ে যায় এবং এই সংগে এ বেসরকারী ফিকহ প্রতিষ্ঠানগুলোও সংকুচিত, পংগু ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে থাকে তখন ইসলামী সমাজের পতন শুরু হয়।

বিগত সাত-আটশ বছর থেকে ইসলামী সমাজ পতনোন্মুখী। একদিকে বেসরকারী ফিকহ্ প্রতিষ্ঠানগুলোর পংগুত্ব দিনের পর দিন বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে রাজ পরিবারগুলো ও শাসকবর্গের গোমরাহী এবং ইসলাম বিরোধী বিজাতীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির অনুসরণ মুসলিম জনতাকে বিভ্রান্ত করতে থেকেছে। শাসকবর্গের প্রভাব প্রজাদের ওপর পড়াটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। বিশেষ করে এ প্রভাব গ্রহণের পথে যখন বাধা কম থাকে। তাছাড়া একদল সরকারী আলেমের সন্ধানও সবযুগে পাওয়া যায়। তাঁরা ইসলামের খিদমতের

তুলনায় বাদশাহ্ ও শাসকবর্গের খিদমতকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। শোনা যায় মোগল বাদশাহ্ আকবরের 'দীন-ই-ইলাহী' ধর্মীয় মতবাদ উদ্ভাবনের পেছনেও কিছু দরবারী আলেমের সহায়তা ও উস্কানি ছিল। একদিকে হকপরস্ত ও প্রাজ্ঞ আলেম ও ফকীহগণের স্থবিরতা ও নির্লিপ্ততা এবং অন্যদিকে স্বার্থবাদী ও দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী আলেমগণের সক্রিয়তা এবং সংগে রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তা ইসলামী সমাজের ক্ষতির পসরা দিনের পর দিন বাড়িয়ে তুলেছে।

মুসলমানরা ইসলামী জীবন যাপন করতে চেয়েছে কিন্তু তারা বিভ্রান্ত হয়েছে। বিগত কয়েকশ বছর ধরে এ অবস্থা অব্যাহত রয়েছে। আফ্রো-এশীয় সমগ্র মুসলিম ভূখণ্ডে এ অবস্থা সর্বত্র বিরাজমান। কুরআন ও হাদীস তাদের সামনে রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোনো বিকৃতি ঘটেনি। এগুলোর পঠন পাঠনের জন্য বহু মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। একদল আলেম এগুলোর চর্চাও করে যাচ্ছেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এগুলোর বিধানের কোনো মূল্য নেই। বিশেষ করে বিগত দেড়-দুশ বছর থেকে সমগ্র মুসলিম ভূ-খণ্ডের ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে, যেভাবে তারা ইউরোপীয় জাতিসমূহের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক গোলামে পরিণত হয়েছে, তার ফলে তাদের জাতীয় মূল্যমানেই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আজ তারা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সর্বত্র স্বাধীনতা ভোগ করলেও তাদের সমাজের শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বৃহত্তর অংশ ইসলামী মূল্যবোধের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। তাদের একটা অংশ তো একে পুরোপুরি পরিত্যাগ করেছে। শুধু পরিত্যাগই করেনি বরং সেখানে ইসলাম বিরোধী সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি মূল্যবোধ আমদানি করতে চাচ্ছে।

আনন্দের কথা, প্রায় সব মুসলিম দেশে ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী নতুন গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। এরা ইসলামী মূল্যবোধকে যুগোপযোগী মর্যাদা দিতে চায়। কুরআন ও হাদীসের মূলনীতির ভিত্তিতে মূল্যবোধের পুনরগঠন চায়। এরা যুগের আধুনিক চাহিদাকে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং সেখানে ইসলামী মূল্যবোধের প্রসার ঘটাতে চাচ্ছে। আমাদের বিগত সাত আটশ বছরের পংগুত্ব ও নির্লিপ্ততার দিকে তাকিয়ে এরা অনেক সময় হতাশ হয় এবং জটিলতায় আক্রান্ত হয়। কিন্তু আল্লাহর কিতাব, তাঁর রসূলের বিপুলসংখ্যক সহী নির্ভরযোগ্য হাদীসের সমষ্টি এবং তাঁর সাহাবা ও সাহাবা পরবর্তীকালের পাঁচ ছয়শ বছরের ফকীহ ও মুজতাহিদগণের অত্যন্ত উপযোগী ও প্রাণবন্ত ইলমী কর্মকাণ্ড তাদেরকে মোটেই হতাশ করবে না। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটা বলিষ্ঠ, সুস্পষ্ট ও সচল পদ্ধতি দিয়ে গেছেন যা মুসলমানদেরকে যে কোনো পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে

সঠিক পথের সন্ধান লাভে সাহায্য করবে। তিনি হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়ামনের শাসক নিযুক্ত করে পাঠাবার সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ হে মুআয ! সেখানে গিয়ে তুমি লোকদের সমস্যার সমাধান কিভাবে করবে ? মুআয জবাব দেন ঃ আমি আল্লাহর কিতাবের বিধান মতে মানুষের সমস্যার সমাধান করবো। জিজ্ঞেস করেন ঃ যদি আল্লাহর কিতাবে কোনো সমাধান না পাও ? জবাব দেন ঃ তাহলে আল্লাহর রসূলের সুন্নাত অনুযায়ী সমাধান করবো। জিজ্ঞেস করেন ঃ যদি আল্লাহর রসূলের সুন্নাতে কোনো সমাধান না পাও ? জবাব দেন ঃ তাহলে আমি আমার জ্ঞানমতে ইজতিহাদ করবো। একথা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তাঁর রসূলের প্রতিনিধিকে উপযোগী করেছেন। (তিরমিযি ঃ কিতাবুল আহকাম) অর্থাৎ হযরত মুআয (রা) রসূলের (স) উপযোগী প্রতিনিধি এবং তিনি পরিবেশ পরিস্থিতির উপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অন্য কথায় বলা যায়, তিনি রসূলের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করেছেন। প্রথমত কুরআন ও সুন্নাহর বিধান অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ। দ্বিতীয়ত ঃ কুরআন ও সুন্নাহর বিধানের অবর্তমানে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা প্রজ্ঞার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

ইমাম তিরমিযী কিতাবুল আহকামে আর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ 'শাসক তার শাসন কার্য পরিচালনা করতে গিয়ে যখন ইজতিহাদ করে এবং তার ইজতিহাদ সঠিক প্রমাণিত হয় তখন সে দুটি সওয়াব পায়। আর যখন তার শাসন পরিচালনায় ভুল হয় (অর্থাৎ ভুল ইজতিহাদ করে) তখন একটি সওয়াব পায়।' এ হাদীসে আন্তরিকতার সাথে ইজতিহাদকারীর ইজতিহাদকে তা ভুল হলেও স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

এ থেকে একথা প্রমাণ হয় যে, কুরআন ও সুন্নাহর বিধান অনুযায়ী ইসলামী সমাজের পুনরগঠন আদৌ কোনো একটা অসম্ভব ও অবাস্তব বিষয় নয়। বরং আমাদের জাতীয় জীবনের চাহিদা অনুযায়ী এটি একটি প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য বিষয়।

বাংলাদেশে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করতে গেলে প্রথমে এখানে মুসলিম সামাজিক কাঠামোর প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। এ সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ কতটুকুন প্রতিষ্ঠিত আছে ? যতটুকু প্রতিষ্ঠিত ছিল তার মূলেও প্রতিদিন কুঠারাঘাত করা হচ্ছে। অর্থাৎ প্রতিদিন এর পরিসর সংকুচিত হয়েই চলেছে। যদি এমনটি হতো যে, একদিক দিয়ে হ্রাস পাচ্ছে এবং অন্যদিক দিয়ে বৃদ্ধি হচ্ছে, তাহলেও একটা সান্ত্বনার ব্যাপার ছিল। কিন্তু দুঃখের

বিষয় তেমনটি দেখা যাচ্ছে না। শিক্ষাব্যবস্থা, রাজনৈতিক কার্যক্রম, অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম ও উন্নয়নধারা, সাংস্কৃতিক কর্মতৎপরতা ইত্যাদি সরকারী ও বেসরকারী সবরকম তৎপরতাই ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি মোটেই সহানুভূতিশীল নয় বরং যে যেদিক থেকে পারছে এর ওপর আঘাত হেনে যাচ্ছে।

বিশেষ করে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার কল্যাণে জাতীয় উন্নয়নের নামে যে কোনো হারামকে হালাল করা হচ্ছে। ইসলামে সুস্পষ্ট হারাম বলে ঘোষিত এবং প্রত্যেকটা মুসলমান যে সূদকে ঘৃণা করে সেই সূদ, মদ, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি প্রকাশ্যে অবাধে চলছে। সূদের ওপর জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে এবং মুসলমানরা নিশ্চিন্ত। যেন তাদেরকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে না। তারা একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের মালিক। তাদের নিজেদের ব্যাপারের ফায়সালা তারা নিজেরাই করে। অন্যদের সেখানে কোনো হাত নেই। সে ক্ষেত্রে তারা জেনে শুনে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে সূদী ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এর প্রতি তাদের অটল বিশ্বাস।

এর মানে কি ? এর মানে মুসলমানরা আল্লাহর ব্যবস্থা জানে না। জানতেও চায় না। তার প্রতি তাদের আস্থা নেই। জাতীয় ক্ষেত্রে যেসব হারামকে হালাল করা হয়েছে সেগুলোর প্রত্যেকটির ব্যাপারেই এ একই কথা। এখন আবার জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলোতে কুরআনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বক্তব্য রাখা হয়। বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার নামে কুরআনের বিধানকে অকার্যকর ও জুলুম বলা হয়। দেশের কোটি কোটি মুসলমানকে এগুলো শোনানো হয়। এসব প্রমাণ করে বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়ে জাতির ঈমান মৃত। 'মান রাআ মুনকারান' সম্পর্কিত হাদীসে অন্যায়ের প্রতিরোধের মাধ্যমে একজন মুসলমানের ঈমানের যে তিনটি পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে তার কোন পর্যায়ে আমরা আছি ? অন্যায়কে আমরা প্রকাশ্যে বাধা দিচ্ছি না এবং তার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করছি না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা কথা বা লেখার মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাচ্ছি না। এমনকি মনে মনেও তাকে খারাপ মনে করার মতো লোকের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে না, কমছে। ধীরে ধীরে সমগ্র জাতির বিবেক মারা যাবে। জাতীয় পর্যায়ে এ অবস্থারই হয়েছি আমরা এখন শিকার।

এ অবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বপ্নকে সফল করতে হলে দেশের একদিকে শিক্ষিত শ্রেণী এবং অন্যদিকে সাধারণ গণ মানুষের ঈমানী চেতনা ও ইসলামী মূল্যবোধকে জাগ্রত ও পরিপুষ্ট করে তুলতে হবে। সাধারণ মানুষের ঈমানী চেতনা এমনই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, তারা সহজেই যে কোনো বিভ্রান্তির শিকার হয়। তাই তাদের ইসলামী জ্ঞান ও ঈমানী চেতনাকে সবল ও

পরিপুষ্ট করতে হবে। অন্যদিকে শিক্ষিত শ্রেণীই হচ্ছে দেশের ও সমাজ ব্যবস্থার আসল নিয়ামক। তাদের বিভ্রান্তি দূর করার জন্যে যুগোপযোগী ইসলামের বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে। এবং তাদের সামনে ইসলামের ইতিবাচক ও গঠনমূলক শক্তিকে বিশেষভাবে সুস্পষ্ট করতে হবে। তারা পাশ্চাত্যবাদের যে মরীচীকার পেছনে ছুটছে তাতে তারা শিগগিরই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। পুঁজিবাদ থেকে মার্কসবাদ। আবার সেখান থেকে শুধু সেক্যুলারবাদ। তারা আসলে এখন হতাশাবাদের শিকার। এর মধ্যেই তাদের ঘোরাফেরা। তাদের এ হতাশাই তাদেরকে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনবে। তবে এজন্য ইসলামী দাওয়াতের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে হবে।

দেশের সাধারণ মানুষ অশিক্ষার কারণে আধুনিক চিন্তার সংস্পর্শে আসেনি। তাই তাদের ঈমান এখনো খতম হয়ে যায়নি। এখনো আল্লাহ, রসূল, আখেরাত, কিয়ামত ও শেষ বিচারের দিনে তারা বিশ্বাস করে। তাদের এ বিশ্বাসকে সবল ও সক্রিয় করে তুলতে হবে। চতুরদিকের পরিবেশ এবং আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা, রাষ্ট্রীয় যন্ত্র ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে তাদের ঈমানে ফাটল ধরাবার ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার প্রয়াস চলছে ব্যাপক ও বলিষ্ঠভাবে। তাই তাদের ঈমানকে বলিষ্ঠ করার প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব দিতে হবে। যেহেতু তারা পড়তে জানে না, আর শিক্ষিতের হার আগামী দশ বছরে শতকরা একশতের পর্যায়ে নিয়ে গেলেও সাধারণ গণমানুষের শিক্ষা সাধারণভাবে পড়তে ও লিখতে জানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। উচ্চ শিক্ষা বা তত্ত্বমূলক বই পড়ে তা থেকে জ্ঞান লাভ করার ক্ষমতা তারা অর্জন করবে না। প্রাইমারী শিক্ষার মধ্যেই তাদের শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকবে। দুনিয়ার উন্নত দেশগুলোতে যেখানে শিক্ষিতের হার নিরানব্বই একশ সেখানেও একই অবস্থা, লিখতে পারে পড়তে পারে কিন্তু ওই পর্যন্তই। তাদের জ্ঞানের সীমানা বাড়েনি বা শিক্ষালাভ করার পর বুদ্ধিবৃত্তি প্রখর হয়ে যায়নি। কারণ সাধারণ মানুষ এ পর্যায়ের ধীশক্তি সম্পন্ন নয়। শুধু মূর্খ থাকার কারণে যে অসুবিধাটা সে অসুবিধা থেকে তারা বেঁচে গেছে। অশিক্ষার কারণে যখন তখন যেখানে সেখানে তারা প্রতারিত হয় না।

আসলে আমরা বলতে চাচ্ছি, সাধারণ মানুষকে অবহেলা করলে চলবে না। তাদের ঈমান যে পর্যায়ের আছে, যা যে কোনো সময় সহজ বিভ্রান্তির শিকার হয় এবং আধুনিকতার মোড়কে সাজানো ঈমান বিরোধী বিভিন্ন কার্যকলাপ যাকে অতি সহজে আহত ও পর্যুদস্ত করে, তাকে তার তুলনায় আরো বলিষ্ঠ ও সংহত করতে হবে। এজন্য কানে শোনা ও চোখে দেখার মাধ্যমকে প্রাধান্য দিতে হবে। অডিও-ভিডিও ক্যাসেট, চলচ্চিত্র ও মঞ্চ নাটককে বেশী

করে ব্যবহার করতে হবে। ইসলামের মর্মবাণী এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে হৃদয়গ্রাহী করে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া ওয়াজ-নসিহতও একটি মাধ্যম। কিন্তু পূর্বোক্ত মাধ্যমগুলোর তুলনায় এর আকর্ষণ ও জনপ্রিয়তা বর্তমানে বহুগুণে কমে গেছে। তাছাড়া ওয়াজের প্রতি আকৃষ্ট হয় একদল ধর্মীয় চেতনাসম্পন্ন লোক। এদের সংখ্যা গণমানুষের শতকরা পাঁচ দশ ভাগের বেশী হবে না। বাকি নব্বই পঁচানব্বই ভাগ মানুষের কাছে পূর্বোক্ত মাধ্যমগুলোর সাহায্যেই ইসলামের বাণী পৌঁছাতে হবে। এভাবে সাধারণ মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

দেশের শিক্ষিত সমাজের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। তারাই দেশের ও জাতির পরিচালক ও নেতা। ইংরেজ আমলের শিক্ষা ব্যবস্থাই এখনো এদেশে প্রচলিত এবং এরি মাধ্যমেই এরা শিক্ষা লাভ করেছে। এ শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্যই ছিল মুসলমানদেরকে ইসলাম ও ঈমান থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া। ইংরেজ চলে যাওয়ার অর্ধ শতক পরেও আজ শিক্ষাব্যবস্থার এ লক্ষ অপরিবর্তিত রয়েছে। ইসলামী সমাজ গঠন ও ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে এ গোষ্ঠীই সবচেয়ে বড় বাধা। আবার এদের সহায়তায়ই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাই এদের জন্য উন্নত মানের যুগোপযোগী ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন।

এদের সকল প্রকার বিভ্রান্তির জবাব এ সাহিত্যে থাকতে হবে। পাশ্চাত্যের যেসব মতবাদের প্রতি এরা বেশী করে আকৃষ্ট ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলোর সমালোচনা করে তাদের স্বরূপ উদঘাটন করতে হবে। ইসলামের প্রতি এদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।

বিগত আড়াইশ বছর থেকে আমাদের সমাজে যে পরিবর্তনটা এসেছে তা এর ইসলামী চেহারাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে। ইতিপূর্বে যে কোনো ক্রান্তিকালে আমাদের সমাজ কখনো এ অবস্থানে থাকেনি। মুসলিম সমাজের সবচেয়ে খারাপ অবস্থাটা এসেছিল তাতারি আক্রমণের সময়ে ও তার পরবর্তীকালে হিজরী সপ্তম অষ্টম শতকে। কিন্তু তখন মুসলমানরা সামলে নিতে পেরেছিল। কারণ তখনো মুসলিম সমাজে প্রতিভাবান ইলমী নেতৃত্বের অভাব ছিল না। আর আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নাতের সাথে মুসলমানদের তখনো সরাসরি সম্পর্ক ছিল। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, দুর্বার তাতারি শক্তি মাত্র চল্লিশ বছরের মধ্যে ইসলামের কাছে বিনত হয়ে ইসলামের খাদেমে পরিণত হয়েছিল।

এর তুলনায় পাশ্চাত্য শক্তিগুলো দেড়-দুশ বছর মুসলমানদেরকে পদানত করে রেখেছিল। চলে যাবার সময় মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে যায় তাদের মানসিক গোলামী। তারা বিজয়ীর বেশে পশ্চাদপসরণ করে। চলে যাবার পরও মুসলমানদের ওস্তাদ, মুরুব্বী ও পথপ্রদর্শক হিসাবে কলকাঠি নেড়ে যাচ্ছে। মুসলমানদের ঈমানে বিরাট ফাটল সৃষ্টি করে দিয়ে তারা চলে গেছে।

কাজেই এখানে ইসলামী সমাজের বুনিয়াদই বিধ্বস্ত, যে বুনিয়াদকে আল্লাহর নবী তের বছর ধরে গড়ে তুলেছিলেন। প্রথমে এ বুনিয়াদকে মজবুত করে গড়ে তুলতে হবে। তবে তারি ভিত্তিতে এদেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। আর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া এ বুনিয়াদের যথাযথ পরিচর্যা সম্ভবপর নয়। কাজেই এদেশে ইসলামী সমাজ ও মুসলিম অস্তিত্বের প্রয়োজনে ইসলামী রাষ্ট্র অপরিহার্য।

বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা পরিবর্তনে ইসলামী আন্দোলন

ইসলামী ব্যবস্থা ছিল বিশ্বব্যাপী

একটি দাওয়াতের শ্রেষ্ঠত্ব এরি মধ্যে নিহিত যে তাকে যেমন অনেক কথায় অনেকভাবে ব্যক্ত করা যায় তেমনি এক কথায়ও বলা যায়। একটি ছোট্ট বাক্যের মধ্যে ইসলামের সমস্ত দাওয়াত ও বাণী তুলে ধরা যায়। যেমন–

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ।"

ইলাহ একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা, উদ্ভাবন, উৎপাদন করেন। সবকিছু তাঁর সৃষ্টি। আর বিশ্বটাই তো হলো একটা সৃষ্টি। এখানে যা কিছু আমরা করছি, জানছি, বুঝছি সবকিছুই সৃষ্টি এবং আল্লাহর সৃষ্টি। আমাদের কোনো ক্ষমতা নেই। যাকিছু ক্ষমতা সব আল্লাহর দেয়া। সমস্ত মেধা, সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত শ্রমশক্তি আল্লাহর দেয়া। তিনিই সব দিয়েছেন, তিনিই সব নিয়ন্ত্রণ করেন। কাজেই একমাত্র তাঁর হুকুম মেনে নিয়ে সেই মতো কাজ করে যেতে হবে এবং ইবাদত বন্দেগীও তাঁরই করতে হবে।

আর তাঁর হুকুম জানা, তাঁর হুকুম মানা এবং তাঁর ইবাদত করার কাজগুলো করতে হবে এমন এক ব্যক্তির মাধ্যমে যাঁকে তিনি আমাদের মধ্য থেকে বাছাই করে নিয়েছেন। তাঁকে তিনি তাঁর রসূল হিসাবে গ্রহণ করে পুরোপুরিভাবে তৈরি করে নিয়েছেন। যেভাবে তিনি এগুলো চান সেভাবে তাঁকে জানিয়ে ও শিখিয়ে দিয়েছেন। এবং তাঁর সেই রসূল হচ্ছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। একজন রসূল তিনি কেন পাঠালেন? তিনিতো সরাসরি সবার কাছে তাঁর বাণী ও হুকুম পাঠাতে পারতেন। আসলে এভাবে সবার কাছে পাঠালে, তখন নানা মুনির নানা মত হতো। মৌলিকভাবে আল্লাহর বিধান বিভক্তির শিকার হতো। একজনের কাছে পাঠানোর কারণে তিনি নিজে এর প্রাকটিস করেছেন। মূলগতভাবে এটি রয়ে গেছে একটি ধারা হিসেবে পরবর্তীকালে বিভিন্ন যুগে কেবলমাত্র এর ব্যাখ্যা হয়েছে। মৌলিক পরিবর্তন করার কোনো সুযোগ নেই। ফিকহের যা কিছু পরিবর্তন সবই 'জুযই'-অর্থাৎ মূলে নয়, শাখা-প্রশাখা, পত্র-পল্লবে। একটা গাছ যেমন বড় হচ্ছে, ডাল-পালা শুকিয়ে যাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে, আবার নতুন ডালপালা গজাচ্ছে। পাতা ঝরে যাচ্ছে, আবার নতুন পাতা বের হচ্ছে। কিন্তু গাছটি ঠিকই আছে। তার পরিবর্তন হচ্ছে না। আম গাছ আম গাছই আছে। জাম গাছে রূপান্তরিত হচ্ছে না।

ইসলামের নবুওয়াত ব্যবস্থাও ঠিক তেমনি। হাজার দেড় হাজার বছর পর আজো তার মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন নেই। অথচ এক হাজার বছর মুসলমানরা বিশ্ব শাসন করে এসেছে। ফিকহের নতুন নতুন ধারা গড়ে উঠেছে। ইসলামী আইনের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মাযহাব, দল, উপদলের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ইসলামের মধ্যে কোনো মৌলিক পরিবর্তন আসেনি। ইসলামী বিধানের মৌলিকত্ব এখনো অব্যাহত ও অক্ষুণ্ন আছে। অর্থাৎ এ বিধানের মধ্যে এখনো বিশ্ব পরিচালনার উপযোগিতা, যোগ্যতা ও ক্ষমতা আছে।

হিজরী প্রথম শতকের মধ্যে ইসলামের বাণী যখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল, সমকালীন বিশ্বের মূল ভূখণ্ড এশিয়া-আফ্রিকা-ইউরোপে যখন ইসলাম প্রবেশ করেছিল তখন তার দাওয়াতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। আল্লাহ ছিলেন বিশ্ব মানবতার একমাত্র ইলাহ, তিনি ছাড়া মানুষের আর কোনো ইলাহ ছিল না এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন তাঁর রসূল। মুসলমানদের রাজত্বে আল্লাহ ছিলেন ইলাহ এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন তাঁর রসূল। এ বিশ্বে কোনো শিরকের স্থান ছিল না। মুসলমানরা বিশ্বে আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করেছিল।

এ অবস্থা পুরোপুরি অব্যাহত ছিল প্রায় তিনশত বছর পর্যন্ত। হিজরী একশত বছর পরে রসূলের আর কোনো সাহাবী জীবিত ছিলেন না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকের মধ্যে তাবেয়ী, তাবা-তাবেয়ী এবং তাবা-তাবয়ে-তাবেয়ীদের জামানাও শেষ হয়ে গিয়েছিল। খাইরুল কুরুনের স্বর্ণযুগ শেষ হয়ে যাচ্ছিল। তবুও ইসলামী বিধানের মৌলিকত্ব অব্যাহত ছিল। ব্যাখ্যা ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল। ফলে পরবর্তী তিনশ বছর শেষ হতে হতেই মুসলমানরা বিরাট আঘাত খেলো তাতারীদের হাতে। ইসলামের প্রাণশক্তি পুরোপুরি অব্যাহত ছিল বলেই এ যাত্রায় মুসলমানরা সামলে নিয়েছিল এবং তাতারীরা শিরকের আশ্রয় ছেড়ে ইসলামের তওহীদের কোলে আশ্রয় নিয়েছিল।

কিন্তু অন্যদিকে মুসলমানদের পতনের আরেকটা ধারা এগিয়ে চলছিল। একে আর কোনোক্রমেই রোধ করা যায়নি। এ ঘটনা ঘটে স্পেনে। ঈসায়ী পনের শতক শেষ হতে হতেই ইসলাম ও মুসলমানদেরকে সেখান থেকে শেকড় কেটে উচ্ছেদ করা হয়। ভারতে মুসলমানদের রাজত্ব উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে শেষ হয়েছে। তুরস্কের নাম সর্বস্ব উসমানী খিলাফত তো শেষ হলো বিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর।

এভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মুসলমানরা এক হাজার বছর দাপটের সাথে বিশ্ব শাসন করেছে এবং তারপরও তিন'শ বছর তাদের প্রভাব অব্যাহত ছিল।

ইসলাম বিশ্বকে কি দিয়েছে ?

০ প্রথমত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানবতাকে দিয়েছে তওহীদ। সুস্পষ্ট শিরক ছিল বিশ্বের মুশরিক জাতিদের ধর্ম বিশ্বাস, জীবনধারা ও সংস্কৃতি-সভ্যতার মূল নিয়ামক। অন্যদিকে আহলি কিতাব জাতিদের বিশ্বাসে ও জীবন ধারায়ও শিরক মিশে গিয়েছিল। খালেস তওহীদ ইসলামের স্রোতধারা থেকে উৎসারিত হচ্ছিল। ইসলাম বিশ্ব মানবতাকে আর একবার সত্যের মুখোমুখি করে দিয়েছিল।

০ দ্বিতীয়ত দিয়েছে আইনের শাসন। দুই-আড়াই হাজার বছর আগে ইউরোপ ভূখণ্ডের গ্রীস ও রোম এলাকায় আইনের উদ্ভব হলেও নগর ভিত্তিক গুটিকয় লোকের মধ্যেই ছিল তার প্রচলন। কিন্তু আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে বিশ্বমানবতা সর্বপ্রথম আইনের শাসনের সুফল লাভ করে। মুসলমানদের মূল কিতাব আল কুরআনুল করীম ছিল এ আইনের প্রধান উৎস। পৃথিবীতে এর আগে লিখিত আইনের এমন একটি কিতাব কোথাও কোনো দেশে ছিল না। এর মাধ্যমে মুসলমানরা নিজেদের সমাজে আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করে এবং বিশ্ব মানবতাকেও আইনের পথে জীবন যাপনে উৎসাহিত ও সহায়তা দান করে।

মুসলমানরা বিশ্বে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করে। দেশের সর্বোচ্চ ব্যক্তি বাদশাহও আইনের অধীন হন। সর্বত্র আদালত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ন্যায় বিচার করার জন্য কাযী নিযুক্ত হন। কাযীর সমন পেয়ে বাদশাহকেও কাযীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। বিশ্বকে আইন শৃংখলার শিক্ষা ইসলাম ও মুসলমানরাই দিয়েছে। কুরআন ও হাদীসের অনুশাসনের ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের জন্য মুসলমানদের মধ্যে ফিকহ ইনস্টিটিউট গড়ে উঠেছে। হাজার বছর ধরে ইজতিহাদের মাধ্যমে এ ফিকহ ইনস্টিটিউটগুলো বিভিন্ন যুগের ও দেশের জনগোষ্ঠীর উপযোগী আইন প্রণয়ন করে এসেছে। আজকের বৃটিশ বা রোমান ল' এর যতগুলো ডেভলপমেন্ট হয়েছে তার বেশীর ভাগই এ ইসলামী আইনের ট্রুকপি ছাড়া আর কিছুই নয়। আজকের গণতান্ত্রিক বিশ্বে পার্লামেন্টে আইন প্রণয়ন করা হয় আর সেদিন বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের এ পপুলার ফিকহ ইনস্টিটিউগুলো কোনো প্রকার রাজকীয় ও রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য ছাড়াই বরং শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে শুধুমাত্র জনগণের স্বার্থে আইন প্রণয়ন করে গেছে। সপ্তদশ শতকে মোগল বাদশাহ আওরংগযেব আলমগীরের আমলে অবশ্য রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ইসলামী আইন প্রণয়নের কাজ চলে। যা পরবর্তীকালে ফাতওয়া-ই-আলমগীরী নামে পরিচিতি লাভ করে।

০ ইসলাম বিশ্বকে তৃতীয় যে জিনিসটি দিয়েছে সেটি হচ্ছে একটি সাম্য ও মৈত্রী ভিত্তিক শান্তিময় সামাজিক জীবন। ইতিপূর্বে বিশ্বব্যাপী মানুষে মানুষে যে বিভেদ, উঁচু ও নীচু, বড় ও ছোটর যে পার্থক্য ছিল ইসলাম তা দূর করে দেয়। সমাজের সমস্ত মানুষকে একটি ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করার প্রয়াস চালায়।

"কুল্লুকুম মিন আদামা ওয়া আদামু মিন তুরাব"

'তোমরা সবাই আদমের সন্তান এবং আদমের সৃষ্টি মাটি থেকে'—নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ অমোঘ বাণী বিশ্ব মানবতাকে নতুন প্রাণ ধারায় উজ্জীবিত করে। বিশ্বে মুসলমানদের বিজয় অভিযানের অকল্পনীয় সাফল্যের এটাকেই সবচেয়ে বড় কারণ বলে পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকগণ চিহ্নিত করেছেন।

আমাদের আসল আলোচনা শুরু করার আগে অতীতে বিশ্ব ব্যবস্থায় ইসলামের ভূমিকা ও প্রভাবের ছিটেফোটা এখানে তুলে ধরলাম।

এখানে মূলত যে বিষয়গুলো আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. ইসলাম একটি খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। পরে ব্যক্তি কেন্দ্রীক রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে গেলেও প্রচলিত রাজতন্ত্রের সাথে তার পার্থক্যও সুস্পষ্ট ছিল। সেখানে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তিকেও কুরআনের আইনের সামনে ঝুঁকে পড়তে হতো।

২. ইসলামের অনুসারী জ্ঞানী-গুণী-আলেম-চিন্তাবিদগণ কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতির ভিত্তিতে ফিকহ্ ইনস্টিটিউট গড়ে তোলেন। ইজতিহাদের মাধ্যমে পরিবর্তিত জীবনধারার উপযোগী আইন প্রণয়ন করে তাঁরা ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে সচল রাখেন।

৩. তাঁরা সকল প্রকার সামাজিক বৈষম্য ও মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে মানবিক মর্যাদা ও ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তিতে একটি সুখী-শান্তিময় সমাজ গড়ে তোলেন।

৪. তাঁরা যে সমাজ গড়ে তোলেন সেখানে অর্থনৈতিক শোষণ ও নিগ্রহ ছিল না বরং ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি ও নিরাপত্তা। অর্থনৈতিক ইনসাফ সে সমাজকে একদিকে যেমন লোভ ও হিংসামুক্ত করেছিল তেমনি অন্যদিকে করেছিল উদার ও দয়ার্দ্র।

একশ বছর আগের ও পরের পৃথিবী

ইসলামের বিশ্বের বলয়ের বাইরে এখন আমরা আসতে পারি। একশ বছর আগের যে পৃথিবীটা আমরা দেখেছি সেখানে আজকের মতো বিজ্ঞানের এতটা প্রসার ছিল না। ইউরোপে রেনেসাঁ এসেছে। ইউরোপবাসী জীবনকে নতুন করে দেখতে শিখছে। নিজেদের কর্মক্ষমতা ব্যবহার করার ও জীবনকে উপভোগ করার নতুন কৌশল উদ্ভাবন করছে। সভ্যতা দ্রুত এগিয়ে চলছে। জীবন আরো দ্রুত এগিয়ে চলছে। মুসলমানরা পিছিয়ে পড়েছে। ঝিমিয়ে পড়েছে। মাত্র তিনশ বছরের মধ্যে দুনিয়া কোথায় থেকে কোথায় চলে গেছে। ভালোর তুলনায় মন্দ সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সত্যকে হটিয়ে মিথ্যা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। জোর যার মুল্লুক তার Servival of the fittest -এ নীতি তাদের প্রিয় জীবন নীতিতে পরিণত হয়েছে। এ নীতির ভিত্তিতে তারা বিশ্ব দখল করেছে এবং মানুষের ওপর শাসন চালাচ্ছে, তারা নাকি আইনের শাসন চালাচ্ছে। কিন্তু তাদের আইন দ্বিমুখী, শাসিতের জন্য এক, শাসকের জন্য অন্য।

এহলো তাদের ইনসাফ। এরি মধ্যে তারা করলো বিজ্ঞানে অসাধ্য সাধন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধকে এক কথায় "বিজ্ঞানের পৃথিবী" বললে বোধ হয় সহজে একে চেনা যাবে।

বর্তমান বিশ্বকে এভাবে তুলে ধরা যায় ঃ

১. বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পাশ্চাত্য মূল্যবোধ সারাবিশ্বে প্রতিষ্ঠিত সত্য। মুসলিম দেশেও ইসলামী মূল্যবোধ এতিমের জীবন যাপন করছে।

২. হালাল ও হারামের পার্থক্য নেই। মানুষ নিশ্চিন্তে হারাম কাজ করে যাচ্ছে এবং তার মধ্যে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছে।

৩. বিশ্ব রংগমঞ্চ থেকে বিগত তিন চারশ বছর থেকে মুসলমানদের অনুপস্থিতির ফলে ইসলাম ও মুসলমানরা এখানে আগন্তুকে পরিণত হয়েছে। তারা এখানে অপরিচিত।

৪. এখান থেকে আল্লাহর কর্তৃত্ব রহিত হয়ে গেছে। মানুষ আইন তৈরি করছে মানুষের জন্য এবং মানুষের স্বার্থে। মানুষই মানুষের সার্বভৌম কর্তা। মানুষ এখন আর আল্লাহর দাস নয়, মানুষের দাস।

৫. সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একজন মুসলমান যে জীবন যাপন করছে, তাতে প্রতি পদে পদে তাকে গুনাহের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। ব্যবসা-

বাণিজ্য, অফিস, আদালত, স্কুল-কলেজ, সাহিত্য-সংস্কৃতি অংগন সর্বত্র সে এক অনৈসলামী ও ইসলাম বিরোধী জীবনের মুখোমুখি হচ্ছে। এরই মধ্য দিয়ে তাকে এগিয়ে চলতে হচ্ছে জীবনের শেষ পরিণতির দিকে। কেবলমাত্র কবরস্থানটি এখনো তার বেদখল হয়নি।

এ একটি নতুন বিশ্ব। এরি বুকে বিশ শতকে ইসলামী আন্দোলনগুলোর আবির্ভাব।

আধুনিক বিশ্ব ও ইসলামী আন্দোলন

চলতি শতকের বিশের দশক থেকে চল্লিশের দশকের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনগুলোর আবির্ভাব। মিসরে ইমাম হাসানুল বান্না, তুরস্কে আল্লামা বদিউজ্জামান নূরসী, হিমালায়ান উপমহাদেশে মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এবং ইন্দোনেশিয়ায় ডক্টর নাসের প্রায় সম সময়ে এ আন্দোলনগুলোর সূচনা করেন। ৭০ বছরের ব্যবধানে আজ তাঁরা সবাই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।

এক. আন্দোলনের সূচনা পর্বে তাঁরা ইসলামকে নির্জীবতা ও নিষ্ক্রিয়তা থেকে সক্রিয়তায় ফিরিয়ে আনার কর্মসূচী নেন।

দুই. তাঁরা মুসলমান সমাজের শিক্ষিত জন সমষ্টিকে টার্গেট করেন। বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষিত জন সমাজকে। কারণ আধুনিক বিশ্বকে তারাই জানেন ও চেনেন এবং এ আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার মধ্য থেকেই তার মোকাবিলায় ইসলামী ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

তিন. তারা মুসলমানদেরকে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাতের দিকে আহ্বান জানান। কারণ এ কেন্দ্রের সাথে সার্বিক সম্পর্ক মুসলমানদের সকল প্রকার মতবিরোধে সমতা ও ভারসাম্য সৃষ্টি করবে।

চার. তাঁরা পাশ্চাত্য মূল্যবোধের সমালোচনা করেন এবং তার পারস্পরিক বৈপরিত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেন।

পাঁচ. তাঁরা ইসলামকে একটি পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করেন। মুসলমানদের জীবনের কোনো ক্ষেত্রকে এ জীবন ব্যবস্থার বাইরে রাখাকে তারা ইসলাম থেকে বিচ্যুতি ঘোষণা করেন।

এ শতকের প্রথমার্ধ শেষ হতে হতেই এ আন্দোলনগুলো সারা বিশ্বে পরিচিত হয়ে ওঠে। শত্রু পক্ষের সতর্ক দৃষ্টি তারা এড়াতে পারেনি। প্রথমে আঘাত আসে মিসরের ইখওয়ানুল মুসলিমুনের ওপর। তখনো চল্লিশের দশক

শেষ হয়নি। তার মুরশিদে আম হাসানুল বান্নাকে প্রকাশ্যে রাজপথে গুলি করে হত্যা করা হলো। তারপর হামলা এলো ইন্দোনেশিয়ার মাসজুমি পার্টির ওপর। পঞ্চাশের দশকে এ পার্টি নিষিদ্ধ হলো। এর সমস্ত কর্মতৎপরতাকে বেআইন করা হলো। এ পার্টি আজো স্বনামে প্রকাশ্যে কাজ করতে পারছে না। অবশ্য তাদের কর্মতৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়নি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে এড়িয়ে তারা তৎপর রয়েছে। তবে সাম্প্রতিক ইলেকশানের পরে তাদের তৎপরতা হয়তো বাইরেও কিছু এসে যেতে পারে।

উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনের ওপর আঘাত আসে গোড়াতেই দেশ বিভাগের মধ্য দিয়ে। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান নামে দু ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলে ইসলামী আন্দোলন ও তার নেতৃত্বও দু ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। পাকিস্তান অংশে এ আন্দোলন সিকি শতকের মধ্যে বহুবার সরকারী রোষ ও নির্যাতনের শিকার এবং একাধিকবার নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। হিন্দুস্তান অংশেও রাজনীতিতে সরাসরি তৎপর না থাকা সত্ত্বেও দুবার নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। সর্বশেষ ১৯৭১ সালে পাকিস্তান বিভক্তির ফলে ইসলামী আন্দোলন আর একবার বড় ধরনের সংকটের মুখোমুখি হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে আন্দোলন দানা বাঁধতে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়। ওদিকে তুরস্কে ইসলামী আন্দোলন প্রথম দিন থেকেই সংকটের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে। "নূরীউত তালাবা" নামে এ আন্দোলন গোপন তৎপরতা চালানো ছাড়া প্রকাশ্যে কাজ করার কোনো সুযোগই পায়নি। পরবর্তীকালে প্রকাশ্য তৎপরতার জন্য তাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন করতে হয়। এ সংগঠনগুলোও কয়েকবার নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার পর সবশেষে ওয়েলফেয়ার পার্টি নাজমুদ্দীন আরবাকানের নেতৃত্বে দু বছরের জন্য সরকার গঠনের সুযোগ পায়। কিন্তু দু বছরের মেয়াদ শেষ হবার আগেই সামরিক বাহিনীর চাপে তাদের রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে হয়। অবশ্য পরবর্তীতে বৃহত্তম সুযোগ তাদের জন্য অপেক্ষা করছে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ তুরস্কের বিভিন্ন প্রাইভেট সেক্টরে এবং গণমানুষের মধ্যে তাঁরা একটি ইসলামী চেতনা ও জাতীয় স্বাতন্ত্রবোধ জাগ্রত করতে পেরেছেন।

এভাবে ইসলামী আন্দোলনগুলোর কার্যধারা ও অগ্রগতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এ আন্দোলনগুলো তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে পুরোপুরি সক্ষম হয়েছে। এ দায়িত্ব ছিল দুটি ধারায় বিভক্ত ঃ

এক. বিগত তিন চারশ বছর থেকে বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলাম যে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছে তার অবসান ঘটানো এবং ইসলামকে চ্যালেঞ্জের ময়দানে নিয়ে আসা।

দুই. ইসলাম যে একটি পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা আধুনিক সমাজ থেকে এর স্বীকৃতি আদায় করা।

প্রাথমিক পর্যায়ে এ দুই দফার সফল বাস্তবায়নে ইসলামী আন্দোলনগুলো সক্ষম হয়েছে। দেশীয় ও আন্তরজাতিক প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করে এখন তারা দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। বিশ্ব ব্যবস্থা পরিবর্তনে তারা অগ্রসর হয়েছে। এ বিশ্বব্যবস্থাকে মূলত তিনটি বিভাগে চিহ্নিত করা যায়। এক. সামাজিক জীবন। দুই. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। তিন. রাজনৈতিক কার্যক্রম। যেসব দেশে ইসলামী আন্দোলন সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পেয়েছে সেসব দেশে প্রধানত এ তিনটি বিভাগে তাদের কার্যক্রমের একটি উল্লেখযোগ্য ধারা সৃষ্টি হয়েছে। আবার এ প্রত্যেকটি বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত ও পরিপুষ্ট করে শিক্ষাব্যবস্থা। তাই প্রত্যেক দেশে ইসলামী আন্দোলন শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছে এবং দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় কাংখিত পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

বিশ্বে ইসলামী আন্দোলনগুলো মূলত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল হয়েছে এবং তারা ইসলামী বিপ্লব আনার এবং ইসলামী সমাজ গঠনের জন্য নির্বাচনের পথে অগ্রসর হচ্ছে। ৫৪টি মুসলিম দেশের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত ইরান, আফগানিস্তান ও সউদী আরবই ছিল স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র। এ দেশগুলো ইউরোপীয় জাতিদের পদানত হয়ে তাদের কলোনীতে পরিণত বা তাদের পরোক্ষ প্রভাবে পরিচালিত হয়নি। বাকি প্রায় সব দেশগুলোই পাশ্চাত্য জাতিদের দ্বারা পরিচালিত বা তাদের উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল। পাশ্চাত্যের প্রত্যক্ষ শাসনমুক্ত হলেও তারা তাদের পরোক্ষ শাসনের জোয়াল এখনো কাঁধ থেকে নামাতে পারছে না। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক খপ্পর থেকে ছটি মুসলিম রাষ্ট্র মুক্ত হলেও বিগত সত্তর বছরে তারা সর্বস্ব খুইয়েছে। এরপরও দিশেহারার মতো তারা ইসলামকে আঁকড়ে ধরতে চাচ্ছে। তুরস্কের ইসলামী আন্দোলন তাদের সহায়তা করার জন্য কিছুটা এগিয়ে গেছে।

উপনিবেশিক শাসনমুক্ত হবার পর দেখা যাচ্ছে বেশ কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্রে যে কোনো কাঠামোয় হোক রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। সুদানে নামকাওয়াস্তে সামরিকতন্ত্র আছে। কিন্তু সেখানে ইসলামী আইন প্রণয়নের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। এটি সম্পন্ন হবার পর সেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দেশটিতে বর্তমানে পুরোপুরি ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মালয়েশিয়া পূর্ণাংগ ইসলামী শাসনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যদিও বর্তমানে দেশটিতে শতকরা ৩৮ ভাগ অমুসলিমের বাস। এ অমুসলিমরা ইসলামী

শাসনের পথে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। সেখানে একটি প্রদেশে [কেলানতান] পূর্ণাংগ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কুয়ালালামপুরের কেন্দ্রীয় সরকার এতে সমর্থন দিয়েছে।[১]

অন্য যেসব মুসলিম দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে সেখানে ইসলামী আন্দোলন নির্বাচনের মাধ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অতীত ঔপনিবেশিকদের শ্যেন দৃষ্টি এ দেশগুলোর ইসলামী আন্দোলনের ওপর নিবদ্ধ। কারণ ইসলামী আন্দোলনগুলো এ দেশগুলোতে পাশ্চাত্যের প্রভাবমুক্ত স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে কেবল এ দেশগুলোতে নয় পাশ্চাত্যেও ইসলামের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ার পূর্ণ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তাই অতীতের উপনিবেশবাদীরা ইসলামী আন্দোলনগুলোর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পদক্ষেপ নিচ্ছে। আলজেরিয়ার নির্বাচনে বিজয়ী ইসলামী স্যালভেশন ফ্রন্টকে ক্ষমতা না দিয়ে তাদেরকে দীর্ঘমেয়াদী সশস্ত্র জিহাদের মধ্যে ঠেলে দেয়া এ ধরনেরই একটি প্রচেষ্টা। কাশ্মীরের স্বাধীনতা যুদ্ধ যেহেতু ইসলামী আন্দোলনগুলো পরিচালনা করছে তাই পশ্চিমা উপনিবেশবাদীরা এদিকে এগিয়ে আসছে না। বরং তারা ভেতর থেকে সাম্রাজ্যবাদী ভারতকে মদদ দিয়ে চলছে।

বিশ্বে ইসলামী আন্দোলনগুলো যেভাবে সক্রিয় আছে এবং ইউরোপীয় ও পাশ্চাত্য উপনিবেশবাদীরা যেভাবে এদের মোকাবিলায় নেমেছে তাতে একটি কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ইসলামী আন্দোলনগুলো মূলত যথার্থ শক্তিতে পরিণত হচ্ছে। এ শক্তিকে অংকুরে বিনাশ করতে না পেরে উপনিবেশবাদীরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। কারণ এর অগ্রগতির মধ্যে তারা শুনতে পাচ্ছে তাদের মৃত্যু ঘণ্টা।

১. বর্তমানে আর একটি প্রদেশেও ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জাতিসত্তা ও জাতীয় পরিচিতি

জাতি ও ইউরোপীয় জাতীয়তা

'জাতি' একটি আধুনিক শব্দ। ইংরেজী Nation শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে একে ব্যবহার করা হচ্ছে। আসলে ইউরোপ থেকে আমদানি করা ন্যাশন-এর ধারণাই আধুনিক জাতীয়তার ধারণা সৃষ্টি করেছে। ইউরোপে দেখা যায়, এক অঞ্চলের অধিবাসীরা যারা নিজেদের ভাষা, বর্ণ, নৃতাত্ত্বিক ইত্যাদি বৈশিষ্টের ব্যাপারে সচেতন এবং এক পৃথক বৈশিষ্ট নিয়েই বেঁচে থাকতে চায় তারা নিজেদের এক জাতি বলে ঘোষণা করেছে। আবার এক বা একাধিক জাতি অভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং আরো বিভিন্ন জাগতিক স্বার্থে একটি রাজনৈতিক জাতীয়তা গড়ে তুলেছে। যেমন ইংলিশ, স্কটিশ ও আইরিশ জাতির একটি অংশ মিলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৃটিশ জাতীয়তা গড়ে তুলেছে। আইরিশ জাতির একটি অংশ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য স্বার্থের ক্ষেত্রে বৃটিশদের সাথে একাত্ম হতে পারেনি বলে পৃথক আইরিশ জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে। আবার বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত আইরিশ জাতি দীর্ঘকাল থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামও জিইয়ে রেখেছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, রাজনৈতিক ও অন্যান্য জাগতিক স্বার্থ ভিন্ন হয়ে গেলে আবার এ রাজনৈতিক জাতিদের মধ্যে বিভিন্নতা দেখা দেয়। কিন্তু তার মূল জাতীয়তায় কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হয় না।

ইউরোপের ন্যাশন-এর এ চিন্তা অতি আধুনিক। মোটামুটি ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে এর যাত্রা শুরু হয়েছে। ফরাসী বিপ্লবের পরে ইউরোপের চিন্তাধারায় যে পরিবর্তনগুলো এসেছে এ আধুনিক জাতীয়তাবাদ তার অন্যতম। ফরাসী বিপ্লবের পরে ইউরোপে একদিকে যেমন গণচেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি অন্যদিকে ধর্ম ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কও শিথিল হতে থেকেছে। এ আধুনিক জাতীয়তাবাদের ধারণার মধ্যেও এর প্রভাব পড়েছে।

কুরআনের কওম ও ন্যাশন

কুরআনে 'কওম' একটি বহুল উচ্চারিত শব্দ ও পরিভাষা। কুরআনে সাধারণত গোত্র ও সম্প্রদায়ের জন্য কওম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ইংরেজীতে সাধারণত Race বলতে যা বুঝায় কুরআনের 'কওম' তার কাছাকাছি অর্থ প্রকাশ করে। 'কওম' বলতে দল, উপদল, জনসমষ্টিও বুঝানো হয়েছে। যেমন সূরা আল বাকারার বিভিন্ন আয়াতে বলা হয়েছে ঃ লিকওমিই

ইউকিনুন—'দৃঢ়প্রত্যয়ী দলের জন্য' (১১৮)। লিকওমিই ইয়াকিলুন—'জ্ঞানবান লোকদের জন্য' (১৬৪)। লি কওমহি ইয়ালামুন—'জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য' (২৩০)। আলাল কওমিল কাফিরীন—'কাফের সম্প্রদায়ের বা জনসমষ্টির বিরুদ্ধে' (২৫০)। ওয়াল্লাহু লা ইয়াহদিল কওমায যালেমীন—'আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে সঠিক পথের সন্ধান দেন না' (২৫৮)। এছাড়া বিভিন্ন সূরায় বলা হয়েছে ঃ অপরাধী কওম, ফাসেক কওম, শোকরকারী কওম ইত্যাদিতে জনসমষ্টি বোঝায়। আবার বলা হয়েছে নূহের কওম, লূতের কওম, ইবরাহীমের কওম, ফেরাউনের কওম, আদের কওম, সামূদের কওম ইত্যাদি। এখানে গোত্র ও সম্প্রদায় বুঝানো হয়েছে।

কিন্তু ইংরেজী Nation বলতে যা বুঝায় অর্থাৎ ভাষা, বর্ণ, অঞ্চল, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট ইত্যাদির ভিত্তিতে একাত্ম জীবনযাপনকারী একটি সচেতন জনগোষ্ঠী, তা এই কওমের পরিপূরক নয়।

ইসলামে জাতি ও জাতীয়তা

আজকের পাশ্চাত্য বিশ্বে যে অর্থে জাতি শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে, ইসলামে তার অবস্থান কোথায়, এটা আজকের বিচার্য বিষয়। কুরআনে প্রায় এ জাত্যার্থে মুসলমানদের 'মুসলিম' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা হাজ্জ-এর ৭৮ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 'এবং জিহাদ করো আল্লাহর পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন এবং তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোনো প্রকার কঠোরতা আরোপ করেননি।' তারপর বলা হয়েছে ঃ 'মিল্লাতা আবীকুম ইবরাহীম। হুয়া সাম্মাকুমুল মুসলিমীন। মিন কাবলু ওয়া ফী হাযা'–'এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত তথা ধর্মাদর্শ। তিনি পূর্বেই তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম এবং এ কিতাবেও।' এখানে 'তিনি' শব্দটি আল্লাহও হতে পারেন আবার ইবরাহীমও হতে পারেন। জালালুদ্দীন সুয়ূতী এবং কাশশাফও এ মত প্রকাশ করেছেন। তবে আল্লাহ হওয়াটাই বেশী সঙ্গত। কারণ, বলা হচ্ছে ঃ 'ইতিপূর্বে' এবং 'এ কিতাবেও'। আর ইতিপূর্বের সংগে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম জড়িত থাকলেও এ কিতাবের সাথে তিনি জড়িত নন। আর আল্লাহ 'ইতিপূর্বে' এবং 'এই কিতাব' উভয়ের সাথে জড়িত হতে পারেন।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, আল্লাহই মুসলমানদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম'। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে, মুসলমানরা একটি আদর্শিক জাতি। সে আদর্শ হচ্ছে 'মিল্লাতে ইবরাহীম'। অর্থাৎ ইবরাহীমের আদর্শ। ইবরাহীমের আদর্শ ছিল তওহীদের স্বীকৃতি এবং শিরকের অস্বীকৃতি। তিনি বলেন, 'আমি একনিষ্ঠভাবে

মুখ ফিরাচ্ছি তাঁর দিকে যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তরভুক্ত নই।'–(সূরা আল আনআম ঃ ৭৯)

বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয়তা

আজকের বাংলাদেশ প্রাচীনকালে কয়েকটি দেশে বিভক্ত ছিল। এদের প্রত্যেকের ছিল পৃথক পৃথক নাম। এগুলো সবই ছিল আলাদা আলাদা স্বাধীন রাজ্য। এ দেশগুলোর ভিত্তিতে পৃথক পৃথক জাতীয়তা সেখানে গড়ে ওঠেনি। বরং বংশধারা ও রক্তধারা ভিত্তিক বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন দ্রাবিড়, ভোট চীনীয়, অষ্ট্রো-এশিয়াটিক ইত্যাদি। কিন্তু এদের মধ্যে বাঙালী বলে কোন জাতির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এ সমগ্র এলাকার সুবা-ই বাঙ্গালাহ্ নামকরণ বাংলায় মোগল শাসন সম্প্রসারনের পরের ঘটনা। এর আগে অবশ্য দক্ষিণে বঙ্গ বা বঙ্গাল নামে একটি রাজ্যের নাম পাওয়া যায়। উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমনের পরে যেমন হিন্দুস্তানের অমুসলিম অধিবাসীরা হিন্দু নামে অভিহিত হতে থাকে, ঠিক তেমনি পূর্বাঞ্চলে মুসলিম শাসনের পরেই গাঙ্গেয় বদ্বীপের রাজ্যগুলো 'বাঙ্গালাহ' নাম লাভ করে। ইংরেজ শাসনামলে এ এলাকা বঙ্গপ্রদেশ নামে অভিহিত হতে থাকে।

ইংরেজ শাসনের আওতাধীনে উনবিংশ শতকে এ এলাকায় যে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন চলে তার আগে সুবা-ই বাঙ্গালার হিন্দু সমাজের নিজেদের বাঙালী বলে পরিচিত করাবার কোন প্রয়াস লক্ষ করা যায়নি। হিন্দুস্তানে যেমন মুসলিম জাতীয়তার বিপক্ষে অমুসলিমদের ইংরেজ শাসনামলে হিন্দু পরিচিতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে ঠিক তেমনি বাংলায়ও মুসলমানদের বিপক্ষে হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা নিজেদের বাঙালী বলে পরিচিত করার প্রয়াস চালায় এবং হিন্দুত্ব ও বাঙালীত্বকে একাকার করে ফেলে।

বাংলার এ হিন্দুরা কারা ? আসলে হিন্দুস্তানের হিন্দু এবং বাংলার হিন্দুরা এক নয়। মুসলমানদের আগমনের সময় হিন্দুস্তানের যে হিন্দুরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে তাদের নেতৃত্বে ছিল আর্যরা। হিন্দুস্তানের সর্বত্র তারাই ছিল প্রবল। আর বাংলায় মুসলমানদের আগমনের সময় ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে ঠিকই কিন্তু তারা ছিল নগণ্য সংখ্যক। তারা ছিল এদেশের শাসক এবং তাদের একটি বিরাট অংশ সদ্য বাংলার বাইর থেকে আমদানি করা। এদেশের আসল অধিবাসীরা ছিল আর্যদের হাতে মার খেয়ে সমগ্র হিন্দুস্তান থেকে সরে এসে এই গাঙ্গেয় ব-দ্বীপে একত্র হওয়া সেমিটিক দ্রাবিড়। তারাও হিন্দু নামে অভিহিত হতো। কয়েক হাজার বছর থেকে এরা এ এলাকায় বসবাস করছে। এরা মুসলমানদের সাথে সহায়তা করে। এদের বৃহত্তর অংশ ইসলাম গ্রহণ

করে। বৃটিশ আমলে 'পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার' বলে সেখানে থেকে 'উপহার' নিয়ে যারা পুনরুজ্জীবন লাভ করলো তারা এ দ্রাবিড় হিন্দু নয়, তারা আর্য হিন্দু এবং তারাই বাঙালীত্বে হিন্দুত্ব তথা মুশরিকীত্ব আরোপ করে। কাজেই বুঝা যাচ্ছে, বাংলায় কোন অভিন্ন বাঙালী সমাজ আগেও ছিল না এবং এখনো নেই। বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি নিয়ে বাংলার সমাজ গড়ে উঠেছে।

বাংলায় মুসলিম জাতীয়তার বৈশিষ্ট

আসলে বাংলায় ইসলামের আগমনের আগে এ এলাকার জাতিসত্তার পূর্ণ বিকাশ ঘটেনি। ইসলামের আগমনের পূর্বে এই এলাকায় ছিল বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের ব্যাপক প্রভাব। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকদের নিপীড়নের ফলে বৌদ্ধ ও জৈন জনগোষ্ঠী প্রকাশ্যে তাদের ধর্মীয় জীবনযাপন করতে পারছিল না। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্য ইত্যাদি আর্য ধর্মীয় গোঁড়ামির ফলে তাদের ধর্মীয় জীবনে সৃষ্টি হয়েছিল চরম নৈরাজ্য। এ সময় ইসলাম এসে তাদেরকে এ নৈরাজ্য থেকে মুক্ত করে। তারা একটি সহজ সরল ধর্ম ও সহজ সরল জীবনের সাথে পরিচিত হয়। তারা নতুন জীবন লাভ করে। তাদের নতুন পরিচিতি সমাজে তাদেরকে মর্যাদাবান করে। ইতিপূর্বে ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকের ধর্ম গ্রহণ করেও তাদের শূদ্রত্ব মোচন হতো না। তারা ব্রাহ্মণ হতে পারতো না। কিন্তু এখন তারা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান দলভুক্ত হচ্ছিল এবং শাসকদের সাথে একই ইবাদত গৃহে একই লাইনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একই আল্লাহর ইবাদত করতে পারছিল। তারা একটি মর্যাদাবান জাতিতে পরিণত হয়েছিল এবং সেটি ছিল মুসলিম জাতি।

মুসলমানদের আগমনের পরে এ এলাকার নামকরণ হয়। এর আগে এ এলাকার কোনো একক নাম ছিল না। ইসলামের প্রসারের ফলে এ এলাকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুসলিম জাতি সত্তার অন্তরভুক্ত হয়। এখানে একক বৃহত্তর জাতির উদ্ভব হয়। এ মুসলিম জাতি সত্তার সাথে তাদের পূর্বের জাতি সত্তার বিরাট পার্থক্য রয়েছে। গোত্র, বংশ ও বর্ণভিত্তিক জাতীয়তা নিছক পরিচিতি ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ বলেন, আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে এবং তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো।'—(হুজুরাত ঃ ১৩) অর্থাৎ নিছক পরস্পরকে চিহ্নিত করার জন্য এ ধরনের বিভক্তির প্রয়োজন ছিল। অন্যদিকে ইসলাম এ পরিচিতির উর্ধে তাদের জন্য সরবরাহ করেছে একটি জীবনাদর্শ যার ভিত্তিতে তারা একাত্ম হতে পেরেছে এবং পৃথিবীতে মর্যাদার সাথে জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়েছে।

মুসলিম ও বাংলাদেশ অভিন্ন

বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম এবং এর চতুঃসীমার পেছনে একটি ধারাবাহিকতা রয়েছে। আর এ ধারাবাহিকতার প্রতিটি পর্যায়ে মুসলিম জাতিসত্তার রয়েছে সক্রিয় ভূমিকা। বাংলাদেশের বর্তমান সীমানার প্রথম উন্মেষ ঘটে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে। যদিও এর মূল কারণ শাসক ইংরেজের প্রশাসনিক সুবিধা। কিন্তু এর ভিত্তি ছিল বাংলার মুসলিম প্রধান এলাকার পৃথক সীমানা। হিন্দুরা এ পৃথক সীমানা চায়নি বলেই বঙ্গভঙ্গ রদ হয়েছিল। এরপর ১৯৪৭ সালের দেশ বিভক্তির মূল ভিত্তিই ছিল মুসলিম জাতীয়তা ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা। হিন্দুরা বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সাথে থাকতে চায়নি বলেই বাংলা বিভক্ত হয়ে হিন্দু বাংলা আমাদের থেকে আলাদা হয়ে গেছে। এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, ওটা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের বাংলা। ১৯৪৭ সালে বাঙালী হিন্দুরাই একথা ইতিহাসের পাতায় লিখে দিয়েছেন। একথা ইতিহাসের পাতায় জ্বলজ্বল করে রাখার জন্য তারা আবার সিলেটে গণভোট করিয়ে সেখানকার বাঙালী হিন্দু প্রধান এলাকা কেটে আসামের সাথে (পশ্চিমবঙ্গের সাথে নয়) মিশিয়ে দিয়েছেন। তবুও তাকে মুসলমানদের বাংলার সাথে রাখলেন না।

সবশেষে ১৯৭১ সালে আমরা পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে গেলাম। পাকিস্তানের ভিত্তি দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং এ দ্বিজাতিতত্ত্ব ভেঙ্গে গেলো কি থেকে গেলো এটা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয় এবং এর কোনো পরোয়াও আমাদের নেই। আমাদের আলোচ্য হচ্ছে ঃ ১৯০৫ সালে মুসলিম বাংলা আলাদা হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৭ সালে মুসলিম বাংলা পূর্ব পাকিস্তান হয়েছিল। আবার ১৯৭১ সালে সেই মুসলিম বাংলাই স্বাধীনতা লাভ করলো। এ তিনটি পর্যায়েই মুসলিম বৈশিষ্ট শতকরা একশ ভাগ সক্রিয়।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মধ্যে কি ভারতের পশ্চিমবঙ্গকেও এ মুসলিম বঙ্গের সাথে একীভূত করার কোনো 'চেতনা' ছিল ? পশ্চিমবঙ্গের কোন হিন্দুস্তানী বাঙালী কি এ ধরনের কোন কথা সেদিন কল্পনা করেছিলেন ? যদি এসব না হয়ে থাকে তাহলে আজ বাংলাদেশের মুসলিম বৈশিষ্টের প্রতি বিরূপতার কারণ কী ? এ ধরনের বিরূপতাকে এ দেশের স্বাধীনতা বিরোধী মনে করা যাবে না কেন ? যারা আজ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলেন, তখন তাদের চেতনায় কি এমন অনুভূতি ছিল যে মুক্তিযুদ্ধ শেষে অর্থাৎ পরবর্তী পর্যায়ে হিন্দুস্তানের হিন্দু বাংলার সাথে আমরা মিশে যাবো ?

এসব বিষয় আজ সুস্পষ্ট হওয়া দরকার। এটা স্বাধীন বাংলাদেশের মর্যাদার প্রশ্ন। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এবং স্বাধীন থাকবে। কিন্তু মুসলিম বৈশিষ্টকে বিসর্জন দেবার জন্য এদেশ স্বাধীন হয়নি এবং মুসলিম বৈশিষ্ট বিসর্জন দিয়ে এদেশ স্বাধীন থাকতেও পারবে না। মুসলিম বৈশিষ্টের কারণে আমরা পাকিস্তানের অংশ ছিলাম এবং মুসলিম বৈশিষ্টের ভিত্তিতেই পাকিস্তানের কবল থেকে পূর্বের সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ড নিয়ে স্বাধীনতা লাভ করেছি। কাজেই বাংলাদেশী জাতি সত্তার মূল ভিত্তিই হচ্ছে এর মুসলিম বৈশিষ্ট।

একটা বিল্ডিংয়ের ভিত্তি ভূমি ধসিয়ে দিলে সেটা কি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সমানভাবে শরীক হয়েছে। কিন্তু এ সংগ্রাম মুসলিম বাংলার চিহ্নিত সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। কাজেই এর মুসলিম বৈশিষ্ট অক্ষুণ্ন থেকেছে। বুঝা গেল, সংখ্যালঘুরা এ বৈশিষ্ট মেনে নিয়েই সংগ্রাম করেছে। তারা এ বৈশিষ্টকে আগ্রাসী মনে করেনি। হিন্দুস্তানের আগ্রাসী হিন্দু বৈশিষ্টের মধ্যে থেকেও যদি সেখানকার মুসলমান, শিখ ও অন্যান্য সংখ্যালঘুরা বসবাস করতে পারে, তাহলে বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃত উদার ও সহিষ্ণু পরিবেশে পারবে না কেন? হিন্দুস্তানকে আগ্রাসী এজন্য বলছি যে, দেশটির শাসনতন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হলেও কাজে কিন্তু বিগত অর্ধশতকের মধ্যে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

প্রথমত দেশটির নামের মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতা রয়ে গেছে এবং এটা দূর করার কোন চেষ্টা গত পঞ্চাশ বছরেও করা হয়নি। হিন্দুস্তান অর্থাৎ হিন্দুদের দেশ। মুসলমানদের আগমনের সময় যে 'হিন্দুস্তান' ছিল সেটা ছিল মুসলমান ছাড়া অন্যান্য সকল অধিবাসীর দেশ। ইংরেজ শাসনামলে তাদের দৃষ্টিতে এ দেশবাসী যেমন ছিল নেটিভ, মুসলিম শাসনামলে হিন্দু ও হিন্দুস্তানের ঠিক একই অর্থ ছিল। এমনকি তদানীন্তন হিন্দুস্তানের মাথার উত্তর পশ্চিমে যে পাহাড়টি রয়েছে তার নামও বিদেশী অভিযানকারীরা দিয়েছে 'হিন্দুকুশ'। অর্থাৎ ফারসী ভাষার এ শব্দের অর্থ দাঁড়ায় 'ক্র্যাশ ইণ্ডিয়া'। নিশ্চয়ই এর অর্থ হিন্দু জাতিকে ধ্বংস করা ছিল না। বরং এর অর্থ ছিল এ পাহাড়টি অতিক্রম করে হিন্দুস্তান দেশটি জয় করো। কিন্তু আজ কালক্রমেই এ 'হিন্দু' একটি ধর্মীয় জাতিগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। শব্দটির প্রচলন শুরু হয়েছিল দেশটির সমস্ত অধিবাসীদের কেন্দ্র করে কিন্তু আজ সেটি একটি বিশেষ ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। আজ হিন্দু বলতে মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, পার্সী ও অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু বুঝায় না। বরং একটি বিশেষ ধর্মগোষ্ঠীকে

বুঝায় এবং সেই ধর্মগোষ্ঠীর নামেই দেশটি চলছে। বাংলাদেশের নামের মধ্যে এ ধরনের কোনো সাম্প্রদায়িক শব্দ মুসলিম বাংলা বা মুসলিমস্তান ঢুকিয়ে দেয়া হয়নি।

দ্বিতীয়ত দেশটিতে এমন কয়েকটি প্রভাবশালী ও অতি প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল রয়েছে যারা হিন্দুস্তানের সমস্ত অধিবাসীদের হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করাকে তাদের দলীয় কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ কাজ তারা গত পঞ্চাশ বছর ধরে করে আসছে। সরকারী পর্যায়ে এতে কোন প্রকার বাধা দেয়া হচ্ছে না। অথচ বাংলাদেশে এ ধরনের কোন প্রচেষ্টা নেই।

তৃতীয়ত দেশটির শাসনতন্ত্র তার ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র রক্ষায় অসমর্থ। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হিসেবে নিত্যদিনের হাজার হাজার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা বাদ দিলেও শুধু একটিমাত্র ঘটনার উল্লেখই যথেষ্ট হবে। ভারতীয় শাসনতন্ত্র রচয়িতা সংখ্যালঘু হরিজন সম্প্রদায়ের অন্তরভুক্ত ডক্টর আম্বেদকর শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে নিজের সামাজিক মর্যাদা রক্ষায় অসমর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে হরিজনের চরম শূদ্রত্বের অবস্থান থেকে একটু উপরে ওঠার চেষ্টা করেছিলেন। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে লেখা থাকলেও ইসলামের বাইরের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক মর্যাদায় কোন আঘাত আসছে না।

তিন বৈশিষ্ট

এক ঃ বাংলাদেশের মানুষের ভাষা বাংলা। তারা সবাই বাংলা ভাষায় কথা বলে, এই সুবাদে তারা বাঙালী। এছাড়া তাদের বাঙালীত্বের আর কোন ভিত্তি নেই। বিদেশে এ বিষয়টি গভীরভাবে অনুভূত হবে। বিভিন্ন দেশের বাংলা ভাষা-ভাষীরা সেখানে শুধুমাত্র ভাষার কারণে নিজেদের মধ্যে একাত্মতা অনুভব করে। এর পেছনে আমরা বাঙালীরা এক জাতি, এ ধরনের কোন জাতীয় অনুভূতি কাজ করে না। অন্যদিকে তিন পুরুষ ধরে কলকাতায় জমিজমা কিনে ঘরবাড়ী করে বসবাসরত তিনটি তামিলভাষী মাদ্রাজী পরিবারকে কোন দিন বাঙালী বলে গ্রহণ করা হয় না। তবে বংশ পরম্পরায় তারা যদি তামিলত্ব বর্জন করে বাংলাভাষী হয়ে ওঠে, তখন আবার তারা বাঙালী বলে গৃহীত হবে। কাজেই ভাষা ভিত্তিক একাত্মতা ছাড়া বাঙালীত্বের পেছনে রাষ্ট্রিক বা সাংস্কৃতিক অন্য কোন জাতীয়তার বৈশিষ্ট কার্যকর নেই। আর তাছাড়া বাংলা উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলের বৃহত্তম ভাষা। অসমিয়া ও উড়িয়া ভাষা এরই শাখা ভাষার মতো। কাজেই এ ভাষার বিশেষ প্রভাব অনস্বীকার্য।

দুই ঃ বাংলাদেশের রয়েছে ভূখণ্ডগত অবস্থান। এর ভিত্তিতে এখানে গড়ে উঠেছে রাজনৈতিক ও দেশজ জাতীয়তা। একটি স্বাধীন জাতি হবার কারণে বাংলাদেশের মানুষের বাংলাদেশী জাতীয়তা একটি স্বীকৃত রাষ্ট্রীয় সত্য। এখানে বাঙালী জাতীয়তার কোন স্থান নেই। বাঙালাভাষী এবং যারা বাংলাভাষী নয় যেমন ত্রিপুরা, চাকমা, মগ, মুরং, কোল, ভীল, সাঁওতাল ইত্যাদি উপজাতিরা সবাই মিলে জাতীয়তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশী। জাতীয় মর্যাদার ক্ষেত্রে কারোর কোন স্বাতন্ত্র নেই।

তিন ঃ বাংলাদেশের অধিবাসীদের তিন বৈশিষ্টের মধ্যে তৃতীয়টি হচ্ছে, ইসলামী আদর্শবাদ। এরই ভিত্তিতে এ দেশটি গড়ে উঠেছে এবং স্বাধীনতা অর্জন করেছে। অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীরা এ বৈশিষ্টের সাথে সম্পৃক্ত না হলেও এটি তাদের জন্য আগ্রাসী নয় বলেই তারা এ দেশের স্বাধীনতা অর্জনে মুসলমানদের সহযোগী হয়েছে। এ দেশের এ ইসলামী আদর্শবাদ বা মুসলিম জাতিসত্তার যদি কেউ বিরোধিতা করে, তাহলে সে যে স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তি তার প্রমাণ থাকে না। সে তো এ দেশের স্বাধীনতাকেই বিপন্ন করে তুলেছে। কারণ এ দেশের স্বাধীনতা মুসলিম জাতি সত্তার স্বাতন্ত্রবোধেরই ফল।

আধুনিক বিশ্ব ও হযরত মুহাম্মদ (স)

এটা এমন একটা প্রসঙ্গ যা চিরকাল মানুষের সামনে আসতে থাকবে যতদিন মানুষ থাকবে সমস্যায় জর্জরিত। আর মানুষের সমস্যার শেষ নেই। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটা নয়, অসংখ্য বরং যাবতীয় সমস্যার সমাধানের নাম।

তিনি একমাত্র মানুষ যিনি তাঁর জমানার তাঁর দেশের এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট মানবগোষ্ঠীর সমস্ত সমস্যার সুষ্ঠু, ন্যায়সংগত ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কি সমস্যা ছিল তাঁর এলাকার মানব গোষ্ঠীর? তারা ছিল একটা বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, আত্মকলহে লিপ্ত, প্রতিহিংসা পরায়ণ মানব গোষ্ঠী। বহু গোত্রে বিভক্ত। প্রত্যেক গোত্রের ছিল আলাদা বৈশিষ্ট ও জীবনবোধ এবং বিশিষ্ট আত্মগরিমা। একাত্মতার কোনো অনুভূতিই ছিল না তাদের মধ্যে। 'আর তোমরা ছিলে একটা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে, আল্লাহ সেখান থেকে তোমাদের উদ্ধার করেছেন।'–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৩)

শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞান চর্চা এবং এর ভিত্তিতে যে মার্জিত ও রুচিশীল জীবন ধারা গড়ে ওঠে, যাকে সুসভ্য ও সংস্কৃতিবান সমাজ আখ্যা দেয়া হয় তা থেকে তারা ছিল অনেক দূরে। ফলে অজ্ঞতা, মূর্খতা ও কুসংস্কারে ডুবে গিয়েছিল তারা। মূর্খতা ও কুসংস্কারই ছিল তাদের জীবন সত্য ও জীবনবোধ।

এভাবে ন্যায়, নীতিবোধ ও কল্যাণের কোনো ধারণাই তাদের ছিল না। ব্যক্তি স্বার্থ এবং বড়জোর সংকীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থ পর্যন্তই তাদের কল্যাণ চিন্তা সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে জোর যার মুল্লুক তার এটিই হয়ে উঠেছিল তাদের নীতি।

সমাজে উঁচু-নীচু, বড় ছোটর পার্থক্যবোধ ছিল পুরোদস্তুর। বিশেষ করে সমাজের অর্ধাংশ এবং সামাজিক প্রবৃদ্ধি, মানব বংশ বৃদ্ধি ও পুরুষের সকল কাজের প্রেরণাদাত্রী নারী ছিল নিগৃহীত, শোষিত ও দাস পর্যায়ভুক্ত। মানুষের কেনাবেচা চলতো অবাধে। লুণ্ঠন ছিল জীবিকার একটি উপায়। অতর্কিত আক্রমণ করে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া, অবাধে নরহত্যা করে রক্তের স্রোত প্রবাহিত করা, শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনকারী নিরপরাধ নারী-পুরুষকে দাসে পরিণত করে বাজারে বিক্রি করা ছিল জীবন যাপনের একটি পদ্ধতি।

আত্মগরিমা অটুট রাখার জন্য শিশু-কিশোর কন্যাকে জীবন্ত দাফন করা হতো। 'আর যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?'–(সূরা আত তাকবীর ঃ ৮-৯)

এভাবে অনাচার, জুলুম, অন্যায়, নীতিহীনতা, কুসংস্কার, অজ্ঞতা, মূর্খতা, বিশৃঙ্খলা, স্বেচ্ছাচারিতা এবং যাবতীয় নিকৃষ্ট পাপবিদ্ধ ও জরা ব্যাধিগ্রস্ত একটি সমাজে পরিণত হয়েছিল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীন আরব সমাজ।

আজকের আধুনিক বিশ্বের সাথে কি একে তুলনা করা যায়? ইউরোপের শিল্প বিপ্লব থেকেই প্রায় আধুনিক যুগের গণনা শুরু করা হয়। এ শিল্প বিপ্লব সমাজ বিপ্লবের সূচনা করে। ইউরোপীয় সমাজ বিপ্লবের ধারা আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। গত কয়েক শ বছর ধরে এ শিল্প বিপ্লব ও সমাজ বিপ্লবের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ইউরোপীয় জাতিরা সারা দুনিয়ায় রাজনৈতিক আগ্রাসান চালায়। ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকার বিভিন্ন স্বাধীন দেশ দখল করে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করে সেখানে রাজনৈতিক আগ্রাসন চালায়। বিশেষ করে উত্তর আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় ইউরোপের সমমানের রাজনৈতিক শাসন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এভাবে ইউরোপীয় সভ্যতা একযোগে তিন মহাদেশের ভিত্তিতে সারা বিশ্বের ছয়শ কোটি মানুষের ওপর রাজত্ব করছে। তারা একটা আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে এবং বিশ্বব্যাপী এর প্রসার ঘটিয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা এবং এর উন্নতি ও অগ্রগতিও এ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। এ শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছে তারা সেক্যুলারবাদের ওপর। আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি অনাগ্রহী, আল্লাহর বিধানের সাথে অসম্পর্কিত এবং অনেক ক্ষেত্রে ঐশী গ্রন্থসমূহ প্রবর্তিত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বৈরীভাবাপন্ন বরং সেগুলোকে বিধ্বস্ত পর্যুদস্ত ও বিলুপ্ত করার আন্তরিক কামনা পোষণকারী এ শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমানে সারা বিশ্বকে একটি সেক্যুলার সূত্রে গ্রথিত করেছে। এভাবে ইউরোপীয় তথা পাশ্চাত্য সভ্যতা সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে সেক্যুলার মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ঘটিয়েছে।

বিগত তিন-চারশ বছরের আধুনিক বিশ্ব এরি অবদানের সমষ্টির নাম। অন্য কোনো মূল্যবোধ এখানে তেমন বিশিষ্টতা অর্জন করতে পারেনি। অন্য মূল্যবোধগুলোর মধ্যে চৈনিক, ভারতীয় ও ইসলামী মূল্যবোধের নাম নেয়া যেতে পারে। ভারত একটি প্রাচীন সভ্যতার দেশ। প্রাক ঐতিহাসিক যুগে দ্রাবিড় ও তৎপূর্ববর্তী জাতিরা মিলে এ বিশাল ভূখণ্ডে যে সভ্যতার জন্ম দেয় তার সাথে এসে মেশে পরবর্তীকালে আর্য সভ্যতা। প্রাক ইসলামী যুগের এ ভারতীয় সভ্যতাই পরবর্তীকালে হিন্দু সভ্যতার রূপ নেয়। ইসলাম এসে এ ভারতীয় উপমহাদেশে একটি মিশ্র সভ্যতার জন্ম দেয় ঠিকই। কিন্তু প্রচণ্ড

রক্ষণশীলতার মাধ্যমে হিন্দু সভ্যতা এ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। ফলে তার মধ্যে শিরকের অবিচল প্রাধান্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব অক্ষুণ্ন থেকে যায়। অন্যদিকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চীন ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এশীয় দেশগুলোয় যে অতি প্রাচীন সভ্যতা গড়ে ওঠে তাকে আমরা এক কথায় চীনের বিশালতা ও প্রাধান্যের কথা বিবেচনা করে চৈনিক সভ্যতা নাম দিতে পারি। কনফুসিয়াসবাদ ও বৌদ্ধবাদ এ দুই জীবন দর্শন ও জীবন চিন্তার ভিত্তিতে এ সভ্যতা গড়ে ওঠে। মুশরিকী চিন্তা ও মুশরিকী জীবনধারার দিক দিয়ে বিচার করলে ভারতীয় উপমহাদেশীয় আর্য হিন্দু সভ্যতার সাথে তার অমিল কমই পাওয়া যাবে। পরবর্তীকালে ইসলামী সভ্যতার সেখানে অনুপ্রবেশ ঘটলেও তার প্রাধান্য কেবলমাত্র দু চারটি দেশে দেখা গেছে, বাকি সর্বত্রই চৈনিক সভ্যতারই প্রাধান্য থেকেছে।

এশীয় এ দুই প্রাচীন সভ্যতার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার অমিল কমই দেখা গেছে। বিশেষ করে মুশরিকী চিন্তা এবং সেক্যুলারবাদ তথা ব্যবহারিক জীবনকে আল্লাহর বিধানের অনুগত না করার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোনো বিরোধ খাড়া করে রাখলেও মূলে তাদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। তাই পাশ্চাত্যবাদকে তারা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে নিয়েছে। এদের মোকাবিলায় ইসলামী সভ্যতা সম্পর্কে বলা যায়, হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় ইসলামী সভ্যতা মুসলিম সভ্যতায় পরিণত হয়। বহু ইসলামী মূল্যবোধ সেখানে মুমূর্ষু ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এ সুযোগে পাশ্চাত্য সভ্যতা তাকে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলে। মুসলমানদের একটি অংশ বিশেষ করে নব্য শিক্ষিত অংশটি এবং রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব যারা গ্রহণ করেছে তারা পুরোপুরি পাশ্চাত্য সভ্যতায় রঞ্জিত হয়ে গেছে। অন্যদিকে সাধারণ মুসলমানরা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাধান্য মেনে নিয়েছে। এ অবস্থায় বলা যায়, মুসলিম বিশ্বেও পাশ্চাত্য তথা আধুনিক সভ্যতা প্রাধান্য বিস্তার করেছে। সমগ্র বিশ্ব আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার আওতাধীন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক ইত্যাদি জীবনের যাবতীয় ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য মূল্যবোধ মানুষের জীবনে নানাবিধ জটিল সমস্যার জন্ম দিয়েছে।

রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিশ্ব ব্যক্তিতান্ত্রিক তথা রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পার হয়ে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্র শাসনের এটা একটা পদ্ধতি। অতীতের হাজার বছরের রাজতান্ত্রিক শাসনের পর বিগত দেড় দুশ বছর থেকে গণতন্ত্রের চর্চা সারা বিশ্বে চললেও ইউরোপের কয়েকটা দেশ ও আমেরিকা ছাড়া কোথাও এটা পুরোপুরি স্থিতিশীল হতে পারেনি। এখনো মনে হয় এর পরীক্ষা নিরীক্ষার পালা শেষ হয়নি। তারপর অধিকারের কোনো

সীমারেখাও নির্ণীত হয়নি। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের ভিত্তিতে সমকামিতার আইনও পাশ হয়ে গেছে। বাকস্বাধীনতার গণতান্ত্রিক অধিকারের ভিত্তিতে আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা ও মিথ্যা অপবাদের প্রচারও তারা সংগত মনে করে। আবার পাশ্চাত্যে এ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকে নির্মূল করতে পারেনি। বরং তাকে ভিত্তি করেই প্রসারিত হয়েছে। ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ফল হয়েছে ভয়াবহ। এরি ফলে এ শতকের মাঝামাঝিতে এসে জার্মান জাতীয়তাবাদ হিটলারী নাৎসিবাদের রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ফলে একটি বিশ্ব মহাযুদ্ধের সূচনা ঘটে। নিহত হয় কোটি কোটি মানব সন্তান এবং ধ্বংস হয় হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ-সম্পত্তি।

প্রবল পরাক্রান্ত পুঁজিবাদ আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার অর্থনৈতিক প্রসব। এর লক্ষ একটিই। পুঁজির প্রবৃদ্ধি ও তাকে সংহত করা। ফলে শোষণের নতুন নতুন পথ আবিষ্কৃত হয়েছে। উদ্বৃত্ত পুঁজি ভোগ ও বিলাসিতার নতুন নতুন সামগ্রী ও পদ্ধতি উদ্ভাবনে নিয়োজিত হয়েছে। গরীব গরীব থেকেছে, ধনী হয়েছে আরো ধনী। অবশ্য হাজার হাজার বছর থেকে দুনিয়ায় এ পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে। আধুনিক পাশ্চাত্যবাদ এর মধ্যে নীতিগত কোনো পরিবর্তন আনেনি। বরং একে আরো আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করেছে। বিগত ও চলতি শতকে পুঁজিবাদ সারা বিশ্বে অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত মহাজালেম রূপে আবির্ভূত হয়েছে।

এরি প্রতিক্রিয়ায় বিগত শতকের শেষের দিকে ইউরোপে মার্কসবাদের জন্ম হয় এবং চলতি শতকের শুরুতে রাশিয়ায় তা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর হিটলারী কায়দায় এশিয়া ও ইউরোপের একটা বিরাট অংশকে গ্রাস করে নেয়। মার্কসের কমিউনিস্ট অর্থব্যবস্থা তার প্রতিষ্ঠার জন্য আবার একটা কঠোর স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্ম দেয়। যার ফলে কমিউনিস্ট দেশগুলো এক একটি বৃহৎ কারাগারে পরিণত হয়। মানুষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাসে পরিণত হয়। ফলে এক শতাব্দী অতিক্রান্ত হবার অনেক আগেই সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। আর তার সাথে বিশ্বের বিপুল সংখ্যক মানুষ হতাশায় ভেঙে পড়ে। অন্যদিকে পুঁজিবাদ আরো পরাক্রমশালী হয়ে ওঠে।

সামাজিক ব্যবস্থায় আধুনিক পাশ্চাত্যবাদ এমন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে যে, সমগ্র পাশ্চাত্য বিশ্বের পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। বিয়ে একটা অপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থায় পরিণত হয়। বিবাহপূর্ব যৌন জীবন এখন সেখানে অপরিহার্য হয়ে

পড়েছে। বয়সের বৃহত্তর সীমানা পেরিয়ে যারা বিবাহিত জীবন যাপন করে তারাও নিজেদের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ও মেলামেশার ক্ষেত্র অক্ষুণ্ন রাখে। ফলে অবিশ্বাস বাসা বাধে। তালাকের প্রাচুর্যই সেখানে বিস্মিত করে দেবার মতো। খুব কম দম্পতি পাওয়া যাবে যারা একাধিক বিয়ে করেনি। এরপর রয়েছে নারীদেহ বিক্রির ব্যবসায়। প্রাচীন দাসদাসী বিক্রির বাজার যদি আজ থাকতো তাহলে আজকের অত্যাধুনিক কালের নারী দেহ ব্যবসায়ের বাজারজাত করণের কৌশল ও জাঁকজমক দেখে সে বাজারের ব্যবসায়ীরা লজ্জায় আত্মগোপন করতো। পাশ্চাত্য সভ্যতা নারীকে সমান অধিকার দিয়েছে। কিন্তু প্রথমেই তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে তার গায়ে চড়িয়ে দিয়েছে পুরুষের পোশাক। তাকে পুরুষ বানিয়েছে। তাকে নারীত্ব বিসর্জন দিতে হয়েছে পুরুষের সমান হবার জন্য।

এভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাধান্যের যুগে বিগত তিন চারশ বছর থেকে মানুষ তার কোনো একটি সমস্যারও সুষ্ঠু সমাধান করতে পারেনি। এ সমস্যার স্তুপ বাড়তে বাড়তে আজ বড় বড় পাহাড়ে পরিণত হয়েছে। এক শতকের মধ্যে দুটো বিশ্ব যুদ্ধও এর সুরাহা করতে পারেনি। অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে এগিয়ে এসে মার্কসবাদও কোনো চমক সৃষ্টি করতে পারলো না।

ফলে শোষণ ও হানাহানি তীব্রতর হচ্ছে। পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, পরমাণু অস্ত্রের একটি কেন্দ্র ভেঙে পড়লেও তার জায়গায় একাধিক কেন্দ্র গড়ে উঠছে। অর্থাৎ পরমাণু অস্ত্রের আঘাত ছাড়া অন্য কোনো প্রকার মৃত্যু আধুনিক বিশ্বের মানুষের কপালে লেখা নেই। রাষ্ট্রের প্রতি রাষ্ট্রের অবিশ্বাস যেমন বেড়ে গেছে তেমনি বেড়েছে ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির অবিশ্বাস। এজন্য চলছে রাষ্ট্রপতিদের, বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গ্রুপদের সফর বিনিময়। কিন্তু সেখানেও কৌশলে প্রত্যেকে যার যার স্বার্থ সিদ্ধিতেই লিপ্ত হচ্ছে। অর্থাৎ সন্দেহ, অবিশ্বাস ও সংঘাতের সম্ভাবনা অব্যাহত থাকছে। সারা বিশ্বে মানুষের মধ্যে সর্বস্তরে অস্থিরতা বেড়ে যাচ্ছে। ভোগ বিলাস বাড়ছে, অস্থিরতাও বাড়ছে। ফলে খুন, জখম, আত্মহত্যার সংখ্যাও অবিশ্বাস্য হারে বেড়ে চলছে।

এভাবে এক এক করে বিচার করলে দেখা যাবে, আধুনিক বিশ্ব বিগত কয়েকশ বছরে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিপুল সমস্যায় জর্জরিত হয়েছে। সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। কিন্তু তার ফলে আরো নতুন নতুন সমস্যার জন্ম হয়েছে। শান্তির অন্বেষায় বিশ্ব আজ আবার "অশান্তির

বিশাল অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।" আজ আবার এ অগ্নিকুণ্ড থেকে উত্তরণের জন্য তার আল্লাহর সাহায্য দরকার।

এ সাহায্য আল্লাহ তার নবীর মাধ্যমেই করে থাকেন। এ ধরনের একটি বিশ্বকে আল্লাহর শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিন নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আজো তাঁর সেই নেতৃত্ব আল্লাহর বাণী কুরআন এবং নবীর সুন্নাতের আকারে আমাদের সামনে রয়েছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের বিধান নিজের ওপর এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন পুরোপুরি। কোথাও সামান্য হেরফের করেননি। ফলে সেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পূর্ণ শান্তি। প্রত্যেকটি মানুষ পেয়েছিল তার ন্যায়সংগত অধিকার। সকল ক্ষেত্রে সুবিচার পেয়েছিল প্রত্যেকটি মানুষ। সমাজের ও রাষ্ট্রের কোনো ক্ষেত্রে সামান্য অবিচার ও অন্যায় ছিল না। মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ফিরে এসেছিল। অন্য রাষ্ট্রও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাস করে পরিতৃপ্ত হতো।

ইসলামের এ ব্যবস্থার মধ্যে আজো কোনো পরিবর্তন হয়নি। পরিবর্তন হয়েছে মুসলমানদের মধ্যে। কাজেই আধুনিক বিশ্বের সমস্যার সমাধান করে তাদের অবস্থার পরিবর্তন করার জন্য মুসলমানরা যদি এগিয়ে আসে অথবা বিশ্ব যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবর্তিত ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে অগ্রসর হয় তাহলেই একমাত্র তাদের সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হবে। ওয়া কাফা বিল্লাহি ওয়াকিলা–'আর কর্মসম্পাদনকারী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।'

একুশ শতকে ইসলামের পুনরাবির্ভাব ও বাংলাদেশ

একুশ শতকে আমরা পৌছে গেছি। একটি নতুন শতক। সৃষ্টিগত দিক দিয়ে তেমন কোনো তাৎপর্য নেই। স্রষ্টার জাহানে অনাদিকাল থেকে এমনই শতকের জন্ম হয়ে আসছে অসংখ্য এবং আগামীতেও হবে। তাই সৃষ্টিগত দিক দিয়ে তেমন নতুন কোনো ব্যাপার নয় কিন্তু পৃথিবীর অধিবাসীদের কাছে প্রতিটি একশ বছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আগামী একশ বছর তাদের সম্ভাব্য বিচিত্র সৃষ্টিমুখরতায় ঐশ্বর্যময়।

একুশ শতক ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম এ পর্যন্ত চৌদ্দটি শতক অতিক্রম করে এসেছে। চৌদ্দশ' বছর পরে কোনো ধর্ম আর ধর্ম থাকে না, হয়ে ওঠে এক ধরনের বিকৃত আচার-অনুষ্ঠান ও নিষ্প্রাণ সামাজিক রীতি। কিন্তু চৌদ্দশ' বছর পরও ইসলাম কেবল আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তার মূল প্রাণশক্তিও বজায় রয়েছে। তার মূল কিতাব এবং মূল চিন্তাধারা কুরআন অবিকৃত রয়ে গেছে। এটা সম্ভব হয়েছে এজন্য যে, ইসলাম কেবল একটি ধর্মমাত্র নয় বরং একটি জীবন বিধান। আর জীবন বিধান হবার কারণে বাস্তব জীবনের পরিবর্তনের সাথে সে সবসময় সম্পর্কিত থেকেছে এবং এ পরিবর্তনের মধ্যেও নিজেকে অবিকৃত রেখে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। অন্যান্য ধর্ম মূলত আসমানি কিতাব ভিত্তিক ধর্মগুলো সবই ছিল ইসলাম এবং ইসলামের মৌল বাণী ও মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে গিয়ে সেগুলো নিজেকে অবিকৃত রাখতে পারেনি।

ইসলাম কিভাবে নিজেকে অবিকৃত রেখেছে ? প্রথমত ইসলামের মূল কিতাব কুরআনকে আল্লাহ নিজেই অবিকৃত রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন। ইন্না নাহ্‌নু নাযযালনায যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহা ফিযুন–'অবশ্য আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তার হিফাজতকারী।'–(সূরা আল হিজর ঃ ৯) সূরা আল কিয়ামার ১৯ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ ছুম্মা ইন্না আলাইনা বায়ানাহ। অর্থাৎ 'এরপর এর বর্ণনা ও ব্যাখ্যার দায়িত্বও আমারই।' একটি কিতাবের মূল বাণী যদি সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং তার বর্ণনা ও ব্যাখ্যার বিশেষ ধারা নির্ধারিত হয়ে যায়, তারপর তার বিকৃতির আর কোনো পথই থাকে না।

এখন ইসলামের মূল চিন্তাধারা অর্থাৎ কুরআনের অবিকৃত থাকার তাৎপর্য কি ? চিন্তাধারার যুগে যুগে পরিবর্তনই স্বাভাবিক। যুগের পরিবর্তনে অবস্থার

পরিবর্তন হয়। মানুষের জীবনে ও জীবন যাপনে পরিবর্তন তো অতি সাধারণ ব্যাপার। অনড় ও কঠোর নিয়মে বাঁধা বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দেয়। এ পরিবর্তনকে সামাল দিতে গিয়ে জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও সফলকাম করে তুলতে নতুন নতুন চিন্তার প্রয়োজন হয়। মূলত নতুন নতুন চিন্তার কারণে মানুষের সভ্যতা দুনিয়ায় অগ্রগতি লাভ করতে পেরেছে। যুগের প্রতিটি পরিবর্তনের সাথে যদি মানুষের চিন্তার পরিবর্তন না হতো তাহলে মানুষ স্থবিরতা ও জড়ত্বে পৌঁছে যেতো।

এ ক্ষেত্রে এ অবিকৃত ও অপরিবর্তনীয় কুরআন মানুষের পরিবর্তনশীল জীবন ও সভ্যতার পথের দিশারী হতে পারে কেমন করে? কেবল আজকের আধুনিক যুগে নয়, বিশেষ করে বিগত কয়েকশ' বছর থেকে, যখন থেকে ইসলাম বিশ্ব সভ্যতায় তার একচেটিয়া কর্তৃত্ব হারিয়েছে বিশ্বের একদল জ্ঞানী-গুণী একথা বুঝতে একেবারেই অক্ষম হয়েছেন। আসলে তারা মানুষের জীবনকে দেখেন দুনিয়ার সীমিত গণ্ডীর ভেতরে। এর মধ্যে কিছুকালীন জীবনে তার বেঁচে থাকা এবং দুনিয়ার সম্পদ ভোগ করার ক্ষমতা অর্জন করাটাই তাদের কাছে মুখ্য। শুধু তার নিজের বাঁচার জন্য যদি অন্যকে মারার প্রয়োজন হয় এবং অন্যের সম্পদ বৈধ-অবৈধভাবে অপহরণ করতে হয় তাহলে তাকেও তারা সাফল্যের মধ্যে গণ্য করেন। মানুষ এমন একটা জীবনযাপন করতে পারে যে জীবনের প্রতি পদে পদে সে নিজের কাঁধে একটি অর্পিত দায়িত্ব পালনের বোঝা বহন করে, মানুষ কেন কোনো প্রাণীর প্রতিই কোনো প্রকার অন্যায়, জুলুম, অবিচার, শোষণ, নিপীড়ন ও অন্য কোনো ধরনের অসৎবৃত্তি অবলম্বন করার কথাই সে চিন্তা করতে পারে না এবং সমস্ত জীবন সে অতিবাহিত করে আর একটি জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য, যা অনন্তকালীন এবং যা রয়েছে ভবিষ্যতের গর্ভে, একথা তারা কল্পনাই করতে পারেন না। দুনিয়ার পরিবর্তনশীলতাকে তারা এমন দৃষ্টিতে দেখেন যেন এটিই বিশ্ব প্রকৃতির সবচেয়ে বড় ঘটনা এবং একে যে কোনোভাবে অতিক্রম করতে পারলেই জীবন সফল ও সার্থক।

অথচ জীবনের এখানেই শেষ নয়। মৃত্যু শেষ যতি চিহ্ন নয়, পরবর্তী আসল ও অনন্ত জীবনের দ্বারদেশ মাত্র। পৃথিবীতে যতোগুলো পরিবর্তন ঘটে, তা ঘটে নিছক জীবনের কারণে। পার্থিব জীবনটাই এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যে নিজে নিজেই সচল। তার মধ্যে যে গতি সঞ্চার করা হয়েছে এই গতিটাই হচ্ছে পরিবর্তনশীলতা। মানুষের জীবনে নিত্যনিয়ত পরিবর্তন ঘটে। শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য তার শারীরিক কাঠামোর এক একটি

গতি। এ গতির পরিবর্তন তাকে এগিয়ে দিচ্ছে অনন্তকালীন স্থায়িত্বের দিকে। সেখানে জীবন আছে সবকিছুই আছে কিন্তু শেষ বা মৃত্যু নেই। সেখানে সবকিছুই প্রকৃতিগতভাবে অবিকৃত ও অপরিবর্তনীয়। এ স্বল্প ও খন্ডকালীন পৃথিবী সেই অনন্তকালীন মহাজগতের সাথে সম্পর্কহীন নয়। বরং তারই উদ্দেশ্যে একে সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই এ জগতে এমন চিন্তা মানুষের জন্য লাভজনক যা অভ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয় অন্তকালীন চিন্তার সাথে একসূত্রে গাঁথা। তাই যে অনন্তকালীন প্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত করে এ পরিবর্তনশীল বিশ্বে মানুষকে কিছুকালের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, সেই প্রকৃতির চাহিদা অনুযায়ী সঠিক কাজ করা তার পক্ষেই সম্ভব যে এ অপরিবর্তনীয় চিন্তার অনুসারী। তাই ইসলামকে প্রকৃতির ধর্ম বলা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআনের চিন্তা ও জীবন বিধানকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যা মানুষের এ স্বল্পকালীন পরিবর্তনশীল প্রকৃতির সাথে পুরোপুরি খাপ খেয়ে যায়।

তাই কুরআনী চিন্তার মধ্যে পরিবর্তন নেই কিন্তু পরিবর্তনশীলতাকে গ্রহণ করার ক্ষমতা আছে। এ স্থায়ী চিন্তা কখনও স্থবিরত্বের শিকার হয় না। মানুষের জীবনে, সমাজে ও এই বিশ্ব প্রকৃতিতে যতো রকম পরিবর্তন আসতে পারে তার সমগ্র মৌল কাঠামোর ভিত্তিতে এর সামগ্রিক চিন্তাধারাকে গ্রথিত করা হয়েছে। আর এটা সম্ভব হয়েছে এ কারণে যে, যিনি এ চিন্তাধারার উদগাতা তিনিই এ জীবন, সমাজ, প্রকৃতি ও সকল প্রকার পরিবর্তনশীলতার স্রষ্টা, পরিচালক ও নিয়ন্তা। তিনি ভবিষ্যত বর্তমান ও অতীতের কেবল পূর্ণ জ্ঞান রাখেন তা-ই নয়, বরং এর স্রষ্টাও।

তাই কুরআনের অপরিবর্তনীয় চিন্তা মানুষের অগ্রগতির পথে বাধা নয়। বরং তার সমৃদ্ধ অতীতের ভিত্তিতে তার বর্তমানকে আরও সমৃদ্ধ করা এবং ভবিষ্যতের সমৃদ্ধিকে যথাযথভাবে সংরক্ষিত রাখা একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব। বিশ্ব ইতিহাসের বিগত চৌদ্দশ বছর এরই একটি খোলা চিত্র পেশ করেছে।

ঈসায়ী সপ্তম, অষ্টম ও নবম শতকে কুরআনী চিন্তা যখন পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও তার মৌল প্রাণসত্তা সহকারে বিশ্ব শাসন করে তখন মানুষের জীবনে যে শান্তি ও সমৃদ্ধির জোয়ার আসে তা আজও মানবেতিহাসের একটি দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। মুসলমানরা তখন বহু দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছে কিন্তু সে যুদ্ধ পরবর্তীতে ধ্বংস ডেকে আনেনি বরং মানুষ শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধি ও শান্তির জীবনযাপন করেছে। সভ্যতা অগ্রগতি লাভ করেছে। গ্রীকদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে মানুষের অগ্রগতির উপাদান পর্যবেক্ষণ করে মুসলমানরা আন্তরিকতার সাথে তাকে নবজীবন দান করেছে। পাশ্চাত্যে দীর্ঘকাল ধরে যা সমালোচিত,

নিন্দিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়ে এসেছে, মুসলমানরা তার সত্যতা উপলব্ধি করার পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে একটুও দ্বিধা করেনি। মুসলমানরা যে সভ্যতার ভিত গড়েছে, তার মধ্যে ধ্বংসের নয়, সমৃদ্ধির সমস্ত উপাদান সংরক্ষিত হয়েছে।

তারপর থেকে নিয়ে পনের শতক পর্যন্ত মুসলমানরা যে বিশ্ব শাসন করেছে তার মধ্যে কুরআনী চিন্তা থেকে বিচ্যুতির গতি দ্রুততর হয়েছে। তাই সেক্ষেত্রে ইসলামী সভ্যতার মধ্যে জাহেলিয়াতের অনুপ্রবেশের পথ প্রশস্ত হয়েছে। ধীরে ধীরে মুসলমানরা জাহেলিয়াতের কাছে পরাস্ত হয়েছে। অষ্টাদশ উনবিংশ শতক আসতে আসতে এ পরাজয় একটা পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে। এ সময় মুসলিম অধ্যুসিত ভূখণ্ডগুলোও জাহেলিয়াতের ধারক-বাহকদের পদানত হয় এবং তারা সেখানে তাদের জাহেলী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে। মুসলিম মিল্লাতের বৃহদংশ কুরআনী চিন্তার উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। জাহেলী চিন্তার আপাত ঔজ্জ্বল্যে তাদের মস্তিষ্কের সমস্ত কোষ বিমুগ্ধ ও বিমোহিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু জাহেলিয়াত জাহেলিয়াতই। তার অন্ধকার গর্ভে আলোর দিশা নেই ঃ "যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ তাদের অভিভাবক তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোকে নিয়ে যান। আর যারা কুফরী করে, তাগুত তাদের অভিভাবক। তারা তাদেরকে আলোক থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৭)

কিন্তু বিশ শতকে এসে মুসলমানরা পেছন দিকে তাকিয়ে দেখতে সক্ষম হয়েছে। তারা কুরআনের শিক্ষাকে আবার নতুন করে গ্রহণ করতে শিখেছে। পাশ্চাত্যবাদ ও পাশ্চাত্য সভ্যতা তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। পুরাতন ছাই ভস্মের মধ্যে যে আগুন চাপা ছিল তা ফেটে বের হওয়া শুরু হয়েছে। ইসলামের আলো মুসলমানদের অন্তরকে আলোকিত করছে। সারা বিশ্বে ইসলামের একটা স্পন্দন দেখা দিয়েছে। বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘিষ্ট যে কোনো মুসলিম অধ্যুসিত এলাকায়, তা সে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া যে কোনো মহাদেশেই হোক না কেন, এখন এটা দিনের আলোর মতোই সুস্পষ্ট। মুসলমানরা ইসলামের মূল বিধান, মূল অনুশাসন ও মূল চিন্তার দিকে ফিরে যেতে চায়। মুসলমানরা কুরআনকে আঁকড়ে ধরতে চায়।

মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞান চর্চা ও ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা লাভের প্রচেষ্টা বেড়েছে। ইসলামের দুটি মূল উৎস তথা কুরআন ও তার ব্যাখ্যা হাদীসের চর্চা ব্যাপক হয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা বলেছি, আল্লাহ কুরআনের ব্যাখ্যা সংরক্ষণের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমস্ত সহী হাদীস সংরক্ষণের মাধ্যমে তিনি এ ব্যবস্থা করেছেন। আজ এ সমস্ত সহী

হাদীস সকল প্রকার জটিলতা মুক্ত হয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়েছে। কুরআন ও হাদীস থেকে সরাসরি হেদায়াত গ্রহণ করা এখন মুসলমানদের জন্য মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর প্রথম থেকেই মুসলিম উলামা ও ফকীহগণ কুরআন ও হাদীস থেকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী সরাসরি বিধান ও অনুশাসন গ্রহণ করতেন। ইসলামী পরিভাষায় একে ইজতিহাদ ও রায় বলা হয়। ফকীহ ও মুজতাহিদগণ ইজতিহাদ করার ক্ষেত্রে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও পরিবেশের প্রতি নজর রাখতেন। এজন্য তাঁরা কিছু মূলনীতি প্রণয়ন করেন। এ সিলসিলা তিন চারশ বছর পর্যন্ত জোরেশোরে চলতে থাকে। পরবর্তীকালে এ মূলনীতি বা উসূল প্রণয়নের কাজ বন্ধ হয়ে যায় এবং ফকীহগণ আগের ইমামদের উসূলের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করতে থাকেন। এঁদেরকে বলা হয় মুজতাহিদ ফিল মযহাব। এঁরা নিজেদের স্বাধীন মত প্রকাশ করলেও নিজেদের ইমামদের সীমানা ও গণ্ডীর মধ্যেই বিচরণ করেছেন। হিজরী সাত আট শতক পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকে। পরিস্থিতি ও পরিবেশের পরিবর্তনের প্রতি এ সময় পর্যন্ত যথেষ্ট নজর রাখা হয় কিন্তু এরপর থেকে শুরু হয় নিছক ফতোয়া দানের যুগ। এ সময় ইজতিহাদের ধারা অতি দ্রুত শুকিয়ে যেতে থাকে। শেষের দিকে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, মুফতীগণ কেবলমাত্র নিজের মযহাবের ইমামগণের রায়ের মধ্য থেকে একজনের রায়কে প্রাধান্য দিয়েই ক্ষান্ত হন, সেই আলোকে নিজের কোনো রায় উপস্থাপন করা থেকে বিরত থাকেন। ফিকহের পরিভাষায় একে তাকলীদ বলা হয়। বিশ্বব্যাপী ইসলামী শরীয়তের চৌদ্দশ বছরকে যদি ইজতিহাদী ও তাকলীদী যুগ হিসেবে দু ভাগে বিভক্ত করা হয় তাহলে আমরা দেখবো, ইজতিহাদী যুগে পরিবর্তনকে গ্রাহ্য করা হয়েছে। ফলে তখন ইসলামী আইন, সমাজ ও রাষ্ট্র ছিল গতিশীল। ব্যক্তির মধ্যেও ছিল গতিশীলতা, সৃজনশীলতা এবং আবিষ্কার ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও প্রবণতা। অন্যদিকে তাকলীদী যুগে পরিবর্তনকে অবহেলা করা হয়েছে এবং কখনো তাকে স্বীকার করাই হয়নি। আর কোথাও স্বীকার করা হলেও তার মূল্যায়নের চেষ্টা ও সাহস করা হয়নি। ফলে এক্ষেত্রে জীবনে এসেছে স্থবিরতা, সমাজে কলহ ও বিরোধ এবং চিন্তায় বিভ্রান্তি।

এ অবস্থায় বিশ্ব নেতৃত্বের যোগ্যতা মুসলমানদের মধ্যে হ্রাস পাওয়াটাই স্বাভাবিক। এমনকি এক পর্যায়ে অন্য জাতির দাসবৃত্তিও তাদের কপালে জুটেছে।

বিগত কয়েক শতক থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাধান্যের যুগে মুসলমানদের মধ্যে যে পরিবর্তনগুলো এসেছে তা হচ্ছে ঃ

এক. তারা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের কার্যকারিতার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে।

দুই. ইসলামকেও তারা অন্যান্য ধর্মের মতো ধর্ম মনে করেছে।

তিন. ইসলামের প্রতি ঈমানকে তারা নিছক বিশ্বাসের পর্যায়ে রেখেছে। তার ওপর আমল করা ও তার বিধানগুলো মেনে চলা অপরিহার্য মনে করেনি।

বিশ শতকে বিভিন্ন মুসলিম দেশে যে ইসলামী পুনরুজ্জীবন আন্দোলনগুলো জন্মলাভ করেছে তার ফলে মুসলমানরা ইসলামের মূল উৎসগুলোর দিকে ফিরে আসতে শুরু করেছে। চৌদ্দশ বছরের মধ্যে সমস্যার ব্যাপক পরিবর্তন এবং তার ওপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবও তারা যথাযথভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে। ইসলামকে তারা নিজেদের জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করার জন্য দ্রুত এগিয়ে আসছে।

অন্যদিকে বিশ্ব পর্যায়ে বিগত চার পাঁচশ বছর ধরে বিভিন্ন পাশ্চাত্য চিন্তার পরিবর্তিত রূপগুলোর একের পর এক ব্যর্থতা অনৈসলামী বিশ্বকে যেমন একদিকে হতাশায় ডুবিয়ে দিয়েছে তেমনি অন্যদিকে ইসলামের প্রতি মুসলমানদের আকর্ষণকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তুরস্ক ও আলজেরিয়ার মতো কোনো কোনো মুসলিম দেশে মুসলমানদের ইসলামী আগ্রহকে দমন করার জন্য সেনাবাহিনীর ওপর ভরসা করে সেক্যুলারিজমের অস্ত্র প্রয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু এ প্রচেষ্টাও আর বেশীদিন হালে পানি পাবে না। মুসলিম জনতার আগ্রহ সেনাবাহিনীর শক্তিকে নস্যাত করে দেবে। ইউরোপ ও আমেরিকার মতো বিপুল অমুসলিম সমৃদ্ধ এলাকার ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু ও সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী নওমুসলিমদের মধ্যেই ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করার আগ্রহ বেড়ে চলছে।

এভাবে আমরা দেখি বিশ্বব্যাপী ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করার প্রচেষ্টা ও প্রবণতা প্রতিদিন বেড়ে চলছে। এ প্রচেষ্টায় সাফল্য একদিন আসবেই, সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশে এ প্রচেষ্টা দীর্ঘকাল থেকে চলছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দ্বারদেশে বাংলাদেশের অবস্থান। ভারত ও চীনের মতো বিশ্বের দুটো বড় বড়

দেশ এ এলাকায় অবস্থিত। কাজেই এশিয়ার প্রায় এই দুই-তৃতীয়াংশ এলাকায় বাংলাদেশের ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার গুরুত্ব অনেক বেশী।

বিগত পঞ্চাশ বছরে এ প্রচেষ্টা যে সাফল্য অর্জন করেছে তা নিম্নরূপ ঃ

এক. এ এলাকায় ইসলাম ও মুসলমানের ইতিহাস হাজার বছরের হলেও মুসলমানদের জীবন ধারায় ইসলামের প্রভাব যথেষ্ট স্তিমিত। এর বহুবিধ কারণ থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ইসলামকে জীবন ক্ষেত্রে একটি সচল শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত করার জন্য এ এলাকায় উনিশ শতকের আগে ব্যক্তিগত পর্যায়ে দু-চারটি প্রচেষ্টা চললেও জাতীয় ও সামষ্টিক পর্যায়ে কোনো প্রচেষ্টা চলেনি। উনিশ শতকে রায় বেরিলীর সাইয়েদ আহমদ শহীদের ইসলামী জিহাদ আন্দোলন, যার আসল নাম ছিল তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া এবং শরীয়তপুরের হাজী শরীয়তুল্লাহর ফারায়েযী আন্দোলন বাংলাদেশের কয়েকটি বিশেষ এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু বিশ শতকের প্রথমার্ধের শেষের দিকে এ এলাকায় ইসলামকে একটি জীবন ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার যে আন্দোলন শুরু হয় তা অর্ধ শতক পার হতে হতেই এলাকার প্রায় সকল স্থানেই ছড়িয়ে পড়েছে। নারী-পুরুষ, শ্রমিক-কৃষক, ছাত্র-শিক্ষক, আইনজীবী-অর্থনীতিবিদ, চিকিৎসক, রাজনৈতিক নেতা, সাংস্কৃতিক কর্মী, সাহিত্যিক, উলামা নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে।

দুই. দেশের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ ইসলামকে একটি সফল ও কার্যকর জীবন বিধান হিসেবে চিন্তা করতে শুরু করেছে।

তিন. সামাজিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব বহুদূর বিস্তৃত হয়েছে। ইংরেজের দুশ বছরের শাসনকালে এদেশের ইংরেজী শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে সেক্যুলারবাদের ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং বর্তমানে এর প্রভাবে মুসলিম সমাজের একটি অংশ পুরোপুরি সেক্যুলারবাদে দীক্ষিত হয়েছে। তাদের বিশ্বাস, চিন্তাভাবনা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন যাপন, চলাফেরা, রাজনীতি, অর্থনীতি সবকিছুই সেক্যুলারবাদ দ্বারা পরিচালিত। তাদের একটি গ্রুপ ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে আল্লাহকে রব বলে মানে। তারা নামায পড়ে, মাথায় টুপি দিয়ে চলে কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আল্লাহর রবুবীয়াত সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে, এমনকি রাষ্ট্র ও জনগণের জন্য তাকে ক্ষতিকর মনে করে। ইসলামী আন্দোলন তার কয়েক দশকের প্রচেষ্টায় এ সেক্যুলার গ্রুপের বিপরীতে একটি ইসলামী বিধান ও অনুশাসন নিবেদিত গ্রুপ তৈরী করেছে। তারা তাদের জীবনের সবক্ষেত্রে

ইসলামী ও কুরআনী বিধান মেনে চলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে তারা ইসলামী ধারার জন্ম দিয়েছে। কুরআন ও হাদীসের বিধান অনুযায়ী রাজনীতি অর্থনীতি নির্বিশেষে জীবনের সকল ক্ষেত্রকে তারা ঢেলে সাজাবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

চার. এর প্রভাবে মুসলমানরা ইসলাম ও জাহেলিয়াত এবং তওহীদ ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা অর্জন করেছে। আর এটা সম্ভব হয়েছে সরাসরি ও ব্যাপকভাবে কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন ও চর্চার বদৌলতে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ এলাকায় ইসলামী দাওয়াতের কাজের শুরুতে এদিকে তেমন কড়া নজর রাখা হয়নি। ফলে শিরকের এ বিশাল ভূখণ্ডে মুসলমানদের তওহীদ বিশ্বাসে বহুক্ষেত্রে শিরক মিশ্রিত হয়ে গেছে। এ এলাকায় ইসলাম প্রচারের কাজে মূলত সুফীরাই অগ্রণী ছিলেন। আর তওহীদের ব্যাপারে সুফীগণের দুর্বলতা একটি বহুল আলোচিত বিষয়। ইসলামী আন্দোলন মুসলিম জীবনের এই দুর্বলতা দূর করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

পাঁচ. বিশ কোটি মানুষের ভাষা বাংলা। ইসলামী আন্দোলন বিগত পঞ্চাশ বছরে বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের একটি শক্তিশালী ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। এর চেয়ে বড় কথা এই যে, ইসলামী আন্দোলনের পূর্বে দু-চারটে মাসয়ালা মাসায়েলের বই ছাড়া বাংলা ভাষায় তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ইসলামী সাহিত্য ছিল না। ইসলামী আন্দোলন একদল আগ্রহী রুচিশীল পাঠক তৈরী করেছে। ফলে ছোটবড় অনেক প্রকাশকও এগিয়ে এসেছেন। ইসলামের প্রায় প্রত্যেকটি বিষয়ে এখন বাংলা ভাষায় তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ পাওয়া যায়। বিশেষ করে কুরআনের ডজনখানেক তাফসীর এবং হাদীসের ডজনেরও বেশী গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হয়ে গেছে, যা মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও কল্পনাও করা যেতো না।

ইসলামী আন্দোলন সার্বিকভাবে বাংলাদেশে একটি ইসলামী পরিবেশের উদ্ভব ঘটিয়েছে, সন্দেহ নেই। বলা যায়, বাংলাদেশে একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে চলছে। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনকে আরও কয়েকটা দিক বিবেচনা করে পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্রথমত বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন সার্বিকভাবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার একটি আন্দোলন। আর মুসলিম সমাজই স্বাভাবিকভাবে এ আন্দোলনের প্রধান লক্ষ। কাজেই মুসলিম সমাজ বর্তমানে যে অবস্থায় আছে, সেখান থেকেই

তাকে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনতে হবে। মুসলিম সমাজ বর্তমানে কি অবস্থায় আছে? মুসলিম সমাজ ইসলামী মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নেই। এ অবস্থা চলছে দীর্ঘদিন থেকে। এ দেশে মুসলমানদের শাসনামল থেকে এ অবস্থার শুরু। প্রবল প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের প্রভাব তার জন্য বাড়তি সংকট সৃষ্টি করে। তারপর আসে দুশ বছরের ইংরেজ শাসনের প্রবল প্রতাপ। এ সময় পরিকল্পিতভাবে মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়, বিশেষ করে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে। ফলে বাংলার মুসলমানদের চিন্তায় এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে অনৈসলামী ভাবধারা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, আইন ও অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে অনৈসলামী চিন্তা ও ব্যবস্থাপনার কবলে চলে গেছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সাধারণ জনতার একটি অংশ, যাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থাপনায় এবং জাতীয় নীতি-নির্ধারণে মূলত কোনো অংশ নেই, তারাই কেবল নিজেদেরকে তৌহিদী জনতা বলে দাবী করতে পারে।

অনৈসলামী চিন্তার ধারক দেশের এই বিশাল নীতি-নির্ধারক গোষ্ঠী রয়েছে একদিকে এবং অন্যদিকে রয়েছে দেশে অনৈসলামী চিন্তার সয়লাব, প্রাধান্য ও একাধিপত্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইসলামী চিন্তা নিগ্রহের শিকার হয়েছে। দেশের মাদরাসা শিক্ষার পাঠক্রম এমনভাবে তৈরী হয়নি যার ফলে সেখানকার সৃষ্ট উলামায়ে কেরাম এর জবাব দিতে পারেন।

এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ইসলামী চিন্তার প্রাধান্য সৃষ্টি করতে হলে ইসলামী আন্দোলনকে কুরআনী ও ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী যথার্থ ইলমী যোগ্যতাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী তৈরীতে তৎপর হতে হবে। তাছাড়া রাষ্ট্র ও সমাজ বর্তমানে যে কাঠামোর ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে, ইসলামী জ্ঞানে সার্বিক পারদর্শিতা ছাড়া কেবলমাত্র পুঁথিগত কিছু বিদ্যা ও কলাকৌশল ব্যবহার তার মধ্যে ইসলামী ধারায় পরিবর্তন আনা সম্ভবপর হবে না। এজন্য দস্তুরমতো ইসলামী জ্ঞানের উপর গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত একই সাথে দুনিয়াবী যোগ্যতাও বাড়াতে হবে। প্রতিপক্ষ যে ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন ইসলামী জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবার পর অন্তত সেই মানের যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। তার চেয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্ন হলে প্রথমে জাগতিক দিক দিয়েই পরাস্ত হতে হবে। কাজেই তারপর হাজার ইসলামী যোগ্যতা থাকলেও তাকে কাজে লাগাবার কোনো সুযোগ পাওয়া যাবে না।

তৃতীয়ত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বাহ্নে ত্যাগী নেতৃত্বের কোনো বিকল্প নেই। কারণ এ নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সদা সতর্ক থাকতে হবে। বিত্ত-বৈভব, মর্যাদা, ক্ষমতা সবই আল্লাহর দেয়া। এগুলো তার আমানত। এগুলো অর্জন করা অন্যায় নয় কিন্তু তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী এগুলো ব্যবহার করতে হবে। সবকিছুর আগে হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর ত্যাগ ছাড়া কোনো প্রকার স্বার্থ সম্পৃক্ততায় এটা অর্জন সম্ভবপর নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ تعيش في الدنيا كانك غريب او عابري سبيل অর্থাৎ 'দুনিয়ায় এমনভাবে বাস করো যেনো তুমি একজন আগন্তুক অথবা পথচারী।' অর্থাৎ দুনিয়ায় বাস করেও দুনিয়া থেকে স্বতন্ত্র থাকা। ইসলামের প্রথম চার খলীফার জীবনে আমরা এরই দৃষ্টান্ত খুঁজে পাই। বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের সর্বস্তরের নেতৃত্বের পর্যায়ে যারা থাকবেন তাদের অবশ্যই দুনিয়ার ভোগের প্রতি কম দৃষ্টি দিতে হবে। কারণ এর ফলে তাদের কক্ষচ্যুতি ঘটতে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো একথা বলেছেন, সকল মুসলমানের জন্য কিন্তু অন্তত নেতৃত্ব পর্যায়ে যদি এ দৃষ্টান্ত স্থাপিত না হয়, তাহলে সাধারণ লেবেলে এর অনুসৃতি কোনোক্রমেই সম্ভব হবে না।

চতুর্থত ভেতরে-বাইরে সকল ক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অধিকার আদায় ও অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে নিজের ও অন্যের জন্য ব্যক্তিগত ও দলীয়ভাবে কোনো ক্ষেত্রেই পৃথক মানদণ্ড কায়েম করা যাবে না ঃ ওয়ালা ইয়াজরিমান্নাকুম শানাআনু কওমিন আলা আল্লা তা'দিলু ইদিলু, হুয়া আকরাবু লিত তাকওয়া, ওয়াত্তাকুল্লাহ। অর্থাৎ 'কোনো দলের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেনো কখনও ইনসাফ বর্জনে প্ররোচিত না করে, ইনসাফ করবে, এটি তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে।' আল্লাহর ভয়ে ইনসাফ করতে হবে। আর আল্লাহর ভয়ই হচ্ছে তাকওয়া। আবার বলা হচ্ছে, ইনসাফ করে তাকওয়ার কাছাকাছি পৌছানো যায়। অর্থাৎ ইনসাফ করে তাকওয়ার কাছাকাছি পৌছে তাকওয়া সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা একদিকে আভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি করবে এবং অন্যদিকে দলীয় ও গণ পর্যায়ে সমঝোতা বেড়ে যাবে, এই সঙ্গে অনেক ভুল বুঝাবুঝিও দূর হবে।

পঞ্চমত ইসলামী আন্দোলনকে সাধারণ ও দেশের সর্বস্তরের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে। আসলে মুসলিম জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। আল্লাহও কুরআন মজীদে 'ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানু' বলে মুসলিমদেরকে সম্বোধন করেছেন। ইসলামী আন্দোলনকে মূলত জনগণের সাথে থাকতে হবে। এর অর্থ এ নয়

যে, জনগণ ভুল করলে ইসলামী আন্দোলন তাদের ভুলের সহযোগিতা করবে। এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে তাদের ভুলটা কোন্ পর্যায়ের। যদি সেটা আল্লাহর প্রতি নাফরমানী পর্যায়ের হয়, তাহলে 'লা তাআতা লিমাখলুকিন ফি মাসিয়াতিল খালেক' তথা 'আল্লাহর নাফরমানী করে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না'–এ নীতির ভিত্তিতে অবশ্যই তার সাথে সহযোগিতা করা যাবে না। কিন্তু যদি সে ভুলটি অন্য কোনো জাগতিক স্বার্থভিত্তিক সিদ্ধান্তমূলক হয়ে থাকে, তাহলে এটা আল্লাহ্ নির্ধারিত এমন কোনো ফরয ও ওয়াজিব নয় যে তার বিরোধিতা করে ইসলামী আন্দোলনকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ঝুঁকি নিতে হবে। এরপর ইসলামের দাওয়াত দেবার এবং ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাদেরকে আহ্বান করা হবে? কাজেই ইসলামী আন্দোলন এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না যা তাকে মুসলিম জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।

ষষ্ঠত ইসলামী আন্দোলনকে অবশ্যই তার লক্ষ স্থির করতে হবে। সে কোথায় যাবে। কোন্ কোন্ পর্যায় অতিক্রম করে যাবে। তার চূড়ান্ত গন্তব্য ও মধ্যবর্তী গন্তব্যগুলো পূর্বাহ্নেই নির্ধারিত করে নিতে হবে। এই চূড়ান্ত গন্তব্য হবে স্থির। তবে মধ্যবর্তী গন্তব্যগুলো অদল-বদল হতে পারে। কিন্তু তারপরও এগুলো নির্ধারিত হতে হবে। কোনো একটি গন্তব্য পরিবর্তিত হলে সেটাও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হতে হবে এবং পরিবর্তনের সময় চূড়ান্ত ও স্থির গন্তব্যে পৌছার পথে যেনো তা বাধা না হয় সে কথা অবশ্য কঠোরভাবে বিবেচনা করতে হবে। এই মধ্যবর্তী গন্তব্যগুলো নির্ধারণ না করে কেবলমাত্র স্থির গন্তব্য সামনে রেখে এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করা দীর্ঘ সময় ক্ষেপণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

তারপর এই গন্তব্যে পৌছার জন্য যে পলিসি গ্রহণ করা হয়, তাতে অবশ্যই ভারসাম্য থাকতে হবে। সে ক্ষেত্রে যেন কোনো 'শানাআনু কওমিন' ইসলামী আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

এভাবে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন যদি হিকমতের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক ময়দানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে মুসলিম জনগণের বৃহত্তর অংশের অনুকূল মনোবৃত্তিকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয় এবং নিজেদের ইসলামী জ্ঞানগত ও জাগতিক যোগ্যতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অগ্রগতি লাভ করতে পারে, তাহলে এদেশে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার পথে কোনো বাধাই অনতিক্রম্য বিবেচিত হবে না।

তবে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে যতোই দিন যাবে ততোই জনগণ উপলব্ধি করতে পারবে, সেক্যুলারবাদ বা অন্য কোনো আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বিরোধী জাগতিক মতবাদে তাদের কল্যাণ নেই এবং তাদের জীবন ও দেশের স্বাধীনতাও এর ফলে বিপন্ন হয়ে পড়বে। এই সঙ্গে তারা এটাও উপলব্ধি করবে যে, বোধ হয় ইসলাম ছাড়া তাদের দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

এ পরিস্থিতি হবে ইসলামী আন্দোলনের জন্য অনুকূল। 'ওয়া আসা আন তাকরিহু শাইআন ওয়া হুয়া খাইরুল লাকুম'–'কিন্তু তোমরা যা পছন্দ করো না সম্ভবত তা তোমাদের জন্য ভালো।'–(সূরা আল বাকারা ঃ ২১৬)